১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। ভাদ্র মাস ১৩২০।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী।

ভক্তি।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

ভক্তির্ভগবত সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

"ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মমণ্ডল" কর্ত্তৃক পরিদর্শিত।

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভক্তি কার্য্যালয়,
ভাগবতাশ্রম, কোঁড়ার বাগান, হাওড়া
হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হাওড়া
ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টীং ওয়ার্কস্
হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
প্রার্থনা	শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১
নববর্ষের নিবেদন	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩
তুলসী চন্দন	শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়	১০
আমি কে	প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন	১২
হরিবোল	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস	১৫
জ্ঞানের বিকৃতি	সার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী	১৬
প্রেমময়ী চিন্তা	পণ্ডিত শ্রীল গোপীবল্লভ গোসাঞি	২২
শ্রীশ্রীবংশীবদন ঠাকুর	পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস গোস্বামী	২৮

পাথরের উৎকৃষ্ট ব্রেজিল চসমা।

যথানিয়মে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অথবা চক্ষু পরীক্ষক ডাক্তারদিগের ব্যবস্থানুসারে চসমা বিক্রয় করি। ইহাকে কোন ত্রুটী লক্ষিত হইলে ১মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিই, ষ্টীল চসমা ৬৲, রূপার ১০৲, সোনার ২৫৲, হইতে ৩৭৲ টাকা। আইপ্রিসারভার ১৲।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ তাঁহাদের বয়স ও দিবালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কিরূপ দেখিতে পান, লিখিলে ঠিক চক্ষের উপযোগী চসমা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান যায়।

রায় মিত্র এণ্ডকোং,।

১৮।১নং ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ব্র্যাঞ্চ দোকান, পটুয়াটুলি, ঢাকা।

শ্রী শ্রীরাধারমণো জয়তি

ভক্তি।

১২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ভাদ্রমাস, শ্রীজন্মাষ্টমী, ১৩২০।

"মঙ্গলাচরণম্।"

*   *   *

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দ-দলায়তেক্ষং।
কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশুগোপবেশম॥
ইন্দ্রাদিদেবগণ বন্দিত পাদপীঠং।
বৃন্দাবনালয়মহং বাসুদেব সূনুম॥
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয়-বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রম্॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয়ন্তং মনোমে॥
জয়তু জয়তু দেবো দেবকী নন্দনোহয়ং।
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপ॥
জয়তু জয়তু মেঘ-শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো।
জয়তু জয়তু পৃথ্বী ভারনাশো মুকুন্দঃ॥

প্রার্থনা।

—:০:—

দামোদর গুণমন্দির সুন্দর বদনারবিন্দ গোবিন্দ।
ভবজলধি মথন মন্দর পরমন্দর মপনয় ত্বং মে॥

হে দামোদর! হে গুণাকর! হে সুন্দর বদনকমল শ্রীগোবিন্দ! ভবজলধি মন্থনের তুমিই মন্দর স্বরূপ, তুমি নিজ গুণে দয়া করিয়া আমাকে তোমার

ভাবে ভাবাইয়া এইসুদুস্তর ভব ভয় হইতে রক্ষা কর। যেন সুখদুঃখ সম্পদ বিপদ সকল অবস্থাতেই তোমাতে আত্ম নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে তোমার নামগুণ গানে মত্ত থাকিতে পারি। আমায় দয়া কর। যেন কোন কর্ম্মেই কর্ত্তৃত্বাভিমান না আসে। অভিমানে মত্ত হইয়া, সর্ব্ব কারণ-কারণ, সর্ব্বলোক সাক্ষী যে তুমি তোমাকে যেন ভুলিয়া না যাই।

প্রভো! আজ এগার বৎসর যাবৎ এই ক্ষুদ্র 'ভক্তি' ডালি লইয়া তোমার দ্বারস্থ হইয়া আসিতেছি, যথাসাধ্য ভাবে ইঁহাকে সজ্জিত করিয়া লইতেও কুণ্ঠিত হই নাই, কত প্রার্থনা, কত ভক্তের ভাবময় প্রাণের কথা যে ইহাতে স্থান পাইয়া আসিতেছে তাহা অন্তর্যামী তুমি সকলই জানিতেছ। কিন্তু এই অকিঞ্চন প্রদত্ত সামান্য অর্ঘ্য তোমার পাদপদ্ম-সেবাসম্পাদনে সমর্থ হইতেছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না। দয়াল! প্রাণে প্রাণে বুঝাইয়া দাও, তোমার অভয় উৎসাহ বাণী শুনিয়া আমরা আবার তোমার কৃপা লাভের জন্য অগ্রসর হইতে থাকি।

কৃষ্ণ হে! আজ তোমার শুভ জন্মবাসরে কি বলিয়া যে তোমার স্তব করিব, কি বলিয়া যে প্রাণের ভাবব্যক্ত করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, তাই তোমার নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা যে, ভাষার দ্বারা প্রাণের যথার্থ ভাব, যথার্থ ব্যথা প্রকাশ করিয়া তোমাকে বলিতে পারি বা না পারি তুমি অন্তর্য্যামীরূপে যথার্থ প্রাণের ভাব বুঝিয়া ব্যথা বুঝিয়া আমার প্রতি কৃপা করিও; প্রভো! বিশ্বাস দাও; তোমার নামে, তোমার বাক্যে, তোমার যাবতীয় লীলায় প্রাণে অকপট বিশ্বাস দাও, যেন ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা তোমার অপার অসীম লীলার বিচার করিতে না যাই। অকপটে যেন মহাজনগণের পদানুসরণ করিতে পারি, দাও প্রভো! আমাকে—শুধু আমাকে কেন আমার মত দুর্দ্দশা গ্রস্থ জীব মাত্রকেই অচল অটল বিশ্বাস দাও;—

"(আমায়) দাও অচল অটল বিশ্বাস ভকতি রতি মতি রাঙ্গাচরণে।
(আমার) চঞ্চলচিত কর প্রসমিত (তব) করুণাবারি সিঞ্চনে।
(আমার) খুলে দাও আঁখি অন্ধ, ঘুচে যাক্ মনের দন্দ
আমি তোমায় হেরি হরি, (তুমি) আছ বিশ্ব ভরি
অনুপম প্রেম নয়নে ॥

(আমার) দুর্ব্বল চিতে শকতি, তুমি দাও নাথ দিবা রাতি
যেন সুখেতে দুখেতে, পারি হে ডাকিতে
(তোমায়) ভাবিতে জীবনে মরণে ॥

(আমায়) দেখায়ে প্রেমের আলো, তুমি করে ধ'রে নিয়ে চল
আমি চলি তব পথে, না পড়ি ভ্রমেতে,
(এই) গহন সংসার কাননে ॥

(আমার) জাগাও আকুল পীপাসা, তোমায় দেখিবারে হৃদে লালসা
(আমি) ভাবে ভুলে যাই, (ভাবে) আপনা হারাই
(তব) নাম শ্রবণ মনন কীর্ত্তনে ॥

(নাশ) অভাব কুভাব কামনা আর নূতন বাসনা দিওনা
(একবার) দিয়ে দরশন, হে প্রাণ রমণ!
(আমার) জুড়াও তাপিত জীবনে ॥

এই নিবেদন তব কাছে, (আমার) আর যে কটা দিন বাকী আছে
যেন মন প্রাণ খুলে, হরি হরি বলে
কাটাই আনন্দ জীবনে ॥"

শ্রীদীনেশচন্দ্র শর্ম্মা।

নব বর্ষের নিবেদন।

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত।

বর্ত্তমান মাস হইতে একাদশ উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তি পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সুতরাং প্রচলিত প্রথানুসারে আমরা আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয় দিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন অতীত বৎসরের ন্যায় ভবিষ্যতেও "ভক্তি" পত্রিকার প্রচারে সহায়তা করেন।

এ অনুরোধ, ব্যবসা রক্ষার জন্য নহে ; ইহা প্রাণের—আত্মার-প্রীতির আকর্ষণ ! যিনি "ভক্তি" পত্রিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যিনি বঙ্গবাসীকে "জীব নিত্য এবং ভগবানের দাস" ইহা নিত্য স্মরণ করাইবার জন্যই "ভক্তি" পত্রিকার প্রচার করিয়াছিলেন, যিনি বচনে, কীর্ত্তনে ও আচরণ অনুষ্ঠানে আদর্শ ভক্ত জীবনের ভাব জাগাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেন সেই নিত্যধামগত পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এই নিবেদন করিতেছি। তাই বলি, আজ তাহার সেই সাধের ভক্তি পত্রিকার নব বর্ষারম্ভে, ভক্ত অভক্ত, জ্ঞানী অজ্ঞানী, নর নারী সকলকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার ভাবে, আবার আজ বলি,—

"ভক্তি ভঁবত সেবা ভক্তিপ্রেম স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দ রূপা চ ভক্তি ভঁক্তস্য জীবনম্।"

মনে রোখো, ভাই মনে রেখ,—ভুলনা নর-নারী—ভুলনা এ মহান্ বাক্য। ইহাই তোমাদের আশা ইহাই সকলের ভরসা। যে ভাব বজায় রাখিতে পারিলেই প্রকৃত জীবন থাকে—যে ভাব ছাড়িলেই প্রকৃত মরণের পথে অগ্রসর হইতে হয়। সেই ভাব জাগাইবার জন্যই 'ভক্তির' উৎপত্তি ও প্রচার—এটি যেন বেশ মনে থাকে ভাই !

পারি নাই, ভক্তের মনের মত করিয়া সকল সময়, "ভক্তি" প্রতিষ্ঠাতার পথে অগ্রসর হইতে পারি নাই। ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে—ঘটিতেও পারে। কিন্তু আশা আছে, এ প্রচারের অধিকারী কেবল আমরা নহি—গ্রাহক ও অনুগ্রাহক সকলেই সে কর্ম্মের অধিকারী। 'ভক্তির' উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শক্তি সঞ্চার করুণ আর ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করুণ যেন আমরা কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত না হই।

একথা বিশেষ করিয়া বলিবার কারণ এই যে, এই বৎসর হইতে "ভক্তি" পত্রিকা পরিচালনার ভার শ্রীমান দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপরই সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইয়াছে। ইনি পূর্ব্বে কেবল পত্রিকা সম্পাদন করিতেন মাত্র, কিন্তু এই বৎসর হইতে ইহার মুদ্রন, পরিচালন ও সম্পাদন যাহা কিছু সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ ইনি কপর্দ্দক শূন্য। এ অবস্থায় ইনি এরূপ করিলেন কেন? ইহা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তদুত্তরে বলি, ইহার উপর এই ভার

অর্পিত না হইলে, এই সাধের 'ভক্তি' পত্রিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছিলেন। তাই আমরা, আশায় বুক বাঁধিয়া, ভক্তগণের মুখের দিকে চাহিয়া, শ্রীভগবানের নাম লইয়া 'ভক্তির' উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীমান্ দীনেশ চন্দ্রের উপর এই গুরু ভার অর্পণ করিয়াছি ; ভক্তগণ, বন্ধুগণ, বঙ্গবাসী নর-নারী সে উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হউন।

'ভক্তি'র উদ্দেশ্য কি ? তাহা আর ভক্তি পাঠকের অবিদিত নাই। তবু বলি, আবার নব বর্ষের প্রারম্ভে নূতন করিয়া সেই কথা বলি। "ভক্তি" মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পথ স্থির করিয়া দিতেছে, মানবকে আনন্দ ধামের আলোক দেখাইয়া বলিতেছে—"এস ভাই, এই দিকে এস ; তুমি যে আনন্দ যে সুখ চাও তাহা এই আনন্দধামে আছে। তুমি সেই আনন্দেরই অধিকারী।—তাহা না পাইয়াই তো তোমার মুখ মলিন হইয়াছে, তাহা না পাইয়াই তো তোমার বুক জ্বলিতেছে।

এখন জগতের যে দিকে ফিরিয়া দেখি, যে সমাজের দিকে চাহিয়া দেখি, দেখিতে পাই যে, মানুষ আত্ম-সুখের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু প্রকৃত সুখ কি তাহা না পাইয়া প্রাপ্ত বস্তুতে বিরাগ ও পুনর্ব্বার অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। কেন এমন হয় ?

ইহার উত্তরে কেবল একটি মাত্র তত্ত্বের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইব। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে যে, আত্মা নিত্য বস্তু, আশা আকাঙ্ক্ষাও নিত্যের প্রতিই হইয়া থাকে অনিত্য বস্তুর প্রতি সেই আকাঙ্ক্ষা প্রয়োগ করিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সম-জাতির সহিত সম জাতির মিলনেই সুখ ইহার অভাব ঘটিলেই দুঃখ।

জগতে আমরা যে সুখের কামনা করিতেছি ইহা সর্ব্বাংশে অনিত্যমূলক। জড়ের সেবায়, ইন্দ্রিয়ের সেবায়, মানুষ এমনি অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার মনে প্রতিনিয়ত নানাবিধ অভাবের সৃষ্টি হইতেছে। যাহা চাহিতেছি তাহা পাইয়াও তাহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতেছে না, সে আবার অন্য পদার্থের আকাঙ্ক্ষায় লালায়িত হইতেছে সুতরাং এমন কিছু পাওয়া চাই, যাহা পাইলে আর চাহিবার কিছু থাকে না, সেই পরম পদার্থ লাভ হয় কিসে ? ভারতের দর্শন, ভারতের বিজ্ঞান, ভারতের ইতিহাস সেই পদার্থ লাভের উপায় বলিয়া

দিয়াছেন। বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর উৎপত্তি কোথা হইতে, বিশ্বের সহিত বিশ্ববাসীর সম্বন্ধ কি, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, তাহা কেবল শাস্ত্রে প্রকাশিত হয় নাই, স্বয়ং ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সেই "জন্মাদ্যস্য যতোর" তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, আর জীবকে "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" একথাও প্রত্যক্ষ করাইয়া, "সত্যং পরং ধীমহি'' এই মহান্ দীক্ষা দিয়াছেন।

জীব সে উপদেশ ভুলিয়া জড়কে জড় ভাবিল, দেহকে আত্মা বলিয়া গণ্য করিল, ইন্দ্রিয় সুখকে সুখের চরম ভাবিল। ইহাতে হইল কি—না, মানুষ জগতের প্রতি পটে সে আনন্দর চিত্র দেখিতে ভুলিয়া গেল, বিরোধ বিসম্বাদের, দুঃখ ও হতাশের ভাব গুলি জাগাইয়া তুলিল। মানুষের সহিত মানুষের প্রেম নাই, বরং একে অন্যের দোষ দেখিতে বা তাহার প্রতি হিংসা করিতে আরম্ভ করিল। প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, মানব জন্ম লাভের উদ্দেশ্য কি, তাহা ভুলিয়া গেল।

জগতে যখন এই ভাবের অতিমাত্র প্রশ্রয় পাইতেছিল, তখন স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জীবকে তাঁহার সেই "চিরাৎ অদত্তং নিজ বিত্ত গুপ্তং" দান করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে এই বাঙ্গালা দেশে অবতীর্ণ হইলেন। জগৎ যে আনন্দময়, ভগবান্ অবারিত ও অযাচিত ভাবে যে জীবকে অহরহ তাঁহার বক্ষে আকর্ষণ করিতেছেন, নিত্য বস্তুর সহিত নিত্য বস্তুর যে অভিন্ন প্রেমের সম্বন্ধ রহিয়াছে, সে প্রেমের আলোকে যে, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণের আলয়ে চন্দ্রালোক পতনের ন্যায়, সর্ব্বত্র সমভাবে উজ্জ্বল হয়, আর সেই প্রেমের ভাবে বিভোর হইয়া এমন পদার্থ লাভ হয়, এমন আনন্দ পাওয়া যায়, যাহা পাইলে জীব ধন্য হইয়া যায়, যাহা পাইবার জন্য মানুষের মানব জন্ম লাভ হইয়াছে। এ ভব সংসারে দুঃখ নাই, বিরোধ নাই, অশান্তির ভাব নাই—এ যে এক অপূর্ব্ব আনন্দ বাজার এ জ্ঞান, এ ধারণা তখন হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই ভাবে ভাবিত জীব যাহা দেখে, তাহাতেই তাহার আনন্দ স্ফূরণ হয়, যে তাঁহাকে দেখে সেও আনন্দে মজিয়া যায়, যে স্থান দিয়া তিনি গমন করেন, যাহার সহিত কথা কহেন—সর্ব্বত্রই সেই আনন্দের বিকাশ কোথাও কোন বিরোধ নাই হা হুতাশ নাই, দুঃখ নাই, অশান্তির ভাব নাই কেবল আনন্দের ভাবে মাখামাখি! ভাই!

ভাব দেখি, এ জীবন কেমন মধুর! এ প্রেমের আস্বাদ লাভে কি পরশমণির সন্ধান পাওয়া যায়?

আমরা বাঙ্গালী। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালীর গৃহে, বাঙ্গালীর বেশে, বাঙ্গালীর ভাবে এই যে মহান চিত্র দেখাইলেন, এই যে আনন্দের সম্বাদ জনে জনে যাচিয়া সাধিয়া বিতরণ করিলেন ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা কি বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য নয়? স্বয়ং ভগবান, তোমাদের পতিত অবস্থা দেখিয়া, কৃপাপূর্ব্বক তোমাদের দ্বারে আসিয়া, দন্তে তৃণ ধরিয়া বিনীত ভাবে তোমাদের কোলে তুলিয়া লইবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন, আর তোমরা তাঁহাকে ভুলিয়া তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া, আনন্দ ভ্রমে কেবল নিরানন্দের পথে ধাবিত হইতেছ। তোমরা সেই তৃণাদপি সুনিচ বেশে, তরোরিব সহিষ্ণু হৃদয়ে "অমানিনা মান দেয়" ভাবে—গৌর প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইবে, জগই মাতাইবে, জগতে স্বর্গীয় চিত্র আঁকিয়া দিবে—না তাহার পরিবর্ত্তে নশ্বর—অতি নশ্বর, বিষয় লইয়া বিরোধ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইতেছ, এ মহান কর্ত্তব্য ভুলিয়া ক্ষণিক ও অসার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছ, জড়ীয় দেহের বিকৃত মনের সুখ দুঃখ বা অধিকার লাভের জন্য লালায়িত হইয়া অনিত্য আন্দোলনে উন্মত্ত হইয়াছ! তোমাদের দেশের এমন দয়াল ঠাকুর, বাঙ্গালীর অবতারকে অবহেলা করিয়া তোমরা আবার বীরপূজার আয়োজন কর। একি ভ্রম! তোমাদের এ আয়োজন যে কোন শুভ ফলদায়ক নহে! কারণ এ সকলই যে অনিত্য, অনিত্যের আরাধনায় নিত্য বস্তুর তৃপ্তি কোথায়! তোমার অন্তরাত্মা যে নিত্য বস্তু।

শ্রীভগবান গৌররূপে তোমাদের দেশে কেন আসিয়াছিলেন, তাহা একবার ভাবিয়াছ কি? বাঙ্গালীর মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিশালী ও প্রেম প্রবণ হৃদয় জীব, জগতে অতি বিরল। শ্রীভগবান এই জন্য তোমাদের দেশে তোমাদের বেশে, তোমাদের মনের মত অবতার হইয়া আসিলেন ও তোমাদিগকে ভগবৎ প্রেমের অমৃত আস্বাদ দান করিলেন। তোমরা কি এখনও এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়া, এমন শান্তিময় রাজ্যে বাস করিতে পাইয়াও অকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে? শ্রীভগবানের সেই কৃপার পরিচয় জনে জনে, নগরে অরণ্যে, গিরি-কন্দরে, সমগ্র জগতে প্রচার করিবে না? তোমাদের বিকৃত রুচিবশে, বিকৃত মনের গতিতে, তোমরা

কি জগতের চক্ষে মহা অপরাধী ও অপদার্থ জীবের মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে চলিবে? এটা কি উচিত? এই কি মহৎ! জগতের চক্ষে সকল জাতি বিজ্ঞান বলে উন্নতিতে গৌরব অনুভব করিবে, আর তোমরা এই অপূর্ব্ব বিজ্ঞানকে বজায় রাখিতে পারিবে না? তোমাদের কুকর্ম্মের ফলে লোকে তোমাদিগকে ঘৃণা করুক, আর তোমরা দিন দিন পশুভাবাপন্ন হও, এমন পরিণাম কি বাঞ্ছনীয়? বিরোধ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিলে মানব হৃদয় পশু সেবিত অরণ্যবৎ হইয়া উঠে। বর্জ্জন ও বিরক্তি ভাব ধারণা করিতে শিখিলে বর্ব্বরতা প্রকাশ পায় মাত্র, তাহাতে প্রেমের বিকাশ হয় না। সুতরাং হৃদয়ে যদি সেই ভাব প্রবেশ করিয়া থাকে তো তাহা দূর করিয়া দাও, মহাপ্রভুর মহান্ উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া সেই তৃণাদপি সুনীচ ভাবে আনন্দধামের পথে অগ্রসর হও।

বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেই গৌরপ্রেমের প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দাও, সেই প্রেমের ভাবে বাহু প্রসারণ করিয়া বাঙ্গালী সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করুক! যে দেশের আদর্শ--

"যারে হেরে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি,
আমারে কিনিয়া লহ বল হরি হরি।"

সে দেশের লোকে, সেই আদর্শ যেন ভুলিয়া না যায়। যে দেশের শ্রীনিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন,—"মেরেছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?"

সে দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতার মতিগতি যেন কদাচ জড়ীয় কারণে অনিত্যের মোহে বিকৃত না হয়।

বাঙ্গালী ভুলিও না সেই আদর্শ, ভুলিও না সেই কর্ত্তব্য। তোমরা এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীগৌরপ্রেমের বন্যায় দেশ প্লাবিত কর। মানুষ হও, প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া শ্রীগৌরআশীর্ব্বাদে জগতে অমৃতের সংবাদ আনিয়া দাও, পৃথিবীতে স্বর্গের চিত্র আঁকিয়া দাও, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ স্তম্ভিত জগৎবাসী আবার বলুক "চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।"

শ্রীগৌরপ্রেমের এমনি মোহিনী শক্তি, ইহার প্রভাব এমনই অনন্ত, ইহাতে কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিতে পারে না, কারণ সকলেই যে প্রভুসন্তান

সকলেই যে আনন্দের অধিকারী। জগৎ আনন্দময়, স্বয়ং ভগবান্ যে আনন্দের সাগর "রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।"

বাঙ্গালী, যদি আমাদের কিছুমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে তো, জগতে এই আনন্দের বার্ত্তা প্রচার করা,—এই ভাব জাগাইয়া তোলা, শ্রীগৌরাঙ্গের এই মধুর পবিত্র ও মহৎ ভাব জনে জনে বিতরণ করা সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বাংশে উচিত। বাঙ্গালীর চরিত্রে, বাঙ্গালীর আচরণে, বাঙ্গালীর সাহিত্যে, বাঙ্গালীর চিন্তায় সেই ভাব সর্ব্বদা প্রকাশিত হউক। জগতের সর্ব্বত্র বাঙ্গালার এই চিত্র দেখিয়া জগতের নরনারী প্রেম-বিগলিত হৃদয়ে, সাশ্রু নয়নে বলিবে, "আহা! বাঙ্গালী পরম পদার্থ পাইয়াছে বলিয়াই অনিত্যের সুখ ছাড়িয়া প্রকৃত সুখের রসাস্বাদন করিতেছে, আমরাও সেই সুখে বঞ্চিত থাকিব কেন? তখন জগৎ-ময় গৌরপ্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইবে। সেদিন কবে আসিবে? বাঙ্গালী, তুমি তোমার উন্নত হৃদয়ের, মঙ্গল আরাধনায় সেই দিনকে নিকটবর্ত্তী কর। শুভ উদ্দেশ্য, শুভ সঙ্কল্প শ্রীভগবান পূর্ণ করিবেন। ইহাই তোমাদের কর্ত্তব্য।

যদি বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে তো এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। দ্বেষ, বিষাদ বিবাদ হিংসা—ভুলিয়া আপনাকে প্রকৃত ভক্তরূপে জগতের নিকট পরিচিত হও আন্তরিক ভাবে বাঙ্গালীর অবতারের প্রদর্শিত পথে চল। তুমি কৃতার্থ হইবে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে, তোমার সংস্রবে যাহারা আসিবে তাহাদেরও বিকৃত মতি পরিশুদ্ধ হইবে, তাহারাও তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া এ ভবসংসারে আনন্দ বাজারে পরিণত করিবে। বাঙ্গালী এইটী তোমার জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য, ধারণা করিয়া লও। দেখ জগৎ কত মধুর, জীবনে কি আনন্দ, আর সেই আনন্দময় কেমন সর্ব্বত্র মধুর ভাবে অহরহ আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতেছেন।

ইহাই "ভক্তির" উদ্দেশ্য এ উদ্দেশ্য সাধনে কে না অগ্রসর হইবেন! কারণ ইহাই যে মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। নহে কি?

তুলসী চন্দন।

—:০:—

কহিছে চন্দন শীতল প্রভাতে
ত্যেজিয়া শয়ন উঠিয়া ত্বরা—
"এসহে তুলসী প্রাণের প্রেয়সী
ল'য়ে প্রেম-প্রীতি হৃদয়-ভরা;
মিলিয়া দু'জনে পুলকিত মনে
হরির চরণ সেবিতে যাই;
হ'য়ে সুপবিত্র ভকতের করে
চল শ্রীচরণ দোঁহে সাজাই!"
হয়ে মাখামাখি চন্দনের সনে
করি গলাগলি তুলসী তবে,
কহে মৃদুহাসি ঢালি সুধারাশি—
"বল হে, অমৃতে অরুচি কবে?
এস এস ভাই হরিনাম গাই
যাই হে শ্রীপতি-শ্রীপাদ-বাসে,
সুখের আবাস সেইতো মোদের
ধরিয়াছি প্রাণ সে-সুখ-আশে!
আহা কি শীতল শ্রীপদ-যুগল
কি প্রাণ জুড়ান' পরম ঠাঁই,
বল দেখি ভাই প্রাণের চন্দন
এত শান্তি আর কোথায় পাই?"
কহিছে চন্দন— "হা সখি, তুলসী।
যে-পাদ-আসব জাহ্নবী-জল,
করে নিরবান্ বহিয়া ত্রিলোকে
জ্বালাময় মহা-পাপ-অনল;

যে পদ পরশে পাষাণী মানবী ;
বাঁচিল কালীয় কালের ডরে ;
যে পদ পাইয়া গয়াসুর শিরে
পাপীর প্রেতত্ব বিনাশ করে ;
ধূলি-কণা-তরে যে রাঙ্গা পদের
কত শিব ব্রহ্মা সাধু-ভকত,
করে আরাধনা কত না সাধনা
যুগ যুগ কাল ধরিয়া ব্রত ;
নাহি সীমা যার মহা-মহিমার ;
কত জনমের পুণ্যের বলে,
পাইয়াছি মোরা সে চরণে ঠাঁই,
আশ্রয় কল্প তরুর তলে !
"হা সখি, তুলসী, ত্রিলোক মণ্ডলে,
এ উৎস অনন্ত সুখ-সুধার,
এ শান্তি শীতল অক্ষয় অমল
বিনা সে শ্রীপদ কোথারে আর ?
ভ্রমে অকারণ মূঢ় জীবগণ
বিফল বিষয়ে কি সুখ তরে ?
সুখ বোধে হায় কি দুঃখে অপার
জনম জনম জ্বলিয়া মরে !
জানি না গো তারা আমাদের মত,
লাগিয়া ও-পদে কেন না রয় ;
জনম যাতনা এ বেদনা মহা
আর কি তা' হ'লে সহিতে হয় ?"
"শ্রীরাধা মাধব" গাহিয়া তখন
আনন্দে চন্দন তুলসী-সনে,

সেবিতে যুগলে যুগল চরণ
চলিল ভকত-কর-বাহনে।
কহে "শ্রীচরণ"— তুলসী চন্দন
এস কৃপা করি আমারি করে,
সঁপি শ্রীচরণে তোমা দুই জনে
সাজাই যতনে শ্যাম সুন্দরে!
বড় প্রিয় তাঁর, তুলসী চন্দন;
জনম জনম বাসনা মম,
তোমাদের ল'য়ে প্রফুল্ল হৃদয়ে
সেবি শ্রীহরির রাঙ্গাচরণ।

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীকৃষ্ণপুর।

"আমি কে?"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন লিখিত।)

ঐ পরব্রহ্মই যদি "আমার" স্বরূপ হন, "আমি" বলিয়া যদি পৃথক কোন বস্তু না থাকে, তাহা হইলে এই পৃথক পৃথক "আমার" আমিত্ব সম্ভব কিরূপে হইবে? পরব্রহ্মকে ধর্ম্মশূন্য নিরবয়ব, ব্যাপক, সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ বলা হইয়াছে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে; অপর যাহা কিছু দেখি এ সকলই মিথ্যা, এক তিনি মাত্রই সত্য। সুতরাং এই দৃশ্য অদৃশ্য অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত কীট পতঙ্গাদি অনন্ত কোটী প্রাণি সমুদায় সকলই ব্রহ্ম হয়, ব্রহ্ম কেন এই সকল আকার ধারণ করিলেন, কেনই বা সামুদ্রিক তরঙ্গের ন্যায় অবিরতোথিত অনন্ত দুঃখ ভোগের ভাজন হইলেন? যদি বলি এসকলের কোনটীই সত্য নহে এসকলই মিথ্যা এ কেবল অবিদ্যা মায়ার ভেল্কি যেদিন অবিদ্যা

কাটিয়া যাইবে সেদিন আর এসব কিছুই থাকিবেনা, তখন, যে ব্রহ্ম সেই এক ব্রহ্মই থাকিবেন। কেননা পরব্রহ্ম যখন সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বিদ্যা মায়ায় উপহিত হন তখন ঈশ্বর এবং যখন অবিদ্যা মায়ায় উপহিত হন্ তখন জীব আখ্যা ধারণ করেন কিন্তু স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে আর জীব ঈশ্বর প্রভৃতি কিছুই থাকেনা তখন আবার সেই অদ্বিতীয় চিন্মাত্র পরব্রহ্ম স্বরূপেই অবস্থান হইয়া থাকে। অতএব "আমি" বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই, যতদিন অবিদ্যা ততদিন "আমি" পরব্রহ্মই "আমার" স্বরূপ।

ইহারই বা সম্ভব কি রূপে হইতে পারে, কারণ যে উভয় আখ্যা ধারিণী মায়ার উল্লেখ হইল ঐ মায়া অনির্ব্বচনীয় হইলেও নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয়া ব্রহ্ম ব্যতিরেকে যখন আর কোন বস্তুই নাই তখন মায়া কোথা হইতে আসিল? তবে কি ব্রহ্মের ন্যায় মায়ারও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে? যদি ইহা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন আর কিছু নাই একথা বলা যায় না। কারণ ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের হানি হইতেছে। বিজাতীয় ভেদ-শূন্য-রূপ অঙ্গীকার-বাক্যে ও দোষ হইয়া যাইতেছে। এবং ব্রহ্মকে যখন ব্যাপক বলা হইয়াছে তখন ব্রহ্মাতিরিক্ত মায়াঙ্গীকারে ব্যাপকত্বেরও হানি হইতেছে। দ্বিতীয় কথা তিনি মায়াকে কিরূপে অঙ্গীকার করিলেন? এবং ঐ মায়াঙ্গীকার জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ করিলেন? যদি অজ্ঞানতঃ ব্রহ্ম মায়াকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের হানি হইতেছে, এবং মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করিলেন, তাহাও বলা হয় না কারণ উহাতে ব্রহ্মের উপরও মায়ার আধিপত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যদি বলা হয় ব্রহ্ম জ্ঞানতঃ মায়াকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাও বলা যায় না কেননা কেহ স্বেচ্ছায় দুঃখকে অঙ্গীকার করেনা, এবং ইহাদ্বারা তাঁহার নিধর্ম্মকত্বের ও হানি হইতেছে। যদি বলাযায় ব্রহ্ম সকল সময়ে মায়াঙ্গীকার করেন্ না যখন তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করেন তখনই মায়াঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাহাতে উক্ত নির্ধর্ম্মকতার হানি হয়। কারণ ইচ্ছা একটী ধর্ম্ম বিশেষ।

অপর একটী কথা, ব্রহ্ম একসময়ে বিদ্যা ও অবিদ্যা মায়ার অঙ্গীকারে ঈশ্বর ও জীব আখ্যা ধারণ করেন বলা হইয়াছে, তাহারই বা সম্ভব কি প্রকারে

হয়, কারণ এক সময়ে একই ব্রহ্ম দুইটী বিভিন্ন প্রকারের বস্তুকে গ্রহণ করিতেন কিরূপে ? যদি বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বস্তুর গ্রহণ বলা যায় ; তাহাও হইতে পারে না কারণ অংশ বলিয়া এক বস্তুর একদেশ কিম্বা তাহার কোন খণ্ড বুঝিয়া থাকি, যদি তাহা হয়, তবে কি আজ সেই ব্যাপক ব্রহ্ম নিজকে খণ্ডাকারে বিভক্ত করিয়া একখণ্ডে বিদ্যা ও এক খণ্ডে অবিদ্যা মায়ার অঙ্গীকার করিলেন ? যদি এরূপ হয় তাহা হইলে আর অপরিচ্ছিন্ন রহিলেন্ না, পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। এবং ব্রহ্ম খণ্ড বিশেষ যখন ঈশ্বর হইলেন, তখন ঈশ্বরেও আদিমত্ব দোষ আপাতত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম এমনই বা কি অপরাধ করিলেন যদ্দারা অবিদ্যা তাঁহাকে নিজায়ত্বে আনিয়া অশেষ জ্বালা যন্ত্রণার অনুভবিতা করিয়া রাখিলেন। কারণ শাস্ত্রে সুকৃতি দুস্কৃতি অনুসারে গতায়াতাদি দুঃখের ভোগ শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে পরব্রহ্মকে "আমার" স্বরূপ কেমন করিয়া বলিতে পারি ? উপনিষদ বারম্বার তাঁহাকে অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি অপরিচ্ছিন্ন তাঁহার ছেদ সম্ভাবনাই কোথায়, "অগৃহ্যো নহিগৃহ্যতে"। এই বাক্যে শ্রুতি স্বয়ংই তাঁহার সর্ব্বাস্পৃশত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। এদিকে ছেদ স্বীকার না করিলেও, সম্পূর্ণ ব্রহ্ম প্রদেশ বিশেষের বিশেষ উপাধিতে প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়। বিশেষতঃ যদি সম্পূর্ণ ব্রহ্মকে মায়া উপহিত বলা হয় তাহা হইলে শুদ্ধ ব্রহ্মের অভিধানই থাকে না। যদি উপহিত ব্রহ্মের জীব ঈশ্বর আখ্যা না হইয়া কেবল উপাধিরই জীব ঈশ্বর আখ্যা হইয়া থাকে ব্রহ্ম কেবল অধিষ্ঠান রূপে থাকেন বল, তাহাও বলিতে পারা যায় না, কারণ তাহা হইলে মুক্তাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বর রহিয়া যায় যে হেতু ব্রহ্মাধিষ্ঠিত উপাধির বিদ্যমানতা তৎকালেও বর্ত্তমান সুতরাং অবিদ্যোপহিত পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে "আমার স্বরূপ" কিরূপে বলিতে পারি ?

যদি বলা হয় যেমন এক সূর্য্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হন, কিন্তু বস্তুতঃ যে সূর্য্য সেই একই সূর্য্য রহিয়াছেন, তদ্রূপ এই চেতন ব্রহ্ম উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথক আখ্যা ধারণ করেন মাত্র। অর্থাৎ সরসিতে যখন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন যেমন উহাকে বৃহৎ দেখায়। আর যখন ক্ষুদ্র ঘটে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয় তখন

উহাকে ক্ষুদ্র দেখাইয়া থাকে তদ্রূপ ব্রহ্ম যখন বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হন তখন ঈশ্বর এবং যখন অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হন তখন ক্ষুদ্রজীব আখ্যা ধারণ করেন। এইরূপ জল যখন কম্পিত হয় তখন সূর্য্য কম্পিত হইতেছেন বলিয়া মনে হয় কিন্তু বাস্তবিক যেমন সূর্য্য কম্পিত হন্ না সেইরূপ উপাধির চালন বা কম্পনে উহা ব্রহ্মে উপচারিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সুখ বা দুঃখ কিছুই নাই, কিন্তু ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, কারণ যিনি নির্ধর্ম্মক নিরবয়ব তাঁহার আবার প্রতিবিম্ব কিরূপে হইতে পারে, যাহার রূপ আছে তাহারই প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে, যাহা পরিচ্ছিন্ন উহাই প্রতিবিম্বিত হয় কিন্তু ব্যাক্য উপাধিতে ব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভাবনা কোথায়? জলে যে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কারণ সূর্য্যাদির রূপ আছে উহা পরিচ্ছিন্ন এবং অবয়বযুক্ত সুতরাং উহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে। যাহা অপরিচ্ছিন্ন ও নিরবয়ব তাহার প্রতিবিম্বই সম্ভব হয় না, সুতরাং কেমনকরিয়া প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মতে আমার স্বরূপ রাখিতে পারি।

ক্রমশঃ

হরিবোল।

—:০:—

আমিয়ার সর ছাঁকা, ভকতের হাসি ঢাকা
প্রেমেমাখা হরিবোল।
গাহিয়া যে হরিবোল, দেবঋষি বিহ্বল
শঙ্কর সদা বিভোল॥
প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদ-মনে, শুদ্ধ হরির ভজনে
আলিঙ্গিলা বিঘ্নচয়।
যে নামে লভিলা হরি, রাজপদ পরিহরি
ধ্রুব, নিত্য চিনময়॥
যে মধুর হরিনাম, গাহি বিশ্ব অবিরাম
ঘুরিছে সৌর মণ্ডলে।

যে নামে প্রকৃতি হাসে, পিক গায় প্রিয় ভাসে
তটিনী বহে কল্লোলে ॥
যে নাম কীর্ত্তন করি, আপনি শ্রীগৌর হরি
ভক্ত সাথে কুতুহলে—
উদ্ধারিলা শত শত, পাপী তাপী ছিল যত
চরিতামৃত গায়রে ;
আরো পূর্ণ সুধা যত, রেখেছিল সাধ্যমত
মহাগ্রহ রত্নাকরে।
সেই সব সিন্ধু হ'তে, ছাঁকিয়া নাম অমৃতে
ভক্ত প্রসাদ মঙ্গল—
এনেছেন রত্নসার, ভকতের কণ্ঠহার
মহামাল্য "হরিবোল।"
হরিবোল, হরিবোল, কলির নিত্য সম্বল
অন্তিমের মহাফল ;
পাপ তাপ দূরে যায়, হরিবোল মহিমায়
ছুটে আনন্দ কল্লোল।
যে আছ ভকত যথা, পিও এ অমিয় কথা
রহিবে না অমঙ্গল ॥
(আজি) জীবের মঙ্গল তরে মঙ্গলা সুলভ ক'রে
দিতেছেন 'হরিবোল।'

দীন—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস।

জ্ঞানের বিকৃতি।

(সার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামি মহোদয় লিখিত।)

—:০:—

জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবান্ জীবগণের মঙ্গলকামনায় জগৎসৃষ্টি করিয়া যেমন জীবগণের বৈষয়িক সুখ বিধান করিয়াছেন। তেমনই জ্ঞান শিক্ষা দিয়া অনন্ত উন্নতি ও অসীম আনন্দ-লাভের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন।

উপদেশ ভিন্ন জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় না। এজন্য স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিজ নিশ্বাসবৎ বেদ প্রকাশ করিয়াছেন।

জ্ঞানের প্রকাশ

বেদই লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের মূল। সময়ে সময়ে সুকৃতি অধিকারীর অভাবে বেদের পঠনপাঠন বিলুপ্ত প্রাপ্ত হয়; তাহাকেই বলা হয় বেদের বিনাশ বা জ্ঞানের তিরোধান। এই বিনষ্ট বেদ ও তিরোহিত জ্ঞানের পুনঃপ্রকাশের জন্য শ্রীভগবান্ কখন কখন সাক্ষাৎরূপে অবতীর্ণ হন। কখন বা মহর্ষিগণের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া বেদ ও বেদার্থ-রূপে গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এ কল্পেও এই জ্ঞানপ্রদায়িনী লীলা, বিচিত্র ভাবে সংঘটিত হইয়াছে। কৃত যুগে যখন, প্রথম বেদ ও জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন বেদ সমুজ্জলরূপে প্রতিভাসিত ছিলেন। তাহার বিশুদ্ধ অর্থ অর্থাৎ ভক্তিময় জ্ঞানও পূর্ণরূপে উদিত ছিল। ত্রেতাযুগে এই ভক্তিরূপ বেদার্থ কামানা কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডরূপে পরিলক্ষিত হয়, তদ্‌যথা :—

তদেতৎ সত্যং, মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং
স্তানি ত্রেতায়াম্ বহুধা সন্ততানি। (মুণ্ডক ১।২।১)

অর্থ—"এইটী সত্য যে, কবিগণ বৈদিক মন্ত্র সমূহে যে সমস্ত কর্ম্ম দেখিয়া-ছিলেন, তাহা ত্রেতাযুগে বহুধা বিস্তৃত হয়।" ইহার ভাব এই যে দিব্য জ্ঞানময় সত্যযুগে শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবদ্ভক্তি অমল হৃদয় মুণিগণের মানস দর্শনে বেদার্থরূপে পরিগৃহিত হইত। ত্রেতাযুগে কামনা জ্ঞানের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানই বেদার্থরূপে পরিগৃহিত হইতে লাগিল

দ্বাপরযুগে কাম্যভোগ লম্পট জীবগণের হৃদয় এত দুর্ব্বল হইয়া গেল যে, উহারা বিশুদ্ধ বেদার্থময় জ্ঞানকে কোন প্রকা-

জ্ঞানের বিনাশ।

রেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলনা। ইহাকেই বলা হয়,—জ্ঞানের বিনাশ। জ্ঞানবিনাশকেই ঔপচারিক ভাষায় অজ্ঞানের উদয় বলা হয়। অজ্ঞানের উদয় হইলেই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়। নিজ প্রতিভা বলে বেদের বিপরীত অর্থ করা ও দুস্তর্কময় দর্শন শাস্ত্র প্রচার করা ইহার মূল ভিত্তি।

দ্বাপর যুগে এইরূপ জ্ঞানের বিনাশ ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইবার পরে দেবগণ দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শ্রীভগবান্ বাদরায়ণ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া,

বেদের শাখা বিভাগ করিলেন ও তদর্থনির্ণয়ক উত্তরমীমাংসা প্রণয়ন করিলেন। এই উত্তর মীমাংসার অপর নাম বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র। জ্ঞান তিরোধানে ঐতিহাসিক কথা স্কন্দপুরাণে দেখা যায় তদ্‌যথাঃ—

নারায়ণাৎ বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্।
কিঞ্চিৎতদন্যথা জাতং ত্রেতায়াম্ দ্বাপরেঽখিলম্॥
গৌতমস্য ঋষেঃশাপাৎ জ্ঞানেত্বজ্ঞানতাং গতে।
সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরসরাঃ।
শরণ্যং শরণং জগ্মু নারায়ণমনাময়ম্॥
তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ॥
উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ং।
চতুর্দ্ধাব্যভজৎ তাংশ্চ চতুর্বিংশতিধা পুনঃ॥
শতধা চৈকধা চৈব তথৈবচ সহস্রধা।
কৃষ্ণো দ্বাদশধা চৈব পুনস্তস্যার্থবিত্তয়ে॥
চকার ব্রহ্মসূত্রানি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা।

ইহার ভাবার্থ এই যে, সত্যযুগে জ্ঞান যথার্থ ভাবে স্থিত ছিল। ত্রেতাযুগে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা ভাব হয় অর্থাৎ সেই ভগবদ্ভক্তিময় বেদের অর্থ কর্ম্ম ময় প্রতীত হইতে লাগিল। সেই সময়েই বিরুদ্ধ দর্শন সকলের সৃষ্টি হয়। অজ্ঞানান্ধকারে বিনষ্টদৃষ্টি, কার্পণ্য দোষোপহত শরীরিবৃন্দের মঙ্গলকামনায় শিববিরিঞ্চিপ্রমুখ দেবগণ, জ্ঞানময় শ্রীহরির পাদপদ্মে উপনীত হইয়া সেই অজ্ঞানবিনাশনিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। দীনবন্ধু শ্রীহরি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদদ্রুমের শাখা বিভাগ করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে যেন স্বল্পায়ুঃ ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকেরাও বেদাধ্যয়ন করিতে পারেন। যাহাতে পুনরায় বিপরীতার্থ প্রতীত না হয়, তজ্জন্য তিনি বেদার্থনির্ণায়ক সূত্রও প্রণয়ন করিলেন। শ্রীভগবদ্‌গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ স্বাভাবিক নিয়মের স্বরূপনিরূপণ করিয়াছেন

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।

জ্ঞান-ভাস্কর সময়ে সময়ে অজ্ঞানমেঘে আবৃত হইয়া থাকে। বেদার্থ জ্ঞানময় ব্রহ্মসূত্র যে কুতর্কমূলক অজ্ঞানময় ভাষ্য-জলদে আচ্ছন্ন হইতে পারে না, তাহারই বা প্রবল প্রমাণ কি ?

এই ব্রহ্মসূত্রেরও কল্পনাপ্রসূত বহুভাষ্য বাস্তবিক অর্থ সমাচ্ছাদিত করিয়া উদিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রে যথার্থ অর্থপ্রতিপাদক কয়েকটী ভাষ্যকারের নাম নিম্নে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তদ্‌যথা ঃ—

(১) ভারতী বিজয়। (২) সচ্চিদানন্দ। (৩) ব্রহ্মঘোষ। (৪) শতানন্দ। (৫) উদ্ধত। (৬) বিজয়। (৭) রুদ্রভট্ট। (৮) বামন। (৯) যাদব। (১০) বৃত্তিকারক যৌধায়ন। (১১) দ্রবীড়। (১২) ভর্তৃপ্রঞ্চ। (১৩) শঙ্কর ভারতী। (শঙ্করাচার্য্য) (১৪) ব্রহ্মদত্ত। (১৫) শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য। (১৬) ভাস্কর। (১৭) পিশাচ। (১৮) বিষ্ণুক্রান্ত। (১৯) বাদীন্দ্র। (২০) মাধব দাস। (২১) বিজয় ভট্ট। (২২) শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য। (২৩) শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য। (২৪) শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য। (২৫) শ্রবলদেবাচার্য্য। (২৬) শ্রীরাধারমণ দাস গোস্বামী।

এই সকল পুণ্যকীর্ত্তি ভাষ্যকারগণের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতার্থময় ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন এবং অনেক মহোদয় দুস্তর্ক ঝঞ্ঝাবাতে বিচলিতমস্তিষ্ক হইয়া রজস্বলবুদ্ধিলোচনে যাহা কিছু উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই সূত্রার্থরূপে বিবৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত সূত্রার্থদর্শনে দুর্ব্বলবুদ্ধি জীবগণ অপসিদ্ধান্ত সকলকে সৎসিদ্ধান্তভ্রমে হৃদয়াসনে বসাইয়া সমার্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই অপসিদ্ধান্তসকলের চরণে আত্মসমর্পণ করিলে উপধর্ম্ম আসিয়া ধর্ম্মরাজ্যকে আক্রমণ করে। সুতরাং এই সমস্ত সুপেশল বাগ্‌জাল হইতে আত্মরক্ষা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

ব্রহ্মসূত্রের অপসিদ্ধান্তময় একটী মতের নাম মায়াবাদ। এই মায়াবাদের প্রচারে দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের যে কি অধোগতি হইয়াছে তাহা মেধাবিগণের অগোচর নহে। সকলের সুখ-বোধার্থে সংক্ষেপে মায়াবাদের স্বরূপ নিরূপণ করা যাইতেছে ঃ—

পরব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ, প্রকৃতি (মায়া) জগতের উপাদান কারণ ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। দ্বাপর যুগে যে সময়ে বেদার্থের বিপরীত প্রতীতি আরম্ভ হয়, সেই সময়েই মায়াবাদের সৃষ্টি হয়, মায়াবাদের অপর নাম বিবর্ত্তবাদ।

মায়াবাদের স্বরূপ।

অতাত্ত্বিকোঽন্যথা ভাবো বিবর্ত্তঃ।

রজ্জুতে ভ্রমবশে যদি সর্প-প্রতীতি হয় তাহাই বিবর্ত্ত। মায়াবাদ বলেন অজ্ঞান হেতু ব্রহ্মে জগৎভ্রান্তি হয়। সর্পভ্রান্তি নিবৃত্তি হইলে, রজ্জু যেমন রজ্জু বলিয়াই প্রতিভাত হয়। সেইরূপ জগৎভ্রান্তি নিবৃত্ত হইলে, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর প্রতীতি থাকে না। অতএব এক ব্রহ্ম মাত্র অদ্বয় তত্ত্ব। রজ্জুতে যেরূপ সর্প-প্রতীতি ভ্রমকল্পিত, ব্রহ্মে জগৎ প্রতীতিও সেইরূপ মায়াকল্পিত ভ্রান্তি মাত্র, সুতরাং জগৎ মিথ্যা। এই সিদ্ধান্তের নাম মায়াবাদ; ইহা বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় যে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার দুইটী কারণ আছে। একটি কারণ,—বহিরঙ্গ; অপরটী—অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ কারণ, বাদে বিজিগীষা; অন্তরঙ্গ কারণ,—ভগবদাজ্ঞা। জড়যুক্ত জীবগণ জড়বুদ্ধি ভিন্ন কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগকে প্রবোধ দিতে জড়যুক্তি ভিন্ন আর উপায় নাই। জড় ভাবাপন্ন জীবসকলে দেখিয়া থাকে,—যে কর্ত্তা সেইই আকার ও বিকারসম্পন্ন, পরব্রহ্ম যদি জগতের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে তাঁহাকেও আকার বিকারসম্পন্ন হইতে হয়। আমরা আকার-বিকারসংযুক্ত অতএব অনিত্য। পরব্রহ্ম যদি আকারবিশিষ্ট হন, কাজেই তাঁহাকে আমাদের মত অনিত্য হইতে হইবে। এই দুস্তর্কের উত্তর ভগবদ্ভক্ত ব্যতিরেকে আর কেহই দিতে পারেন না, বিবেক-বৈরাগ্য-বিশদ-চেতা ভগবৎ-প্রসাদ-শুদ্ধ ভক্ত ভিন্ন কেহ বুঝিতেও পারেন না। সুতরাং শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদ এইরূপ জড়যুক্তি দ্বারা নিরস্ত হইয়া অগত্যা মায়াবাদে উপনীত হইলেন।

মায়াবাদ প্রবর্ত্তনের হেতু।

জগৎ কিছুই নয়; ব্রহ্মই তত্ত্ব, পরিদৃশ্যমান সকল প্রপঞ্চরজ্জু সর্পের ন্যায় ভ্রান্তি মাত্র; ভ্রান্তির আধারে কোন বিকার হন না; সুতরাং ব্রহ্ম নির্ব্বিকার। কিন্তু অজ্ঞান ভিন্ন ভ্রম হয় না; অজ্ঞানকে মায়া নাম দিয়া ভ্রমের কারণ

কল্পনা করা হইল। এই সিদ্ধান্তে প্রকৃত পক্ষে মায়াই জগতের কারণ; জগৎ কারণই পরতত্ত্ব; পরিশেষে মায়াকেই পরতত্ত্বের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইল এই কারণেই এই সিদ্ধান্তের নাম হইল মায়াবাদ।

এই মায়াবাদ যে নিতান্ত নির্মূল ও স্বরূপসিদ্ধ, তাহা পরে প্রতিপাদিত হইবে। সম্প্রতি মায়াবাদ হইতে জগতের যতদূর অমঙ্গল ঘটিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে :—

মায়াবাদ জনিত অমঙ্গল।

(১) মায়াবাদ বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত, এতদ্দ্বারা ব্রহ্মবাদরূপ বৈদিক সিদ্ধান্তের অপলাপ হইয়াছে।

(২) ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। যাহা প্রতীতি হয় তাহা ভ্রমমাত্র সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ও ব্রহ্মচারী গৃহস্থাদি আশ্রম সকলও ভ্রান্তি ইত্যাদি কুতর্ক বলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিপ্লুত হইয়াছে, এমন কি ব্রাহ্মণত্বের বিনাশ করিবার নিমিত্ত নবীন উপনিষৎ কল্পনা করা হইয়াছে। হা দুরাগ্রহ! ইহ জগতে তুমি কি না করিতে পার? তোমারই মহিমায় পুরাণ স্মৃতিগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাবলী মিশ্রিত হইল, তোমারই অনুগ্রহে "কাশীমরণান্মুক্তিঃ" ইত্যাদি (বেদে কুত্রাপ্যদৃষ্ট) শ্রুতি সকল কল্পিত হইল। তোমারই আজ্ঞায় বজ্রসূচিক আদি উপনিষৎ সৃষ্ট হইল।

যদিও মায়াবাদ নিজানুগত বাদবীর আচার্য্যগণের দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিনাশের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তথাপি বৈদিক ধর্ম্ম বলিয়া এখনও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অবশিষ্ট ভিত্তি ইতস্তত বিকীর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(৩) যখন বেদ প্রতিপাদিত ঈশ্বর, জগৎ ও ধর্ম্মসকল ভ্রান্তি, তখন প্রতিপাদ্য অর্থের অভাবে প্রতিপাদক শব্দরাশি যে বেদ,—তাহাও মিথ্যা। কারণ বেদ সত্য হইলে নিত্য হয়, নিত্য হইতে বেদ ও ব্রহ্ম দুইটী তত্ত্ব দাঁড়ায় তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি হয় না সুতরাং বেদও মিথ্যা।

জীবগণ সর্ব্বদা বৃত্তির দাস। সদ্বৃত্তি পরিচালন ও দুর্ব্বৃত্তি-দমনের একমাত্র উপায় ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম যদি মিথ্যা ও মায়াকল্পিত ভ্রমমাত্র হয়, তবে দুর্ব্বৃত্তিসমূহকে কে দমন করিতে পারে? ধর্ম্মভয় মানসপট হইতে বিদূরিত হইলে কুবৃত্তি-নিচয়ের নিবারণের উপায় অত্যন্ত অল্প। তখন কেবল মাত্র সামাজিক প্রথা

দ্বারা সমাজ শাসিত হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মভূত জীব সামাজিক লজ্জা কি করিতে পারে? তাহাতে আবার উহা যদি যুক্তির বল প্রাপ্ত হয়, তবেত কথাই নাই। জীব যখন গললম্বিত রুদ্রাক্ষমালা ও গৈরিক বসন বিভূষিত হইয়া ব্রহ্ম সাজিলেন, তৎক্ষণই তিনি বিধিনিষেধাতীত জীবন্মুক্ত নিস্ত্রৈগুণ্য পথচারী হইলেন। নির্লেপ ও নিরঞ্জন ব্রহ্মকে আর কি ধর্ম্মাধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে?

ক্রমশঃ।

প্রেমময়ী-চিন্তা।

(বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পঠিত।)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ গোসাঞি লিখিত।)

একদা ভাদ্রের অপরাহ্নে অত্যন্ত গ্রীষ্ম হওয়ায় আমি রুগ্ন দেহ লইয়া গঙ্গা তীরে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলাম। সঙ্গে প্রেমময়ী চিন্তা সহচরী থাকায় নদীতীর একটু দূর হইলেও আমার হাঁটিয়া যাইতে বিশেষ কষ্ট বোধ হইল না। আমি তাহার সহিত ধীরে ধীরে নদী তটে উপস্থিত হইলাম। তবে রাস্তায় কয়েকটা স্থানে আমাকে কিছু বিব্রত হইতে হইয়াছিল—একটী স্থানে একজন গাড়োয়ান অশ্ব রজ্জু সংযত করিয়া হিন্দি ভাষায় আমাকে সরিয়া যাইতে আদেশ করিতেছিল। আমি চকিত হইয়া দেখি—কোচম্যানের অশ্ব গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে আর কি। আমি অমনি সরিয়া গেলাম। আর একটী স্থানে চাহিয়া দেখি—একটি লোক আমার সম্মুখে—মুষ্টিবদ্ধ হস্ত পরিমিত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে; আমি একপাশ হইবার মানসে বাম দিকে সরিয়া দাঁড়াইলাম, লোকটীও তাহাই করিল। আমি দক্ষিণ দিকে সরিলাম, সেও দক্ষিণে আশ্রয় লইল। এইরূপে দুই তিন বার ঠোকাঠুকির পর আমরা পরস্পর পরস্পরের বাধা অতিক্রম করিলাম। আর একটি স্থানে এক খানি ইষ্টক খণ্ডে আহত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিলাম, ভাগ্যে ভাগ্যে বাঁচিয়া গেলাম। স্ত্রীলোককে লইয়া রাস্তায় বাহির হইলেই এই প্রকার বিপদে পড়িতে হয়। সচরাচর

লোকে বলিয়া থাকে "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" আমি শ্রীমতী চিন্তাকে লইয়া বাহির হইয়াছি সুতরাং আমার বিড়ম্বনা বিচিত্র নহে।

নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখি সূর্য্যদেব লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলে যাইতেছেন। তাঁহার কিরণ সকল ধরাবক্ষঃ হইতে বিদায় লইয়া বৃক্ষের মস্তকোপরি আশ্রয় লইয়াছে। নানা বর্ণের মেঘে আকাশের শোভা বিচিত্র ও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। তরঙ্গাকুল নদী বক্ষেঃ অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শান্তরশ্মি পতিত হইয়া অপূর্ব্ব চাকৃচিক্যের বিকাশ করিতেছে। সমীরণ নদীর সরস বক্ষেঃ সন্তরণ করিয়া স্নিগ্ধ হইয়া শ্রান্ত ও তাপিত ব্যক্তি দিগকে আলিঙ্গন করিতে করিতে গন্তব্য পথে গমন করিতেছে। প্রকৃতির কি মনোহর মূর্ত্তি! কি রমণীয় সৌন্দর্য্য! আমি এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছি—হঠাৎ চিন্তা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল—"ভাই আমন! দেখ দেখ প্রাণবল্লভের প্রণয় চুম্বনে প্রকৃতি সুন্দরীর গণ্ড কেমন আরক্তিম হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম চিন্তে! উহা যে সূর্য্যাস্ত। সূর্য্যদেব লোহিত বর্ণধারণ করিয়া অস্তাচলে যাইতেছেন। চিন্তা বলিল ছিঃ তুমি কি নীরস, প্রেম জান না। আমি বলিলাম তুমিইত আমার সঙ্গিনী তবে জানাইয়া দেওনা কেন? চিন্তা বলিল তবে শুন, তুমি বৃক্ষের মস্তকোপরি স্নিগ্ধ সূর্য্যরশ্মি বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছ, প্রেম নয়নে চাহিয়া দেখিলে, দেখিবে প্রকৃতি সুন্দরী প্রাণবল্লভের প্রণয় সম্ভাষণে গ্রীবা নত করিয়া মুচকি হাসিতেছেন। ঐ যে নানা মেঘ পুঞ্জে সুশোভিত বিচিত্র অম্বর, উহা আকাশ নহে, প্রকৃতির নানা কারু কার্য্য শোভিত পট্টাম্বর। সুন্দরী, বল্লভের মন ভুলাইতে কি অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছেন। আর ঐ যে ভাদ্রের ভরপুর নদীবক্ষঃ দেখিতেছ, উহা প্রকৃতির প্রেমভরা বুক। তুমি বলিবে নদী নাচিয়া নাচিয়া সাগর সঙ্গমে—ছুটিয়াছে, প্রেমিক বলিবে উহা নদী স্রোত নহে, প্রকৃতি প্রেম প্রবাহে প্রাণনাথের প্রণয় সম্ভাষণে চলিয়াছে। জল কল্লোলই তাহার প্রণয় ভাষণ। তুমি দেখিতেছ সমীরণ মন্দ মন্দ বহিয়া তাপিত ও শ্রান্ত ব্যক্তিগণের ক্লান্তি অপনোদন করিতেছে, প্রেমিক দেখিতেছে, প্রকৃতি সতী স্বীয় অঞ্চল দ্বারা প্রিয়তমের প্রচণ্ড রবিকর দগ্ধ মুখ খানির ঘর্ম্মবিন্দু মুছাইয়া চামর ব্যজন করিতেছেন, এবং অবসর মত একএক বার আসিয়া শ্রান্ত ও

তাপিত জীবগণকে স্বামী সেবায় যে কি আনন্দ তাহাই শুনাইয়া বলিতেছেন—"কে যাবি আমার সঙ্গে, বিপিন বিহারী রঙ্গে, ঝট চল হেরি গিয়ে বৃন্দাবণ পতি"। চিন্তামণির সার গর্ভ বচনে আমার চৈতন্যোদয় হইল, আমি তাহার অনুরাগ ভরা মূর্ত্তি খানিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম। সেও আমাকে দৃঢ় ভাবে আলিঙ্গন করিয়া কোথায় যেন লইয়া চলিল, ক্রমে একটি প্রশস্থপথে আসিয়া দাড়াইলাম, সে পথটির নাম তন্দ্রাপথ, আমি চিন্তার অনুগমন করিতে করিতে বলিলাম—জড়া প্রকৃতি এমন করিয়া ভালবাসিতে জানে, আর আমি তাঁহার কণাশক্তি—জীব হইয়া তাঁহাকে ভালবাসি না! বড় লজ্জার কথা! চিন্তা রুক্ষস্বরে বলিল, ভালবাসিতে কেহ কি নিষেধ করে? কথাটা আমার কর্ণে বড়ই বাজিল। রাগ হইল। আমি অভিমান ভরে বলিলাম, ভালবাসিব কেন? তিনি সকল শক্তি গুলিকেই বামে লইয়া কত আদর কত সোহাগ করেন আর আমি না হয় তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিই হইলাম আমার দিকে কি একবার ফিরিয়া চাহিতেও হয় না? তিনি স্বয়ং হ্লাদিনী শক্তিকে বক্ষেঃ লইয়া বিলাস করিতেছেন। বিরাট মূর্ত্তিতে মায়া শক্তিকে সম্ভোগ করিতেছেন এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু মূর্ত্তিতে লক্ষ্মীকে, হর মূর্ত্তিতে গৌরীকে ব্রহ্ম মূর্ত্তিতে সাবিত্রীকে ও রাম মূর্ত্তিতে সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন সর্ব্বত্রই তো যুগল, তবে কি আমাকে একবার চরণ প্রান্তে বসিতে দিতেও হয় না। তাঁহার অনন্ত শক্তি তন্মধ্যে তিন শক্তি প্রধান। প্রথম চিৎশক্তি, দ্বিতীয় জীব শক্তি, তৃতীয় মায়াশক্তি।

বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি রিষ্যতে॥ (বিষ্ণু পুরাণ)

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তির নাম পরা। জীব শক্তির নাম অপরা ও মায়া শক্তির নাম কর্ম্ম সংজ্ঞা। বিষ্ণুর এই তিন শক্তি উপলব্ধি হয়। গীতাতেও তিনি নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, জীব তাঁহার একটী শক্তি বা প্রকৃতি।

অপরেয়মিত স্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহা বাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত নিকৃষ্টা অপরা নাম প্রকৃতি হইতে ভিন্না আর একটী জীব রূপা পরা নামে প্রকৃতি আছে তাহা তুমি জান, যে পরা প্রকৃতি এই জগতকে ধারণ করে।

দেখ চিন্তে! যদি তাহাই হইল, তবে তিনি আমাকে দূরে সংসার কূপে ফেলিয়া রাখিয়াছেন কেন? আমি কি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্যা নহি? চিন্তা হাসিয়া বলিল আচ্ছা মেয়ে বটে তুমি? অত রাগ করিলে কি চলে? তুমি রাগান্ধ, কামান্ধ তাই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ না। তুমি অহঙ্কারে গ্রীবা বক্র করিয়া আছ তাই তাঁহার মধুর মূর্ত্তি তোমার দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। তিনি যখন ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সহিত বিরাজিত তখন অবশ্য তোমার নিকটেও কোন এক মূর্ত্তিতে রহিয়াছেন। তুমি আত্মাভিমান ও আত্মসুখ লইয়া ব্যস্ত আছ দেখিবে কি রূপে? চিন্তা এই বলিয়া কঠোপনিষদের একটী শ্লোক আবৃত্তি করিল ঃ—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য ন শন্নন্যোহভি চাকশীতি ॥

দুইটী সুন্দর পাখী এক বৃক্ষে বাস করিতেছে, উহারা উভয়ে উভয়ের সখা। তাহাদের একজন সুমিষ্ট ফল ভোগ করিতেছে অপর জন অনশনে থাকিয়া কেবল দেখিতেছেন।"

চিন্তার কথায় আমার বড় লজ্জা হইল। ভাবিলাম তাইত; প্রাণনাথ আমার হৃদয়ে বসিয়া প্রেমনয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছেন, আর আমি হতভাগিনী কোথায় তাঁহার সেবা করিব, না তাঁহাকে সম্মুখে থুইয়া আত্মোদর পুরণার্থ সুমিষ্ট বোধে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি। আমার তুল্য পিশাচী ও মূঢ়া আর কে আছে? অর্জ্জুন একদিন এই কর্ম্মফল ভোগ করিতে যাইতেছিলেন দেখিয়া ভগবান বলিয়াছিলেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্ ॥

"হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কর্ম্মকর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর; যাহা তপস্যা কর ইহার ফল আমাতে অর্পণ কর।"

আমি যদি বুদ্ধিমান হইতাম তবে তাহার অভিপ্রায়ানুসারে অর্জ্জুনের মত তাঁহাকেই কর্ম্মফলটী প্রদান করিতাম। আর যদি ব্রজ দেবীদের তুল্য আমার সৌভাগ্যের উদয় হইত তবে বলিতাম নাথ! এই কর্ম্মফলটী সুমিষ্ট হইলেও ইহাতে মাদকতা আছে আমি ভোজন করিলেই বিমনা হইয়া পড়িব তোমার চাঁদ

বদন দেখিতে পাইব না প্রাণ ভরিয়া তোমার সেবা করিতে পাইব না, সুতরাং আমি ইহা খাইব না। আর আমিই যাহা অখাদ্য জ্ঞান করিলাম হে প্রিয়তম! তাহা তোমাকেই বা অর্পণ করিব কি করিয়া, অতএব তোমাকেও দিব না আমি এই সকল কথা বৃক্ষকে ডালে মূলে উপাড়িয়া যমুনার জলে ভাসাইয়া দিব। যদি বল—"তবে তুমি আমাকে কি দিয়া সেবা করিবে"। আমি বলিব—"এই দেখ আমার প্রেম বৃক্ষে অনুরাগ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাতে ভাবরূপ ফল ধরিয়াছে, হে ভাবগ্রাহিন্! আমার এই ভাব ফলটী গ্রহণ কর"। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অনুরাগে আমার গণ্ড দেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল আমি নিমেষ হীন অবস্থায় নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহিলাম। চিন্তা এই অবসরে আমাকে এক স্বপ্ন রাজ্যে লইয়া চলিল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম আমি শোক দুঃখাতীত পরম সুখদ—পরমানন্দ ময় একটী রমণীয় স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণ যাঁহা ধন তাঁহা বৃন্দাবণ নাম ॥
চিন্তামণি যাঁহা ভূমী রত্নের ভবন। চিন্তামণিগণ দাসী চরণ বিভূষণ ॥
কল্পবৃক্ষ লতা যাঁহা সাহজিক বন। ফল ফুল বিনা কেহ না মাঁগে অন্যধন ॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে। দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাঁগে অন্যধনে ॥
সহজলোকের কথা যাঁহা দিব্যগীত। সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত ॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান। চিদানন্দ রসাস্বাদ যাঁহা মূর্ত্তিমান ॥
সলক্ষ্মীজনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ। কৃষ্ণ বংশী করে যাঁহা প্রিয় সখি কাজ ॥

(ব্রহ্ম সংহিতোদ্ধৃত শ্লোকের পয়ার টীকা চরিতামৃত)

আমি তথায় উপস্থিত হইতে না হইতেই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ দায়িনী হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপা সখিগণ আমার সন্তোষ বিধানার্থ প্রেমানন্দে হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া, আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—সখি! আইস, কান্ত সম্ভোগ করিবে আইস? তাঁহাদের চিদানন্দময় দেহের সংস্পর্শে আমার সকাম ধর্ম্মলোপ পাইল। আমি লজ্জিত হইয়া মনে মনে বিচার করিলাম, ছিঃ! আমি কি কামুকী! আত্ম সুখের জন্য স্বামী সেবা করিতে আসিয়াছি। পতির সুখ সম্পাদন করাই সতীর কর্ত্তব্য। পতি সুখেই যাহার সুখ, পতির প্রিয় কার্য্য সাধনই যাহার

করণীয়, পতি সেবাই যাহার ব্রত, সেইত রমণীর শিরোমণী। শ্রীমতী রাধিকা বলিয়াছেন ঃ—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্হতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব না পরঃ ॥

এতটা জোরের কথা প্রাণের পূর্ণ টান না থাকিলে শুধু কর্ত্তব্যানুরোধে আইসে না। আত্ম সুখ বর্জ্জিত অপরিসীম অনুরাগ না থাকিলে এরূপ বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী সর্ব্ব প্রধানা শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি, এই শক্তি প্রভাবে সুখ স্বরূপ কৃষ্ণ সুখাস্বাদন করেন এবং সেই কৃষ্ণ সুখে ভক্ত গণের হৃদয়ে যে অপ্রাকৃত সুখের উদয় হয় তাহাই হ্লাদিনী শক্তির কার্য্য। এই হ্লাদিনী শক্তির সারাৎসারমুর্ত্তি শ্রীমতি রাধিকা। আমি সেই শ্রীরাধিকার সখিগণের আলিঙ্গনে আবদ্ধা হইয়া আত্ম সুখ ভুলিয়া গেলাম, প্রাণনাথের সেবা সুখের জন্য প্রাণ নাচিয়া উঠিল। এমন সময় নবঘনশ্যাম অর্থাৎ শান্তঘন মূর্ত্তি এক পরম পুরুষ লাবণ্য ধারা বর্ষণ করিতে করিতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার অপার সৌন্দর্য্য দর্শনে বিভোর হইলাম এবং ভাবে গদ গদ হইয়া তাঁহার চরণ প্রান্তে পড়িয়া গেলাম। তিনি আমাকে আদর করিয়া উঠাইলেন এবং প্রণয় বিনম্র চিবুকে হস্তার্পণ করতঃ প্রেম নয়নে চাহিয়া বলিলেন—

"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্তে সুর-বন সম।

আমাকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া সহচরী চিন্তা বলিয়া উঠিল ঃ— দেখ দেখি, মায়া নাম্নী গোদাবরী নদী তটে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চবটে সমাহার, মর্ত্তে সুরবন সম দেহরূপ পঞ্চবটীর বৃক্ষ চূড়ে অর্থাৎ হৃদিশিরোদেশে, কপোত কপোতির ন্যায় তোমরা দুজনে নীর বাধিয়াছিলে কি না? উপনিষদের সেই কথাটী আবার মনে পড়িল ঃ—

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তানশ্নন্ন্যোঽভিচাকশীতি ॥

চিন্তা বলিল— আর না। চল, যথেষ্ট হইয়াছে অগত্যা আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিন্তার ইঙ্গিত মতে স্বপ্ন রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম। যাইবার সময় মনটী প্রাণনাথের চরণে রাখিয়া গেলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীবংশীবদন ঠাকুর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস গোস্বামি মহোদয় লিখিত।

—:০:—

"সেই রসরাজ রূপ দেখহে আমার।
গোপনে রাখিবে ইহা না কর প্রচার॥"
ইহা কহি প্রভু দেখাইল স্ব স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥ বঃ শিঃ

বালক বংশীবদন প্রভুর এই রসরাজ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া প্রভুর পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে তাঁহার চেতনালাভ হইলে তিনি নয়ন মিলিয়া দেখিলেন তাহার সম্মুখে তাহার প্রাণ গৌরাঙ্গই রহিয়াছেন।

রূপ দেখি বংশী হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিত।
ধরিতে না পারি হিয়া পড়িলা ভূমিত॥
তবে প্রভু হস্ত স্পর্শে করান চেতন।
পুনঃ গৌর দেখি বংশী সুবিস্মিত হন॥ বঃ শিঃ।

প্রভু তখন বংশীবদনকে আদর করিয়া প্রেমালিঙ্গন দান দিয়া কৃতার্থ করিলেন। আর কত সম্মান করিলেন তাহা শ্রবণ করুন।

তবে আলিঙ্গিয়া প্রভু কৈলা আশ্বাসন।
তোমা বিনা মৎস্বরূপ কে করে দর্শন॥
মোর তত্ত্বলীলা রস তোমায় গোচরে।
অতএব স্ব স্বরূপ দেখানু তোমারে॥

গৌর-অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
কৃষ্ণ বিনা রাধা নাহি স্পর্শে অন্য জন॥
রাই ভাবে বিভাবিত করি আত্ম মন।
স্বশ্যাম মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন॥
তব কাছে মোর কিছু গুপ্ত নাই কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেম বলে জান সব মর্ম্ম॥
গোপনে রাখিও তাঁহা না কর প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস॥
আমিও বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব উভয়েতে হই সমতুল॥ বঃ শিঃ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া বংশীবদন আনন্দে গদ গদ হইলেন। প্রাণ ভরিয়া কান্দিলেন এবং প্রভুকে স্তব করিলেন। স্তবান্তে এই বলিয়া প্রণাম করিলেন।

বৃন্দাবনান্তরে রম্যে রাসোৎসব সমুৎসুকং।
রাস মণ্ডল মধ্যস্থং নমামি রসিকেশ্বরং॥

প্রণামান্তে কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিলেন :—

জগত মঙ্গল এই তব উপদেশ।
শুনিয়া কৃতার্থ মুঞি হইনু বিশেষ।
কর্ম্ম জ্ঞান আদি তম দূরেতে যাইল॥
জাত্যাদির অভিমান সকল ঘুচিল।
প্রেমময় চক্ষু মোর হইল এখন॥
এত দিনে হৈল প্রভু সফল জনম॥ বঃ শিঃ।

বালক বংশীবদন এইরূপ কাতরোক্তির সহিত প্রভুর নিকটে আত্ম নিবেদন করিয়া নিম্নলিখিত নিজকৃত শ্লোকে পুনর্ব্বার তাহাকে প্রণাম করিলেন :—

অচিন্ত্য শক্তয়ে তুভ্যং নমো নমো মহাপ্রভো।
অয়ং মহোপদেশস্তে সর্ব্বেষাং বিদধাতু শং॥

বালক বংশীবদনের প্রতি প্রভুর দয়ার সীমা নাই। ব্রজের যাহা কিছু নিগূঢ় রস আছে শ্রীগৌরাঙ্গ একে একে সকলি তাহা বংশীবদনকে বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

ব্রজের নিগূঢ় রস লীলাতত্ত্ব যত।
বংশীর নিকটে প্রভু কৈলা যথা মত॥

প্রভু বালক বংশীবদনকে রসরাজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন। রস তত্ত্বসার মাধুর্য্যরস রত্ন-চিন্তামণি কিরূপে প্রভু বংশীবদনকে বুঝাইলেন তাহা শ্রবণ করুন।

তামা কাঁসা রূপা সোণা রত্ন-চিন্তামণি।
কেহো যদি কাঁহা পোঁতা পায় একখানি॥
ক্রমে উঠাইতে সেই ধাতুত্তম পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
শান্ত তামা দাস্য কাঁসা সখ্য রূপা গনি।
বাৎসল্য সোণা শৃঙ্গার রস চিন্তামণি॥
করমের ফলে মাত্র তামা লাভ হয়।
জ্ঞানের ফলেতে কাঁসা লাভ সুনিশ্চয়॥
কর্ম্ম মিশ্রা ভক্তি ফলে রূপা লাভ জানি।
জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি ফল সোণা লাভ মানি॥
সু বিশুদ্ধা ভক্তি প্রেম পীরিতের ফলে।
রত্ন চিন্তামণি লাভ মহাজনে বলে॥
খনিতে সকল ধাতু বিরাজ করয়।
ভাগ্য অনুসারে কিন্তু লাভালাভ হয়॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট বালক বংশী বদন রসতত্ত্বের পূর্ণ শিক্ষা পাইলেন। শ্রীগৌর ভগবানের কৃপা বলে বংশীবদনের যেন পুনর্জন্ম হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে রসরাজ নটবর শ্রীকৃষ্ণ মুর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে তাঁহার বাল হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল। শ্রীগৌরাঙ্গ বালক বংশীবদনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে থাকিয়া কলির জীবকে শ্রীকৃষ্ণ ভজন শিক্ষা দিতে আদেশ করিলেন। গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন তিনি স্বয়ং আচরিয়া কলির জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার অবতারের কারণ। সে কথা শ্রীগৌরাঙ্গ বালক বংশীবদনকে বলিতে ভুলিলেন না। বংশীবদনের হস্ত ধারণ করিয়া প্রভু বলিলেন :—

তবে প্রভু শ্রীবংশীর ধরি দুটী হাত।
হাসিয়া মধুর স্বরে কন এই বাত॥
নিজের ভজন ব্রজ গোপী অনুসার।
জানাইতে হেনু আমি গৌরাঙ্গাবতার॥
তেঁই কহি মো স্বরূপ না কর প্রকাশ।
তোমার কাছেতে এই কহিনু নির্য্যাস॥

প্রভুর নিকট এই সমস্ত রস তত্ত্ব কথা উপদেশ পাইয়া বংশী বদন কৃতার্থ হইলেন। সমস্ত রাত্রি প্রভুর সহিত কৃষ্ণ কথা কহিয়া অতিবাহিত করিলেন।

এইরূপে এক রাত্রি প্রভু বংশী সঙ্গে।
গোঙাইলা মহাপ্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥

তাহার পরদিন প্রাতে প্রভুকে প্রণাম করিয়া বংশীবদন গৃহে গমন করিলেন। গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। দুই দিন পরে পুনরায় বংশীবদন প্রভুর নিকটে চলিয়া আসিলেন।

প্রভুর নিকট শিক্ষা লভিলা বদন।
প্রভুরে প্রণাম করি গেলা স্বভবন॥
দুই দিন পরে পুনঃ প্রভুর পাশেতে।
শ্রীবংশীবদন আসে বিষন্ন মনেতে॥

বিষন্ন মনে কেন? পাঠক বুঝিতে পারিলেন কি? প্রভু সেই দিন গৃহত্যাগ করিবেন। প্রভুর আদেশ বংশীবদন গৃহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবেন। বংশীবদনের সুন্দর বদন খানি আজ মলিন বিষাদ মাখা। প্রভুর নিকটে যোড় হস্তে দণ্ডায়মান। যেন কত অপরাধী। শ্রীগৌরাঙ্গ সাশ্রুনয়নে বংশী বদনের নিকট বিদায় লইবার কালীন বলিলেন:—

বিদায়ের কালে প্রভু কহেন বদনে।
গৃহে রহি ভজ তুমি শ্রীনন্দনন্দনে॥
তোমা হইতে রসরাজ কৃষ্ণের ভজন।
শিক্ষালাভ করিবেক বহু বহু জন॥
মোর বাক্যে রহি গৃহে কলি জীব জনে।
কৃষ্ণাকৃষ্ট করি কর প্রভুত্ব রক্ষণে॥

প্রভুর কথায় বালক বংশীবদন বড়ই লজ্জা পাইলেন। বংশীবদন বালক হইলেও পরম বৈষ্ণব। বিনয়ের অবতার। প্রভুত্ব রক্ষণ করিতে হইবে প্রভুর মুখে এই আদেশ বলিয়া বংশীবদনের হৃদয়ে একটী ভাবের উৎস উঠিল। সেই উৎসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। সেই সকল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত তাহার বাল হৃদয় উদ্বেলিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন প্রভুত্ব আবার কি? শ্রীগৌরাঙ্গের দাসের দাস হওয়া অপেক্ষা অন্য প্রভুত্ব কিছুইত চাহি না। যে দিন সেই প্রভুত্ব পাইব, শ্রীগৌরাঙ্গের দাসের দাস বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব, সেই প্রভুত্ব স্বীকার করিব। বংশীবদনের মনে এই ভাবের উদয় হইল।

প্রভুর বচন শুনি কহে শ্রীবদন।
আমার প্রভুত্ব প্রভু নাহি প্রয়োজন॥
তোমামার দাসের দাস হৈতে মুক্তি চাই
সেই সে আমার নাথ জানিহ বড়াই॥
এই বর দেহ মোরে জীবন নিমাই।
তোমার দাসের দাস যেন হ'তে পাই।
তোমার দাসের দাস যে দিন হইব।
সে দিন প্রভুত্ব মোর হইল জানিব॥
তোমার দাসের দাস হওয়া জীবগণে।
যবে তুয়া গৌর নাম করাব কীর্ত্তনে॥
হা গৌরাঙ্গ। হা গৌরাঙ্গ। ব'লে জীবগণ।
যখন করিবে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন॥
তখনি জানিব মোর হইল ঠাকুরাই।
তখনি জানিব মোর বড়ই বড়াই॥

শ্রীগৌর ভগবান প্রিয়ভক্ত বংশীবদনের হৃদয়ে আবির্ভাব হইয়াছেন। বংশীবদন তখন আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না। চতুর্দ্দিক গৌরময় দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভজন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তর্য্যামী। তিনি সকলি বুঝিলেন। তখন চতুর শিরোমণি আবার চাতুরী জাল বিস্তার করিলেন। ভক্তের নিকট তিনি চিরকালই প্রচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসেন। এই জন্যই তাঁহার নাম কলির প্রচ্ছন্নাবতার। শ্রীগৌরাঙ্গ বংশীবদনকে অতি ধীরে ধীরে মধুর বচনে কহিলেন :—

ক্রমশঃ।

১২শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩৩২।

ভক্তি

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

ভক্তির্ভগবত সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌॥

"ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল" কর্ত্তৃক পরিদর্শিত।

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভক্তি কার্য্যালয়,
ভাগবতাশ্রম, কোঁড়ার বাগান, হাওড়া
হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হাওড়া
ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টীং ওয়ার্কস্‌
হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। প্রতি খণ্ড ৵০ দুই আনা।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
প্রার্থনা	সম্পাদক	৩৩
চিত্তবিনোদ	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ	৩৪
বংশীবদন	শ্রীহরিদাস গোস্বামী	৩৫
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন	শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র বি, এল,	৪১
শ্রীরাধা	শ্রীশশীভূষণ সরকার	৫২
প্রেমময়ী চিন্তা	শ্রীগোপীবল্লভ গোসাঞি	৫৩
মাতৃচরণে নিবেদন ও গুরুপদভরসা	সম্পাদক	৫৭
দীনবন্ধু জীবনী	শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫৯
কাঙ্গালের মনের কথা	শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য	৬৬
সৃষ্টিতত্ত্ব	শ্রীচারুচন্দ্র সরকার	৭০
ভক্তকুঞ্জ	শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়	৭৫

পাথরের উৎকৃষ্ট ব্রেজিল চসমা।

যথানিয়মে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অথবা চক্ষু পরীক্ষক ডাক্তারদিগের ব্যবস্থানুসারে চসমা বিক্রয় করি। ইহাতে কোন ত্রুটী লক্ষিত হইলে ১মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিই, ষ্টীল চসমা ৬৲, রূপার ১০৲, সোনার ২৫৲, হইতে ৩৬৲ টাকা। আইপ্রিসারভার ১৲।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ তাঁহাদের বয়স ও দিবালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কিরূপ দেখিতে পান, লিখিলে ঠিক চক্ষের উপযোগী চসমা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান যায়।

রায় মিত্র এণ্ড কোং।

১৮ নং ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ব্রাঞ্চ দোকান, পটুয়াটুলি, ঢাকা।

শ্রী শ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন। সন ১৩২০ সাল।

প্রার্থনা।

—ঃ০ঃ—

ত্বদেকং স্মরাম স্তদেকং জপাম
 ত্বদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
 ভবাম্ভোধি পোতং শরণং ব্রজামঃ॥

হে সর্ব্বেশ্বর! আমরা কলি-কলুষিত দুর্ব্বল জীব, এই দুর্ল্লঙ্ঘ্য ভবসমুদ্রে পতিত, ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় একমাত্র তোমার শ্রীপদতরী। সুখ সুখ করিয়া জীব অবিরত ঘুরিতেছে, কিন্তু সুখ শান্তিলাভ করিতে হইলে যে, তোমার নামগুণানুকীর্ত্তন, তোমাকেই জগৎসাক্ষিরূপে জানিয়া প্রণাম করিয়া তোমার ভাবে বিভোর থাকা জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা বুঝেনা, আর ইহা না বুঝিয়াই তোমার ভাব ছাড়া হইয়া দূরে যাইয়া পড়িতেছে ও নিরন্তর অসহ্য দুঃখানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া থাক্‌ হইতেছে। হে মঙ্গলময়! হে বিশ্বেশ্বর! এই বিশ্বের তুমিই আধার, জীবের তুমিই একমাত্র অবলম্বনীয়, ভবভয় নিবারণের জন্য আমরা তোমার শরণ লইলাম আমাদিগের ন্যায় কলুষিত জীবের প্রতি সদয় হও।

দয়াময়! আমি অতি দীনহীন আমার এমন কোনও সাধন ভজন নাই যে, তদ্বারা তোমায় ভাল বাসিব বা ভক্তি করিব। যাহার পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতি থাকে সেই-ই তোমাকে চিনিতে পারে, তোমাকে ভক্তি করিতে পারে, আমি নিতান্ত বহির্ম্মুখ। অযাচিত ভাবে অবিরত তোমার অজস্র করুণার

পরিচয় পাইয়াও তোমার মহিমা বুঝিতে পারিতেছি না, বা তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। সাধু গুরুমুখে তোমার সেবা পূজাদির কথা শুনিয়াছি মাত্র কিছুই করিতে পারিতেছি না, যদিও তুমি কিছুরই প্রত্যাশী নও বা তোমার কিছুরই প্রয়োজন নাই, তথাপি আমাদের দুষ্কর্ম্মজনিত ফলভোগ ক্ষয় করিয়া তোমার পরমানন্দময় ভাবে বিভোর থাকিবার একমাত্র উপায়ই যে তোমার সেবা। যেভাবেই হউক ফল ফুল ভাব ভক্তি অথবা অন্য যে কোন প্রকারেই হউকনাকেন তোমার সেবাতো করা চাই-ই। আমি এমনই ভাগ্যহীন এমনই মায়াক্লীষ্ট যে, কোন প্রকারেই তোমার সেবা করিতে পারিতেছিনা। বৃথা কাযে, অনিত্য সংসারের অসার খুঁটী নাটী লইয়া অকারণ ঘুরিয়া মরিতেছি। দিনেদিনে নির্দ্দিষ্ট দিনকয়টীও গত হইতেছে। নানাপ্রকার জরা ব্যাধিতে শরীর ক্ষীণ হইতেছে, হৃদয়ের আশা প্রাণের বল উৎসাহ দিন দিন যেন ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে, মন সর্ব্বদাই চঞ্চল সদাই যেন কি একটা পদার্থের জন্য উধাও প্রাণে ছুটিয়াছে।

প্রভো! তবুতো তোমাকে মনের মত—ডাকার মত করিয়া ডাকিতে পারিতেছিনা, তবুতো তোমার মধুর হইতেও সুমধুর সেবা করিতে পারিতেছি না, হে অনাথবন্ধো! তুমি দুর্ব্বলের বল, বিপদের কাণ্ডারী, নিরুপায়ের উপায় তোমার দয়ার সীমানাই। আমাকে আর তোমার সেবা ভুলাইয়া দুঃখ দিওনা, আমি আশ্রয়হীন আমার একমাত্র আশ্রয় একমাত্র বিশ্রাম স্থল তোমার ঐ বিরিঞ্চি বাঞ্চিত অভয় চরণ, দেখ দেখ দয়াময়! অযোগ্য বলিয়া—সেবাপরাধী বলিয়া যেন পায় ঠেলিওনা, কাতর প্রাণে এইটীই আমার প্রার্থনা। আমায় তোমার ভাবে মজাইয়া রাখ।

দীনেশচন্দ্র শর্ম্মা।

চিত্তবিনোদ।

—:০:—

চিত্তবিনোদ মূর্ত্তি মধুর
স্বর্গ আমার—আমার মা।
জীবনে মরণে সাধনা যে মোর
ও চারু চরণ চন্দ্রমা।

লুকান' বক্ষে হৃদয় কক্ষে
আমার দেবতা—আমারি তা।
চিত্ত বিনোদ মূর্ত্তি মধুর
স্বর্গ আমার—আমার যা।
মুক্ত আকাশ মুক্ত বাতাস
বিঘোষিছে তাঁর মহিমা যে।
কাননে কাননে খুঁজিছে কোকিল
"জগতের গুরু আমার সে।
লঙ্ঘিতে গিরি পঙ্গু জনেরে
শক্তি প্রদানে যাঁর কৃপা।
চিত্ত বিনোদ মূর্ত্তি মধুর
দীপ্ত দেখাতে আমার তা' ॥
সে যে অনন্ত—বেদ বেদান্ত
কেমনে ধরিবে অ-ধরে গো।
সান্ত সে মোর, শান্তির সুধা
উছলিত তাঁর অধরে তো।
কবে আমি হায় ধরিব মাথায়
অধর চাঁদের নধর পা।
চিত্তবিনোদ দীপ্ত মধুর
গৌর আমার বিশ্বপা।

শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

বংশীবদন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস গোস্বামি মহোদয় লিখিত।)

—:•:—

বংশীর বচন শুনি কন মহাপ্রভু।
ওহে বংশী এই বাত না বলিহ কভু॥

আমারে গোপন তুমি সতত করিবে।
প্রকাশিলে আশা মোর বিফল হইবে॥
মোর নাম গন্ধ ছাড়ি হইয়া সতৃষ্ণ।
সর্ব্ব জীবে ভজাইবে রসরাজ কৃষ্ণ॥
রসরাজ কৃষ্ণ বিনা গতি নাহি আর।
কৃষ্ণ জানাইতে এই মোর অবতার॥
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজন আর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ।
চারিযুগে জয়যুক্ত জানি সর্ব্বক্ষণ॥

বালক বংশীবদন স্থির চিত্তে প্রভুর বদন চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কি ভাবিলেন। প্রভুর বাক্ চাতুরী সকলি বুঝিলেন। চতুর শিরোমণির চাতুরী ভক্তের নিকট পরাজয় মানিল। বংশীবদন মনের ভার আর লুকাইতে না পারিয়া প্রভুকে কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন।

যে কৃষ্ণ সে তুমি প্রভু যে তুমি সে কৃষ্ণ।
মোরে ভাণ্ডাইছ বুঝি দেখি অপকৃষ্ট॥

শ্রীভগবান ভক্তের নিকট পরাজিত হইলেন। ভক্তের জয় হইল। ভক্তের জয় সর্ব্বত্রই! শ্রীগৌর ভগবান তখন দায়ে পড়িয়া নিজ ভগবত্তা ও স্বরূপ স্বীকার করিলেন। প্রিয়তম ভক্ত বংশীবদনের হস্ত দুইখানি ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন।

তবে মহাপ্রভু কন ওহে শ্রীবদন।
মোর এই বাক্য প্রভু না কর লঙ্ঘন॥
যত দিন করিব মুই প্রকট বিহার।
তত দিন মোরে নাহি করিবা প্রচার॥
অপ্রকট হৈলে আমি যাহা ইচ্ছা হয়।
তাহাই করিহ তুমি কহিনু নিশ্চয়॥

বংশী বদন আর কোন কথা কহিলেন না। প্রভুর শ্রীমুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে মস্তক অবনত করিয়া প্রভুর শ্রীচরণ কমলযুগল দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিবেন, তাহাকে আর দেখিতে পাইবেন না, এই নিদারুণ হৃদয় বিদারক কথা তাহার মনের মধ্যে উদিত হইল।

তিনি কান্দিয়া আকুল হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ তলে পতিত হইলেন। প্রভুরও কমল নয়নে প্রেমাশ্রু দেখা দিল। ভক্তের আকুল ক্রন্দনে শ্রীভগবানের হৃদয় দ্রব হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পরিলেন না। তিনি হস্ত ধরিয়া বংশীবদনকে উঠাইয়া নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া সস্নেহে মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন :—

তবে মহাপ্রভু কন শ্রীবংশী বদন।
তোমা হৈতে ভক্তি যোগ হইবে রক্ষণ॥
তুয়া বংশে রস রাজ শ্রীকৃষ্ণ চরণ
ভজন বিমুখ নাহি হবে কদাচন॥
তববংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বল রাম।
প্রেমেতে রহিবে বাধা কহিনু সন্ধান॥
তববংশ হইতে রস রাজের ভজন।
ভাগ্য বান বহু জীব করিবে শিক্ষন॥
তুয়া সঙ্গে পুন আমি কোন গুপ্ত স্থানে।
করিব ব্রজের লীলা কহিনু সন্ধানে॥

বংশী বদনের তাপিত প্রাণ কথঞ্চিত শীতল হইল। কিন্তু প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন, তাহার বিরহ কি রূপে সহ্য করিবেন এই ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। প্রভুকে না দেখিয়া কি করিয়া জীবন ধারণ করিবেন তাই ভাবিতে লাগিলেন।

প্রভু বাক্য শুনি কন শ্রীবংশীবদন।
তোমার বিচ্ছেদে কিসে রহিবে জীবন॥

প্রভু পুনরায় বংশীবদনকে সান্তনা করিয়া কহিতে লাগিলেন।

প্রভু কন ওহে বংশী তুমি মোর প্রাণ
মোর কথা রাখ তুমি না করিহ আন॥
তোমা হৈতে হবে মোর অনেক আনন্দ।
মোর বাক্য ধর মোরে না বাসিহ মন্দ॥
তুমি গৌড় দেশে পুন করিবে বিহার।
তোমা হৈতে হবে বহু পতিত উদ্ধার॥

তোমা হৈতে হবে বহু বৈষ্ণব সেবন।
তোমা হৈতে পশুতেও পাবে প্রেমধন॥
তুয়া প্রেম লেহা আমি ছাড়িতে নারিব।
কৃষ্ণ বলরাম রূপে সদাই রহিব॥
যথা তুয়া সঙ্গে মোর হইবে বিহার।
তথা বংশ যত দিন রহিবে তোমার॥
তত দিন তথা আমি বিরাজ করিব।
তোমার বংশের অপরাধ না লইব॥
গদাই নিতাই সঙ্গে রহিবে সদাই।
ক্ষেত্রে রব আমি সবে দেখিবেক যাই॥
কিছু দিন পরে আসি মাধব ভবনে।
বারেক মিলিব আমি তোমা সবাসনে॥
ধন্য সে কুলিয়া গ্রাম মাধব ভবন।
দেবার হইবে যথা অপরাধ ভঞ্জন॥

বংশীবদন প্রভুর পদতলে বসিয়া প্রভুর আদেশ শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিত শান্ত হইলেন। প্রভুর শিব বিরিঞ্চি বন্দিত রাঙ্গা পা দুখানি ধরিয়া প্রভুর বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। তখন প্রভু বংশীবদনকে পুনরায় কহিতে লাগিলেন।

একথা শুনিয়া বংশী কৈল অঙ্গীকার।
তবে গোরা চাঁদ কহে শুন কহি আর॥
অবধূত নিত্যানন্দ আর গদাধর।
নাড়াদ্বৈত নরহরি আদি ভক্তবর॥
ইঁহারা রহিলা গৌড়ে জীব উদ্ধারিতে।
তোমার নিকটে এই কহিল নিশ্চিতে॥
এ সবার সঙ্গে সদা প্রেমের উল্লাসে।
গোঙাইবা দিবা নিশি কহিনু বিশেষে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ এই বলিয়া বংশীবদনকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। প্রেমানন্দে সস্নেহে প্রিয় ভক্তের মুখ চুম্বন করিলেন। বংশীদন আনন্দে

গদ্ গদ্ হইয়া প্রভুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পুনবার তাঁহাকে হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়া কহিলেন।

এত বলি আলিঙ্গিয়া করিয়া চুম্বন।
কহিলেন চিন্তা নাই শ্রীবংশীবদন॥
কৃষ্ণ বলরাম রূপে সহিত তোমার।
করিব বিবিধ লীলা মোর চমৎকার॥
সেই লাগি তোমার বিবাহ করিবারে।
আজ্ঞা দিলাম এই কহিনু তোমারে॥
জ্যেষ্ঠা পুত্র বধূ গর্ভে পুনর্ব্বার।
আবির্ভাব হবে এই আজ্ঞা যে আমার॥
সেই জন্মে তুয়া সঙ্গে গৌড়ে কোন স্থানে।
করিব ব্রজের লীলা কহিনু সন্ধানে॥
এবে এই কথা তুমি না কহ কাহারে।
দুই কর ধরি তুয়া কহি বারে বারে॥

বংশীবদন স্থির। চিত্তে প্রভুর সকল কথাই শ্রবণ করিলেন। তাঁহার প্রাণে নব ভাবের উদয় হইল। প্রভুর মুখে আজ অতি গুহ্য নূতন কথা শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া আর বাক্য স্ফূরিত হইতেছে না ক্রমে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। পুলকাশ্রু প্রবল ধারে দু'টি নয়ন দিয়া বহিতে লাগিল। প্রভু সকলি দেখিতেছেন। অতি কষ্টে হৃদয়ের আবেগ দমন করিয়া বংশীবদন শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে তিনটি বর মাগিলেন।

আজ্ঞা বলবান বংশী বলিয়া তখন।
গৌরাঙ্গ চরণে পুন করে নিবেদন॥
ওহে নাথ! তিন বর মাগি তুয়া ঠাঁই।
জনমে জনমে যেন তুয়া গুণ গাই॥
মোর বংশে যেন কেহ তোমার চরণ
ভজন বিমুখ নাহি হয় কদাচন॥
কলি পাপ-তাপাচ্ছন্ন নরনারীগণ।
শুদ্ধ যেন হয় করি তোমার কীর্ত্তন॥

শ্রীগৌরাঙ্গ "তথাস্তু" বলিয়া প্রিয় ভক্ত বংশীবদনকে উক্ত তিনটি বর প্রদান করিলেন।

তথাস্তু বলিয়া বর দিলনে গোসাঞি।

বর দান করিয়া প্রভু বংশীবদনকে গোপনে কহিলেন।

বর দিয়া কহে প্রভু শ্রীগোপীনন্দন।
আর এক কথা বংশী করহ শ্রবণ
মাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়া রহিলা গৃহেতে।
এ দুয়ের রক্ষা কর বিশেষ রূপেতে॥

তোমার সঙ্গেতে সদা রহিবে ঈশান।
কহিলাম এই আমি তুয়া বিদ্যমান॥

এই কথা বলিতে বলিতে প্রভুর নয়ন-দ্বয় দিয়া অতি প্রবল বেগে বারি ধারা বহিতে লাগিল। তিনি জননী ও ঘরণীর কথা স্মরণ করিয়া বড় ব্যথিত হইলেন। বংশীবদন তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রভুর গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু বংশীবদনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কান্দিতে কান্দিতে এই রূপে প্রভু বংশীবদনের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

এতেক কহিয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
বংশীর বদন চাহি করেন রোদন॥

প্রভুর রোদন হেরি বংশীর নয়ন।
অবিরত জলধারা করে বরিষণ॥

রোদন সম্বরি তবে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
বংশীরে প্রবোধ দিয়া করেন বিদায়॥
বিদায়ের কালে বংশী গৌর ভগবানে।
চরণ যুগল ধরি করেন প্রণামে॥

বংশীবদন কান্দিতে কান্দিতে গৃহে ফিরিলেন। এতদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ হারাইয়া তিনি মণি হারা ফণীবৎ হইলেন। কপালে করাঘাত করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। বিধিকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

প্রণাম করিয়া প্রভু শ্রীবংশীবদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে যান আপন ভবন॥
যাইতে যাইতে মনে করেন চিন্তন।
এত দিনে হারাইনু গৌরাঙ্গ চরণ॥
ওরে নিরদয় বিধি কি কাজ করিলি।
দিয়া গৌরাঙ্গের পদ কি দোষে হরিলি॥
গোরা বিনু গৌড়দেশ হবে অন্ধকার।
মূর্খ বিধি হেন জ্ঞান না হল তোমার॥
প্রেম হাট মাত্র এই বসাইল গোরা।
অপূর্ণাবস্থায় তাহা ভেঙ্গে দিলি ছোঁরা॥

বংশীবদন প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বিবাহ করিয়া বাস করিলেন, তাহার প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িয়া রহিল কেবল দেহ মাত্র প্রভুর লীলাস্থলী শ্রীধাম নবদ্বীপে রহিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীসঙ্কীর্ত্তন।

(শ্রীযুক্ত সত্য চরণ চন্দ্র বি, এল, লিখিত।)

———:০:———

"নামলীলা গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনম্।" নাম-কীর্ত্তন, লীলা-কীর্ত্তন, ও গুণ-কীর্ত্তন ভেদে শ্রীসংকীর্ত্তন ত্রিবিধ। মনে মনে স্মৃত হইলে যাহা 'স্মরণ' নামে অভিহিত হয় উচ্চৈঃস্বরে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাই 'সংকীর্ত্তন নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা অতীব আনন্দপ্রদ।

শ্রীসঙ্কীর্ত্তন স্বর্গের সঞ্জীবনী সুধা, গৌড়ের এক অভিনব অমৃতময় আবিষ্কার। গৌড় জননীর সন্তান হইয়া যে ব্যক্তি সংকীর্ত্তনে যোগ না দিল তাহার জীবন অপূর্ণ। যে সংকীর্ত্তনের গৌরব ও মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল না তাহার বঙ্গসাহিত্যানুরাগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। যাহার সংকীর্ত্তনে অনুরাগ হইল না তাহার সাহিত্যসেবা বন্ধ্যানারীর পতিসেবার সমতুল। গৌড়ভাণ্ডারে

গৌড়ের নিজস্ব যে সকল অমূল্য রত্ন আছে শ্রীসঙ্কীর্ত্তন তন্মধ্যে কোহিনুর কৌস্তুভ স্থানীয়, বিশেষ এই যে, কৌস্তুভ বা কোহিনুর পার্থিব, শ্রীসংকীর্ত্তন অপার্থিব। গৌর উদ্যানে শ্রীসংকীর্ত্তন পারিজাত সদৃশ। গৌড়সাহিত্য সংসারে শ্রীসংকীর্ত্তন দেবমন্দির তুল্য। শ্রীসংকীর্ত্তন সন্তোষ-পুত সদানন্দময় হৃদয়ের স্বাভাবিকী সঙ্গীতময়ী অভিব্যক্তি। আনন্দ বা সন্তোষ ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। পরম করুণাময় জগদীশ্বরের বিবিধ গুণ-গৌরবে—অনন্ত যশঃ-সৌরভে, হৃদয় একান্ত সমাকৃষ্ট না হইলে মুক্তকণ্ঠে ভগবদ্‌যশঃ কীর্ত্তনের অভিলাষ ও আগ্রহ কাহারও হৃদয়ে সমুৎপন্ন হয় না।

কিন্তু তাদৃশ ভক্তি-ভাব বাসিত সুকর্ষিত সদাতুষ্ট হৃদয় প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। সাধনা সাপেক্ষ। সকলের হৃদয় এমন নয় যে, ভগবন্নামযশে সমাকৃষ্ট হয় আকৃষ্ট হওয়া দূরের কথা, ভগবানে শ্রদ্ধা তাও অনেকের নাই।

এই শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার নিমিত্তই শাস্ত্রাধ্যয়ন পুরান শ্রবণ গুরুকরণ, সৎসঙ্গ, তীর্থপর্য্যটন, প্রভৃতি বহুবিধ সুব্যবস্থা উপদিষ্ট হইয়াছে। একবার হৃদয়মধ্যে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়া দিতে পারিলে মানব প্রকৃত আনন্দের সাক্ষাৎ পাইবে ইহাই শাস্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য, সৎসঙ্গাদি প্রভাবে শ্রদ্ধার উদয় হইলে ক্রমশঃ হৃদয় আনন্দে আন্দোলিত হইয়া স্বভাবতঃই ভগবদ্‌গুণাবলী উদ্ঘোষিত করে, সেই উদ্ঘোষণ—সেই স্বাভাবিক হৃদয়োচ্ছ্বাসই—কীর্ত্তন।

কিন্তু তোমার হৃদয় কর্ষিত হয়নাই, হৃদয়ে পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্জাত হয় নাই—ভাল, ক্ষতি নাই তুমি সংকীর্ত্তনে যোগ দাও; কিয়দ্দিবস পরে দেখিবে তোমার অন্তঃকরণে ভক্তিভাব দেখাদিয়াছে। ভক্তি বারী তোমার হৃদয় মরুর স্থানে স্থানে সুশীতল ছায়াপ্রদ নিকুঞ্জ সম্পদ প্রদান করিতেছে।

কারণ হইতেই কার্য্যোৎপত্তি। কখনও কখনও কার্য্য হইতেও কারণের উৎপত্তি হয়। তখন সেই কার্য্যকেই কারণ বলিতে হয়। এস্থলে প্রথমে দৃষ্ট হইল যে মানব হৃদয় সুকর্ষিত ও উন্নত না হইলে সংকীর্ত্তনে রুচি হয় না। এখন দেখাগেল যে, শ্রীসংকীর্ত্তন স্বয়ংই হৃদয়কর্ষণের হেতু। সুতরাং এক্ষেত্রে কার্য্য হইতেও কারণের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে। সুবুদ্ধি প্রভাবে সুকর্ম্মে অধিকার পাওয়া বিচিত্র নহে কিন্তু সুকর্ম্মে রত হইলেও সুবুদ্ধির উদ্রেক হইতে দেখা যায়। "কর্ম্মণাবাধ্যতে বুদ্ধি"। তাই শাস্ত্রকার গণ

ভক্তির নববিধ সাধনার মধ্যে শ্রীসংকীর্ত্তনকে অন্যতম আসন প্রদান করিয়াছেন।

আমরা আত্মতত্ত্ব অজ্ঞাত। দেহকেই অহং বলিয়া মনে করি। এবং আমিই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা এই অমূলক অহঙ্কার করতঃ নিরন্তর অশান্তি অনলে দগ্ধ হই। আমাদের সীমাবদ্ধ সেবকোচিত স্বামিত্বের উপরেও যে সর্ব্বময় স্বামী পরম প্রভু, নিখিল কারণ, সার্ব্বভৌম নিয়ন্তা বিদ্যমান আছেন, তাহা আমারা অনুসন্ধান করি না। সাধক শিরোমণি রাম প্রসাদের মত "তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকেবলে করি আমি" এই মহাসত্য আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হই না। সর্ব্বোপনিষদ্বেদ্যর অনন্য সদৃশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানাণি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বসঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে॥" এই নিগূঢ় রহস্যে আমাদের আস্থা নাই। বিশাল বিশ্বের বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনাব্যূহ যে জীবেরই মঙ্গলের নিমিত্ত বা জগদ্ধিতায় সেই পরম প্রভু কর্ত্তৃক বিরচিত, তাহাও আমরা দেখি না। কাজেকাজেই আমরা শ্রীভগবানের কৃপা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই না। এবং সেই জন্যই আমাদের হৃদয়ে ভগবৎ প্রীতি বা ভক্তি সঞ্চিত হয় না। ভক্তি অভাবে হরি-গুণ-গানরূপ আত্মানুশীলনের সুমধুর আকর্ষণও আমাদের অনুভব গোচর হয় না।

তাই মানব সাধারণতঃ স্থূলদেহ লইয়াই ব্যস্ত আছেন। দেহের সৌন্দর্য্য, দেহের বল, দেহের স্বাস্থ্য, দেহের, সুখ—এক কথায় রূপরসাদি নশ্বর জড় পদার্থ তাঁহার জীবন ধারণের মুখ্য-হেতুর আসন অধিকার করিয়াছে। যাঁহার দেহ, সেই সূক্ষ্ম অবিনশ্বর নিত্য সত্য পদার্থ একবারও তাহার বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না। কিসে স্থূল দেহের তুষ্টি হয়, কি করিলে ইন্দ্রিয়বর্গের তৃপ্তি সাধিত হয়, কি করিয়া দেহ ও দেহেন্দ্রিয়ের অসুখকর বা অতৃপ্তি জনক প্রভাব নিচয় পরাহত হয় মানব সতত এই চিন্তা ও চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকেন।

যদিও দেখা যায় কেহ কেহ অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতি মানসিক অনুশীলনে রত আছেন, কেহ কোন বিশেষ বিদ্যা অভ্যাস ও চর্চ্চা করিতেছেন তথাপি উত্তমরূপে প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, সেই সেই অনুশীলনের উদ্দেশ্য একমাত্র স্থূলদেহের তুষ্টি, পুষ্টি ও ভোগ বিলাস। সেই জন্যই এখনকার বিদ্যা

অর্থকরী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহা প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশ করা দূরে থাকুক তাহাকে অধিকতর রূপে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

বাস্তবিকই এই স্থূল দেহের সহিত জীবের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, জীব সর্ব্বাগ্রে দেহের চিন্তা ও চর্চ্চা না করিয়া অন্য কিছুরই চিন্তা বা চর্চ্চা করিতে পারে না। তাই কবি-কুলতিলক কালিদাস বলিয়াছেন "শরীরমাদ্যংখলুধর্ম্ম-সাধনং" সাধনমার্গেও দৃষ্ট হয় প্রথমেই দেহশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে।

পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে কেবল দেহের সুখ বা সমুন্নতি সম্পাদনে অমূল্য মানব জীবন যাপিত করা কোন মতেই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতে পারে না। অনেকেই মনে করেন দেহ ভাল থাকিলেই মনপ্রাণ আত্মা সকলই ভাল থাকিবে। এরূপ মনেকরা স্বাভাবিক হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। দেহের নিরোগিতা দেহের সমৃদ্ধি মনপ্রাণ ও আত্মার প্রসন্নতা বিষয়ে অন্যতম কারণ হইলেও উহাই তাহার একমাত্র কারণ নহে। শারীরিক অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে মনপ্রাণ ও আত্মার প্রয়োজনক সাধনা করিয়া যাওয়াই পূর্ণ পরিণতির সোপান। এখানে মনশব্দ 'বোধশক্তি' অর্থে ও প্রাণ শব্দ 'হৃদয়' অর্থে প্রযুক্ত হইল।

যদি কেবল মাত্র দেহ সুস্থ সবল সুগঠিত হইলেই জীবনের সার্থকতা হইত, এক মাত্র দেহই যদি জীবনব্যাপী আয়াসের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী মহিষাদি পশুজীবন অপেক্ষা নরজীবনের শ্রেষ্ঠতা থাকিত না; বরং বহু বহু পশু মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদার পাত্র হইত।

তাই বলিয়া দেহের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ও অযত্নপর হওয়াও মানব জীবনের উৎকর্ষের হেতু হইতে পারে না। যে আধারে রত্ন থাকে তাহার যত্ন কে না করে? রত্ন হীন আধার ও আত্মহীন দেহ সমভাবে অবজ্ঞেয়। আত্মাহীন দেহও যেমন নিষ্প্রয়োজন ও পরিহার্য্য, দেহবিহীন আত্মাও তেমনই আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। কিন্তু যতক্ষণ দেহাধারে আত্মরত্ন বিদ্যমান আছে, ততক্ষণ তাহার জন্য যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য; তবে সেই যত্ন সাধন রাজ্যে সংযম বা নিবৃত্তির দিক দিয়া করা হয় আর ভোগ মার্গে প্রবৃত্তি বা বিলাসিতার দিক দিয়া করা হয়—এই প্রভেদ। ভোগী দেহরক্ষার্থে কতই ব্যয় করেন, কতই আয়াস স্বীকার করেন, কতই ভৃত্যানুকূল্য অঙ্গীকার করেন, তথাপি তাঁহাকে প্রায়শঃই বহুব্যয় সাধ্য চিকিৎসকের সহায়তা

গ্রহণ করিতে হয়। পীড়ার প্রাবল্যে তিনি সময়ে সময়ে এত সাধের জীবনকেতু কহ ভার স্বরূপ বোধ করেন আর ত্যাগী শাস্ত্রাদেশ শিরোধার্য্য করতঃ এমন সুন্দর প্রণালীতে দেহ রক্ষা করেন যে, দেহরক্ষা যে তাঁহার অন্যতমলক্ষ্য তাহা কেহই বুঝিতে পারেন না, তিনিও মনে করিতে পারেন না। সকলেই মনে করেন একমাত্র আত্মাই তাঁহার মুখ্য বস্তু। অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে এমন উত্তমরূপে তাঁহার দেহ সংরক্ষিত হয় যে, ভোগীর পরমায়ু অপেক্ষা ত্যাগীর পরমায়ু বহুল স্থলেই দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়, ব্যয় ও তুলনায় শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকন্তু ভোগীর ভোগই সার হয় আত্মানুশীলন হয় না কিন্তু ত্যাগীর দেহ দেহী উভয়েরই পরিচর্য্যা হইয়া থাকে।

ভোগী ও ত্যাগীর এই চিত্র অনেকেই দেখিয়াছেন এবং প্রায় সকলেই কিছু কিছু অবগত আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই দেখা বা সেই জানা তাঁহাদিগকে ভোগ পরিহার সংযম স্বীকার করিবার মত শক্তি দিতে অশক্ত। জানা ও করা কখনই তুল্য নয়। প্রকৃত আত্মজ্ঞান জাগাইবার নিমিত্ত সংযম বা ত্যাগ অভ্যাস করিবার প্রথম পাঠ্য দেহের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে বিরাগ উৎপাদন। সম্প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ অনুরাগ দেহের উপর, আত্মতত্ত্বে অনুমাত্রও দৃষ্টি নাই। তত্ত্বজ্ঞান লাভ জন্য সংযম শিক্ষা দিতে হইলে দেহানুরাগের মাত্রা কিঞ্চিৎ হ্রাস করাইয়া আত্মানুরাগের পরিমাণ কিয়ৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

তাই শাস্ত্র জীবকে বুঝাইতেছেন, দেখ জীব! "নলিনী দলগত জল মতি তরলং। তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং।" "অহণ্য হনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্"। দেহের সহিত বিয়োগ অপরিহার্য্য ও অপ্রতিবিধেয়। জীবের স্থূলদেহ স্থায়ী নয়, পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর। বিশ্বের বিরাট দেহ কিন্তু সুদীর্ঘজীবি এমন কি তাহাকে এক ভাবে নিত্যও বলিতে পারা যায় সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর ক্ষুদ্র দেহের পরিচর্চ্চায় নিয়ত কাল যাপন না করিয়া জীবনের কিয়দংশ বিশ্বের বিরাট দেহের তত্ত্ব পর্য্যালোচনায় ও সেবায় ক্ষেপণ করা বুদ্ধি মানের কার্য্য; আর দেখ এই দেহটী যাহার, সেই দেহী বা আত্মাও অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য পদার্থ সচ্চিদানন্দ সিন্ধুর বিন্দু। অতএব জীবনের কিয়দংশ তাহার সন্ধান ও পরিচার্য্যা না করিলে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না, দিন গিছা

কাজে যায়। তোমার দেহ বিরাট বা বিশ্বদেহের একটী অংশাংশমাত্র, তোমার তুমি বা আত্মাও বিভুচৈতন্যের একটী অতিক্ষুদ্রকণামাত্র। কাজে কাজেই তুমি যদি তোমার ক্ষুদ্র দেহকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া বিশ্বদেহের সম্মুখীন হও, তুমি যদিতোমার ক্ষুদ্র দেহ সেবায় অতি মনোযোগী নাহইয়া বিশ্বসেবায় নিরত হও তাহাহইলে দেখিতে পাইবে সেই সঙ্গে তোমার দেহ সেবাও অবলীলাক্রমে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। আর তুমি যদি বিভুচৈতন্য বা শ্রীভগবানের সেবায় ব্রতী হও দেখিবে তোমার জীবাত্মা ক্ষুদ্র চৈতন্যর উৎকর্ষও আপনাআপনিই সাধিত হইতেছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে বিশ্বসেবা ও ভগবৎ সেবা পৃথক নহে। জননী সন্তুষ্ট হইলে জনকের সন্তুষ্টির ন্যায় বিশ্ব তৃপ্ত হইলে ভগবৎ প্রীতি এবং জনক সন্তুষ্ট হইলে জননীরসন্তোষের ন্যায় ভগবান তৃপ্ত হইলে বিশ্বতৃপ্তি স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। আরও দেখ দেহ ক্ষিত্যপতেজাদি পঞ্চভূতের পরিণতি মাত্র। পঞ্চভূত জীবনবিহীন জড়পদার্থ; তাহাদের হ্রাসবৃদ্ধি, গতিস্থিতি, যোগ বিয়োগ, আকুঞ্চন প্রসারণ, সকলই চিৎপদার্থের উপর নির্ভর করে। তাহাদের নিজের কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র শক্তি নাই। লৌহের নিজের কোন সন্তাপিকা শক্তি আছে কি? কিন্তু অগ্নি সংযোগেই যেমন তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত হয়, ঠিক সেইরূপ চিৎবিযুক্ত দেহের কোন রূপ চেষ্টা নাই—থাকিতেও পারে না। নিশ্চেষ্টতা ও নিরানন্দই জড়ের সাধারণ ধর্ম্ম তাই অচেতন অকর্ম্মণ্য দেহ পরিত্যজ্য ও হেয়। কেহ কদাপি জড়ের আদর করে না। সুতরাং জগতে আসিয়া কেবল সেই জড় দেহের সেবা, জড় দেহের সুখ লইয়া দিনপাত করিলে জীবের প্রকৃত উৎকর্ষ—প্রকৃত উন্নতি হয় না।

চিৎপদার্থ সহ সম্মিলিত হইয়াই জড়দেহ চৈতন্য ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। তখন কাজে কাজেই উহা রমণীয় ও আদরণীয় হইয়া থাকে। যেমন একখানী রথ রথী অভাবে কোন ক্রমেই চলিতে পারেনা কিছুমাত্রও আনন্দ দিতে পারিবে না ঠিক সেইরূপ মানবের দেহরথ ও আত্মারথীর আনুকূল্যব্যতীত একপদও অগ্রসর হয় না একটীমাত্র ও কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না বা অল্পমাত্রও আনন্দ বিধান করিতে পারে না। রথের সহিত রথীর যে সম্পর্ক, দেহের সহিত দেহী বা আত্মারও ঠিক সেইরূপই সম্বন্ধ।

ঈদৃশ অবস্থায় যদি কেহ অনুমাত্রও রথীর সন্ধান না করিয়া সতত রথেরই সৌষ্ঠব সাধনে নিযুক্ত থাকে তাঁহার রথ যেমন যাত্রাকালে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেনা, সেইরূপ যে ব্যক্তি সতত দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি চেষ্টায় জীবন যাপন করে, কখনই আত্মতত্ত্বের সম্মুখীন হইবার চেষ্টা করে না, তাহারও মর্ত্ত্যভবন হইতে মহাযাত্রা করিবার সময় ভগ্নমনোরথ হইয়া নিদারুণ মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে হয়। তাই মনীষী শ্রেষ্ঠ করুণাময় শঙ্করাচার্য্য খেদ করিয়াছেনঃ—

"বালস্তাবৎক্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণিকোঽপি ন লগ্নঃ॥
অঙ্গংগলিতং পলিতংমুণ্ডং দন্তবিহীনংজাতং তুণ্ডং।
করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং। তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং"॥

হায়! এইযে কলুষিত মানবজীবনের দণ্ড স্বরূপ আশাভাণ্ড, এইযে মৃদ্ভাজন সদৃশ অচল বধির ও মুক জড় বিষয় সংগ্রহ ও সম্ভোগ করিবার উৎকট উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ ইহা মর্ত্ত্য জীবনের একপ্রকার পীড়া, অসুস্থতা, ইহারত পার নাই। "আশা বধিং কোগতঃ?" "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভি বৰ্দ্ধতে।" এক আকাঙ্খার তৃপ্তিতেই কি প্রাণ শীতল হয়? না, না, তাত হয়না। ক্রমশঃই যে আশা লতাবিবৰ্দ্ধিতা হইতে থাকে! অধিকন্তু ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে মানব নিরন্তর দারুণ মৰ্ম্মপীড়া অনুভব করে এবং আশামিটাইবার জন্য কত কলহ, কত বিবাদ, কত প্রতিযোগিতা; কত ছল চাতুরী, কত মিথ্যা প্রতারণারই না সৃষ্টিকরে। পরিশেষে মৃত্যুকালে প্রকৃত অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাশোক করিতে করিতে অতৃপ্ত হৃদয়ে মানবলীলা সম্বরণ করে। তাই সাধক শিরোমণি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ কাতর স্বরে গাহিয়া ছিলেন "ম'লেম ভুতের বেগার খেটে"।

এইরূপে সকলেই স্থূল তুষাবঘাত করতঃ অভাব পূরণের বাঞ্ছা করিতেছে সূক্ষ্মশস্যের সন্ধানে কেহই অগ্রসর হইতেছে না, যথার্থ আত্মজ্ঞান বিহীন হইয়া অবশেষে নিষ্ঠুর নিরয় ক্লেশ ভোগ করিতেছে। "আত্মজ্ঞান বিহীন মূঢ়াতে পচ্যন্তে নরক নিগূঢ়া" সকলেই দুর্ল্লভ জীবন বৃথা ভুতের বেগারে নষ্ট করিতেছে দেখিয়া বিশ্ব প্রেমিকের মহাপ্রাণ কাঁদিল। তিনি দেখিলেন যতদিন না জীব সেই লুক্কায়িত শস্যের প্রীতিকর সুঘ্রাণের সন্ধান লাভ

করিবে ততদিন কিছুতেই তাহার অভাব পূর্ত্তি হইবে না, ততদিন তাহার বৈকারিক তৃষ্ণা কিছুতেই নিবৃত্তি হইবে না। ততদিন কাজে কাজেই জগতের নানা বিবাদ বিসম্বাদ,ছল চাতুরী, অনর্থ কোলাহল, বিদ্রোহ নিগ্রহ, শোনিত পাত ও সর্ব্বনাশ কোনমতেই নিবৃত্ত হইবেনা। ততদিন জীবের বিষাদদৈন্য ঘুচিবে না, ততদিন সে প্রকৃত সুখ বা আনন্দের অধিকারী হইবে না।

তিনি অন্তরে অন্তরে চিন্তা করিলেন কিরূপে জীব তাহার এই তুষাবঘাত রূপ মহাভ্রম বুঝিতে পারিবে? কি উপায়ে সে এই মায়া মৃগতৃষ্ণিকার কঠোর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া জগতে বৈকুণ্ঠের প্রতিষ্ঠা করিবে? কি উপায়ে ভূমণ্ডলে অবিচ্ছিন্ন অশান্তি ও অপ্রীতির স্থলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও প্রেমের সিংহাসন দৃঢ়ীভূত হইবে?

ভাবিলেন, যদি কোন উপায়ে জীবকে একবার তাহার দেহটী ভুলাইয়া দিয়া দেহীর সম্মুখীন করিতে পারি, যদি কোন মতে জীবকে তাহার "কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানাং পশ্যতি কোহহং॥" প্রত্যক্ষ শিক্ষা দিতে পারি, যদি কোন উপায়ে জীবের জীবাত্মাকে তাহার প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতে পারি, যদি কোন প্রকারে সেই আনন্দ কণার উপলব্ধি জীবকে একবার প্রদান করিতে পারি, যদি সেই চিৎকণের জড় নিরপেক্ষ স্বাধীন স্বতন্ত্র আনন্দময় ভাব একবার জীবের হৃদয়ে আঁকিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জীব আর তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্রাংক্ষুদ্র জড় পদার্থ, ক্ষুদ্র ও ক্ষণভঙ্গুর পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়াদি লইয়া ত্যক্ত বিরক্ত হইবে না ও কাহাকেও ত্যক্ত বিরক্ত করিবে না। তাহা হইলেই সে প্রকৃত বিমল আনন্দের অধিকারী হইয়া "ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ।" প্রত্যক্ষ করিতে করিতে জগতের হিংসাদ্বেষ মানমাৎসর্য্য প্রভৃতি অনর্থ্য নিচয়ের বহুউর্দ্ধে বাস করিতে পারিবে, তাহা হইলেই সে গোলোকের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে। প্রকৃত সুখের সন্ধান লাভ করিয়া ভ্রান্ত সুখকে তিরস্কার করিতে শিখিবে। নিত্য দেহে নিত্য ধামে নিত্য আনন্দে বিরাজ করিবে!

ভাবিয়া স্থির করিলেন, সঙ্গীত সকল বিদ্যার সার। চিন্ময় শব্দসাধনাই অজড়-উপলব্ধির একমাত্র উপায়। অবশ্য স্মরণ রাখা আবশ্যক যে নাম গান জড় ধর্ম্মাক্রান্ত শব্দ সাধনা নহে। ভাবিলেন সঙ্গীত আনন্দের উৎস। ইহার

এমনই অসাধারণ শক্তি যে ইহা কালকূট পূর্ণ অহিকেও মোহিত করে। সেই সঙ্গীত যদি হেয় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়-নিচয় ঘটিত না হইয়া শ্রেয় অতীন্দ্রিয় আনন্দময় ও আনন্দময়ীর নামরূপ গুণলীলা সংঘটিত হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ নিত্য আনন্দের অবতারণা হইবে।

ভাবনা কতক নিরাকৃত হইল। কিন্তু আর এক ভাবনা সেই উদার প্রেমিক শিরোমণির সেই বঙ্গমাতার নয়নমণির হৃদয় রাজ্য অধিকার করিল :—সে সঙ্গীতের ভাষা কোথায়? কেন দেব ভাষা? তাহা প্রেমর্ষি জয়দেবের সময়েতে কিয়ৎ পরিমাণে কর্ম্মক্ষম ছিল, ইদানীং কিন্তু নিতান্ত বর্ষীয়সী জরাজীর্ণ ও গতাসুপ্রায়।

ভারতে এমন কোন দিন ছিল না ও হইবে না যখন যাহারা প্রকৃত দুঃখী, তাহারা টোলে যাইতে পারিত বা পারিবে, দেব ভাষা চতুষ্পাঠী ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং দেব ভাষা সে সঙ্গীতের ভাষা হইতে পারে না। তাই প্রেমিকবর ভাবিলেন, যে ভাষা মাতৃস্তন্যের সহিত আমাদের শ্রুতিগোচর হয়, যে ভাষা শিক্ষার জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, যে ভাষা শিখিবার পক্ষে অধিকার অনধিকার নাই, যে ভাষা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই বোধ্য ও সহজায়ত্ত তাহাই এই উদ্দেশ্যের উপযুক্ত সাধন।

আর সেই গৌরবাণী—অপরূপ তাঁহার রূপ লাবণ্য। দেবভাষার তিনি দুহিতা অতি আদরের দুহিতা, জননীর সর্ব্বসম্পদ্ বিমলতা কোমলতা, ওজস্বিতা তেজস্বিতা, মধুরতাও মনোজ্ঞতা সকল গুণই তাঁহাতে বিশেষ ভাবে বর্ত্তিয়াছে। অধিকন্তু ঔদার্য্যও সরলতাগুণে তিনি উচ্চনীচ সকলের ভবনেই গমন করেন। অপক্ষপাতিতা তাঁহার এক বৈলক্ষণ্য। তিনি জননীর ন্যায় কেবল বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষে বরদাত্রী নহেন। সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অপরূপ ভাষাই তখন সেই আনন্দ গীতিকার প্রকাশিকা মনোনীত হইলেন। সংস্কৃত গীত কথায় সহচর 'মৃদং' সেই গৌড়গীতিকার মৃদঙ্গরূপ ধারণ করিল। মহা পুণ্যবান পার্ষদ শ্রীবাসের অঙ্গনে গোপনে পরীক্ষা করা হইল। পরীক্ষাও নির্ব্বিঘ্নে সফল হইল।

মহাপ্রাণ মৃদঙ্গ গম্ভীর নিনাদে "ধিক্ তাং ধিক্ তাং" রবে ভূরি ভূরি সংস্কৃত বোল উদ্গীরণ করিতে লাগিল আর সেই তালে তালে মানবের অন্তরের অন্তরতম

কক্ষে সেই আনন্দময়'ও আনন্দময়ীর নিভৃত নিকেতনে কি এক অপূর্ব্ব স্পন্দন অনুভূত হইল। ক্রমে সেই কুঞ্জকুটীরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল সে কুটীরের বিমল পরিমলে প্রাণ ভরিয়া গেল এদিকে "জয় জয় রাম জয় জয় রাম" করিতে করিতে করতাল মানবকে পাঞ্চভৌতিক রাজ্য হইতে দূরে লইয়া গেল। বাহিরের শব্দ তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতে দিল না। করতাল বহির্দ্দেশে প্রহরীর কার্য্য করিল। মৃদঙ্গ 'ধিক্ ধিক্' রবে তিরস্কার মার্জ্জনীদ্বারা অন্তর্দ্দেশের আবর্জ্জনা বিদূরিত করিয়া দিল। শ্রীভগবানের নামরূপ লীলা গুণাবলী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ তাহার হৃদয় প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে স্থূলের অনিত্যতা ও সূক্ষ্মের নিত্যতাব্যঞ্জক বহু সদুপদেশ তাহার মর্ম্মে গ্রথিত করিয়া দেওয়া হইল। মানব বাহ্য হারাইল। দেহ গেহ বিস্মৃত হইল। দুশ্চিন্তা কুচিন্তা একেবারে তিরোহিত হইল। নিরানন্দের স্থলে নিত্যানন্দ হৃদয়ে উদয় হইল।

ক্রমে সেই অপরূপ স্পন্দন তরঙ্গ হৃদয়ে আর ধরিল না দেহে অভিব্যক্ত হইল। তালে তালে দেহ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তাহাতেও ফুরাইল না। আনন্দ মদিরা তাহাকে প্রমত্ত করিল। সে আর আসন স্থির রাখিতে না পারিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহার ভক্তি গাঢ় ক্রমে সে আত্মোপলব্ধি পর্য্যন্ত হারাইল। ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কখন বা হাস্য পরায়ণ, কখন বা ক্রন্দন নিরত, কখন স্বেদাক্ত, কখন বা রোমাঞ্চিত, কখন বিবর্ণ, কখন বা নিস্পন্দ, কভু বা নির্ব্বাক-শীৎকারশীল হইয়া বিশ্বাত্মার সহিত আনন্দ মিলন বিসূচিত করিল।

এদিকে সিংহনাদ কারী শিঙ্গা 'জয় রাধে জয় রাধে' ধ্বনি করিতে করিতে দিক্ দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া সেই তুমুল আনন্দ-লহরী দশদিকে প্রবাহিত করিয়া দিল। যতদূর সে রব প্রধাবিত হইল ততদূর পবিত্র লইয়া গেল। সে সুমধুর মৃদঙ্গ নিনাদ যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল তাহার হৃদয় স্বচ্ছভাবে তত্ত্ব চিন্তায় নিবিষ্ট হইল।

মানব ধন্য হইল। সে আত্মানন্দের সাক্ষাৎকার পাইল। আত্মাকে ত হাত দিয়া বা স্পর্শ করিয়া দেখান যায় না। তাই তাহাকে অনুভবগোচর করিয়া দেখান হইল। ক্রমশঃ সেই উচ্চ কীর্ত্তন দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। যাহা কৃত্রিম তাহার প্রচার সম্ভব নয়; কিন্তু যাহা অকৃত্রিম ও আন্তরিক এবং

জীবের পক্ষে প্রকৃতই মঙ্গল জনক তাহা অন্তর্গৃহে আবদ্ধ থাকিলেও তাহার প্রসার আপনা আপনি সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। চারিদিকে বড় বড় মহানুভব পণ্ডিতগণের সদনে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, ক্রমে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়" দেশমধ্যে এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল।

এইরূপে কলি পাবনাবতার কাঙ্গালের ঠাকুর করুণ-চূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি করিলেন। দেশে এক নবপ্রাণ, নবযুগ সঞ্চারিত হইল। এই যুগকে গৌড়ভাষার যুগও বলা যাইতে পারে। গৌড়-নন্দিনীর নবীন মাধুর্য্যে সংস্কৃত জননীর জরার অভাব পূর্ণ করিয়া দিল। যে সকল সারাৎসার কথারত্ন—ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব প্রভৃতি একমাত্র সংস্কৃত জননীর গুপ্ত ভাণ্ডারগত সম্পদ ছিল, সাধারণের বোদ্ধা ছিলনা গৌড়-দুহিতা আজ তাহা কীর্ত্তন-সাহায্যে সকলের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিয়া দিতে লাগিলেন। যে সাত্বিক ভাবের বিকাশে লোকে অমায়িক হয়, কুটিলতা পরিহার করে, দীর্ঘায়ুলাভ করে, বিলাসিতা ত্যাগ করে, সুখে দুঃখে বিচলিত না হইয়া মনের শান্তিতে ভগবানের উপর নির্ভরশীল হইয়া সদা স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়া যায়, যাহার পরিস্ফুরণে লোকে পরোপকার পরায়ণ হইয়া দেশে আদর্শপুরুষ হয়, মহামহীরুহের ন্যায় তপ্ত জীবনের তৃপ্তি জনক শীতল ছায়া বিস্তার করিতে শিখে, কায়মন বাক্যে প্রাণীগণের উদ্বেগ উৎপাদনে বিরত হয়, সকলকে সম্মান করিতে শিখে, আপনি অমানী, সহিষ্ণু ও বিনয়ী হয়—এক কথায় যে সাত্বিক ভাবের পূর্ণ প্রকাশে মানুষ ধরায় অমরত্ব লাভ করে, আজ গৌড়-ভারতী তাঁহার সেবক সেবিকা গণকে কীর্ত্তন সহযোগে সেই সাত্বিক ভাবেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তামসিকতা বিনষ্ট হইল। রাজসিকতা খর্ব্ব হইয়া গেল, দেশ মধ্যে হৃদয়ের সৃষ্টি হইল। নূতন মধুরতা ও অভিনব আনন্দের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া মানব মাত্রেই জীবন সার্থক করিতে লাগিলেন।

সাত্ত্বিক ভাব বিকাশকারী—শ্রীসংকীর্ত্তনই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম, অন্য কোন সাধনাই সহজে বাহ্য ভুলাইয়া আত্মা নন্দ প্রদান করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার লিখিয়াছেন।

"কলিযুগে সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতী হৈলাপ্রভু সর্ব্ব পরিকরে॥"

ক্রমশঃ।

শ্রীরাধা।

জয় শ্রীরাধিকা, বৃষভানুসুতা,
জয় জয় কৃষ্ণপ্রিয়া।
কৃপা প্রকাশিয়া, এই দীন জনে,
দাওগো চরণছায়া॥

তুমি রাসেশ্বরী, গোবিন্দ মোহিনী,
মহাভাব স্বরূপিণী।
তব কৃপা হ'লে, অনায়াসে মিলে,
গোবিন্দ চরণ—মণি॥

কভু তোমা ছাড়া নহেন্ গোবিন্দ,
বাঁধা তিনি তব প্রেমে;
বনে বনে ফিরি' বাজান্ বাঁশরী,
তব সুধামাখা নামে॥

তোমারি ভাবেতে হ'য়ে বিভাবিত,
দয়াময় গৌরহরি;
তাপদগ্ধ জীবে করিলা শীতল,
বরষিয়ে প্রেম-বারি।

(আমি) দারুণ ত্রিতাপে হইয়ে তাপিত,
নিবেদি কাতর প্রাণে।
স্নিগ্ধ কর মোর বিদগ্ধ হৃদয়,
বিন্দুমাত্র প্রেম দানে॥

করিয়ে করুণা, পূরাও বাসনা,
দাও দাস্যভাব মোরে।
(আমি) যুগল চরণ, সেবিয়ে মানসে,
ভাসিব আনন্দ নীরে॥

দীন—শ্রীশশীভূষণ সরকার,

প্রেমময়ী-চিন্তা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

(পণ্ডিত শ্রীল গোপীবল্লভ গোসাঞি লিখিত।)

চিন্তা বলিল আর সুষুপ্তির দিকে যাইব না, চল পুনরায় তন্দ্রাপথ দিয়া ফিরিয়া যাই। আমি মস্তক নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করতঃ চিন্তার অনুগমন করিলাম। এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই আমরা পুনরায় তন্দ্রাপথে উপস্থিত হইয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। এই রূপে কিছুদূর যাইয়া একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখিলাম। তথায় সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী কতকগুলি ষণ্ডকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় রোমন্থন করিতে দেখিয়া চিন্তাকে বলিলাম—"এরূপ প্রকাণ্ড ষাঁড় কখন দৃষ্ট হয় না"। চিন্তা হাসিয়া উত্তর করিল, "বহুতর"। আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলাম—"বল কি?" সে তখন বলিল—"ঐ যে বিস্তীর্ণ মাঠটী দেখিতেছ উহার নাম সংসার, এবং ঐ যে ষাঁড় গুলি, উহারা প্রকৃত ষাঁড় নহে, ভগবৎ ভক্তি বহির্ম্মুখ— অসুর আবাপন্ন জীব সকল। চতুষ্পদ প্রাণীর সহিত ইহাদের কোন প্রভেদ নাই, এজন্যই তুমি ইহাদিগকে পশুজ্ঞান করিয়াছ। ঐ দেখ, তাহাদের মস্তকোপরি কু প্রবৃত্তি রূপ শৃঙ্গগুলি কেমন সুতীক্ষ্ণ, সরল সাধু ব্যক্তিগণ তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতেই তাহারা শৃঙ্গাঘাত করিবার জন্য ফঁস্ ফঁস্ শব্দে আক্রমণ করে। ইহাদের নয়ন পথে প্রেমের

দুগ্ধ ঝরে না সুতরাং উহারা গাভীও নহে ; এবং হৃদয় ক্ষেত্র কর্ষণ জন্য ভগবানের ভক্তি লাঙ্গল স্কন্ধে করে না, এবং প্রেমের বোঝাও বহে না সুতরাং বলদ ও নহে উহাদের গলদেশ মায়া রজ্জুতে আবদ্ধ সুতরাং উহাদিগকে ধর্ম্মের ষাঁড়ও বলা যায় না। অধর্ম্ম দেব উহাদের পশ্চাদভাগে স্বীয় নামের ছাপ প্রদান করিয়া সংসার ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহারা ইচ্ছামত পরের অপচয়ে আত্ম পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। ঐ যে উহা দিগেকে রোমন্থন করিতে দেখিতেছ, উহা রোমন্থন নহে, বিষয় সকলের পুন-রাবৃত্তি মাত্র। কামান্ধ বিষয়ী ব্যক্তিগণ সারা দিন ধরিয়া যে সকল বৈষয়িক কার্য্য করে, রাত্রিতে বিশ্রামের সময় কোথায় ভগবদ্ চিন্তা করিবে নাম করিবে না চর্ব্বিত চর্ব্বণের ন্যায় সে গুলিরই পুনরালোচনা করিয়া থাকে। সুতরাং তুমি তাহাকে রোমন্থন বলিতে পার। গাভীগণ বড় জোর কল্যকার ভুক্তদ্রব্য অদ্য উদ্গিরণ করিয়া চর্ব্বণ করে কিন্তু ইহারা বন্ধু বান্ধব বেষ্টিত হইয়া পঞ্চাশ বৎসর পুর্ব্বে স্বকৃত অন্যায় ঘটনা সকল, পুনরুদ্গীরণ করতঃ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া, নিজ শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। যেমন বিচালি, খৈল ও ভুষি প্রভৃতি, দ্রব্যের অসার ও পরিত্যজ্য অংশ গুলি গোজাতির ভোজ্য তদ্রূপ সংসারের অসার আমোদ প্রমোদ ও ভোগ বিলাসই ভক্তিহীন পাষণ্ডগণের ভোগ্য বস্তু। ইহাদের ষণ্ডামি এতই প্রশংসার যোগ্য যে ষণ্ডকেও হারি মানিতে হয়। ইহারা ষণ্ডের গুণ সমুদয় "পা" অর্থাৎ পান বা গলাধঃকরণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় ইহাদের নাম পাষণ্ড।"

আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তথায় অবস্থান বিপজ্জনক বোধে আমি তো সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম, প্রেমময়ী চিন্তা আবার আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। অদূরে দেখিলাম—একটি বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রচণ্ড রবি করে ধু ধু করিতেছে। এবং একটী উষ্ট্র কতিপয় মনুষ্য মূর্ত্তি পৃষ্ঠে লইয়া সেই প্রান্তর মধ্যে বিচরণ করিতেছে। জনৈক রমনী ঐ উষ্ট্রের নাসিকা দৃঢ় রজ্জু দ্বারা সংবদ্ধ করতঃ তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া তাহাকে চতুর্দ্দিকে চালিত করিতেছে, এবং কতকগুলি বালক তাহার পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া অবিরতঃ কষাঘাত করিতেছে। ইহাতে উষ্ট্রটীর ক্লান্তি বোধ না হইয়া বরং আনন্দানু ভবই হইতেছে। আমি চিন্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"চিন্তে ! কি

আশ্চর্য্য! এরূপ প্রকৃতির উষ্ট্রত দেখাযায় না? চিন্তা পূর্ব্ববৎ উত্তর করিল—'বস্তুতর' আমি বলিলাম—"সে কি রূপ"। চিন্তা বলিল—"ঐযে মরু ক্ষেত্রটী দেখিতেছ উহা সংসার মরু; আর ঐ উষ্ট্রটী মায়া বদ্ধ অহঙ্কারী জীব। অহ-ঙ্কারে উহার গ্রীবা উন্নত, এবং বার্দ্ধক্যে উহার পৃষ্ঠ দেশ কুব্জাকার হইয়াছে, এজন্য তুমি উহাকে 'উষ্ট্র জ্ঞান করিতেছ। তাহার পৃষ্ঠে যে মনুষ্য মুর্ত্তিগুলি দেখিতেছ, উহা তাহার স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারবর্গ; সে যৌবনের প্রারম্ভেই ইহাদিগের বোঝা পৃষ্ঠে লইয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে—আনন্দ হৃদয়ে এই সংসার মরুতে বহন করিয়া বেড়াইবে, তথাপি ক্লান্ত হইবে না, সুতরাং উষ্ট্র অপেক্ষাও ইহার ভার বহন শক্তি অধিক বলিতে হইবে। মরুভূমিস্থ কণ্টক বৃক্ষ ভিন্ন কোন সুখাদ্য বস্তু ইহার চক্ষে পতিত হয় না। শুনিয়া থাকিবে—

ন্যায়ের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত উষ্ট্রের নিকটে
দূর হ'তে বারি গন্ধ নাসাতে প্রকটে॥

কিন্তু এই উষ্ট্রটীর নাসা ছিদ্র পথে মায়া রজ্জু দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকায় সে প্রেম বারির আঘ্রাণ পায় না স্ত্রী, পুত্রগণ কর্তৃক সর্ব্বদা এই মায়াডুরি আকর্ষিত হওয়ায় তাহার নাসিকা এরূপ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে যে, তাহার ঘ্রাণ-শক্তি একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে, আর যে সে "রস রূপের" গন্ধ গ্রহণে সমর্থ হইবে এরূপও বোধ হয় না"।

আমি বলিলাম "চিন্তে! চল, আর এ স্থানে থাকিয়া কাজ নাই। চিন্তা গ্রীবা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আমি তাহাকে অগ্রে করিয়া চলিতে লাগিলাম; অদূরে কতকগুলি শূকর দৃষ্ট হইল। তাহারা ঘোঁৎ—ঘোঁৎ শব্দে এক এক বার মল ভোজন করিতেছে, পুনরায় একটী পঙ্কিল হ্রদে যাইয়া কর্দ্দমাক্ত হইয়া শূকরী সম্ভোগ করিতেছে। তৎকালে তাহাদের লম্ফে ঝম্পে ও বিকট চীৎকারে আমার কর্ণ যুগল বধির ও মনে ঘৃণার উদ্রেক হইতে লাগিল। আমি নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলাম "কি, ন্যাক্কার জনক স্থান!" চিন্তা হাসিয়া বলিল—"তুমি যাহাকে ন্যাক্কার জনক বলিতেছ তাহা উহাদিগের নিকট ইন্দ্রের নন্দন কাননস্বরূপ।" আমি বলিলাম "ইহারা কে?" চিন্তা বলিল—"ঐ যে শূকর গুলি দেখিতেছ উহারা ভগবদ্ বিমুখ লম্পট ও

কামুক জীব। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই ইহাদের ধর্ম্ম। আর ঐ যে শূকরী গুলি—উহারা বার বনিতা—বেশ্যা। জীবকে মায়া ফাঁদে আবদ্ধ করাই উহাদের ধর্ম্ম। এবং যে পঙ্কিল হ্রদটী দেখিতেছ উহা বেশ্যালয়। উহার অপর নাম সুরা হ্রদ। সুরাপানোন্মত্ত কামুক কামুকীদের পৈশাচিক রব ও তাণ্ডব নৃত্যকে তুমি শূকর শূকরীর চীৎকার ও লম্ফ ঝম্প বলিয়া ধারণা করিয়াছ। তোমার এ ধারণা ভ্রান্ত নহে। দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলে ঐ রূপই দেখায়!" আমি বলিলাম—"উহারা মল মূত্র ভোজন করিতেছ কি রূপে? চিন্তা বলিল—"অনিবেদিত অন্নাদি গ্রহণের নামই মল ভোজন। ঐ সকল ব্যক্তি কোনদিনও প্রসাদ গ্রহণ করে না, প্রসাদ গ্রহণ তো দূরের কথা যাঁহার প্রদত্ত অন্ন জল গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া আছে ভ্রমেও একদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না। বিষ্ঠা বিনোদিত তমোগুণ যুক্ত ভোজ্য পেয় দ্বারা অম্লানচিত্তে উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে। আমি বলিলাম—"কোথায় বিষ্ণু পদ-রজ বিহারিণী অশেষ দুর্গতি নাশিনী গঙ্গাবগাহন,—গঙ্গাজল পান, আর কোথায় পাপ পথ-চারিনী অশেষ দুর্গতি দায়িনী বেশ্যা-পাপ-কুণ্ডে নিমর্জ্জন ও সুরা পান। কোথায় সম্পাদ পরিপূরিত, পবিত্র—তুলসী পত্র শোভিত সত্ত শাল্যান্নব্যঞ্জনাদি যুক্ত মহা প্রসাদ, আর কোথায় বিষম দুর্গন্ধ-ময় পলাণ্ডু যুক্ত সুরা সম্পৃক্ত অপবিত্র অখাদ্য মাংস। কোথায় ভগবৎ প্রেম যুক্ত ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্য ও উচ্চ কীর্ত্তন, আর কোথায় কামোন্মত্ত পিশাচ পিশাচীর তাণ্ডব নৃত্য ও পৈশাচিক রব। রাম! রাম! চিন্তে, কোথায় আনিয়াছ!' চিন্তা উত্তর করিল 'রাজা যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল।" অমি তাহাকে মহাপ্রভুর শ্রীমুখ বিগলিত একটী উক্তি শুনাইয়া বলিলাম।" চিন্তে! "কাষ্ঠের পুত্তলি হরে মুনেরপি মন' অতএব সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। চিন্তাও বলিল "স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর"। আমি বলিলাম "চল আর থাকিয়া কাজ নাই শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করি। চিন্তা তাহাই করিল।

কিয়দ্দূর যাইয়া কতকগুলি গর্দ্দভ দৃষ্ট হইল। তাহাদের কোনটী মলিন বস্ত্রের ভার বহন করিতেছে আর কোনটী প্রভুর কষাঘাতে ব্যথিত হইয়া শ্যামল তৃণক্ষেত্রের দিকে ছুটিতেছে কিছুক্ষণ তথায় বিচরণ করিতে না করিতেই

প্রভুর হস্তস্থিত শুষ্ক দুর্ব্বার প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার বন্ধন গ্রহণ করিতেছে। কোন গর্দ্দভ বৃদ্ধ পালকের হস্তচ্যুত হইয়া গর্দ্দভীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে এবং তাহার পদাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইতেছে না। দেখিলাম এ স্থানটী গর্দ্দভের লীলাভূমী আমি চিন্তাকে বলিলাম "চিন্তে! এসকল কি?" চিন্তা বলিল—"একটু দাঁড়াইয়া শুন, সমস্তই বলিতেছি" আমি নীরবে শুনিতে লাগিলাম—চিন্তা বলিতে লাগিল—"সংসারে আসিয়া যাহারা ভগবৎ পদারবিন্দ চিন্তা করে না তাহারা সহস্র গুণে বুদ্ধিমান হইলেও স্থূল বুদ্ধি বলিতে হইবে গর্দ্দভের তুল্য স্থূল বুদ্ধি আর দৃষ্ট হয় না এজন্য তুমি উহাদিগকে গর্দ্দভ জ্ঞান করিয়াছ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—"যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।"

ক্রমশঃ।

"মাতৃ-চরণে নিবেদন।"

—:o:—

জয় দুর্গে জয় দুর্গে দুর্গতি নাশিনী!
দীনের অশুভ হর অশুভ-নাশিনী!
শিবের বাঞ্ছিত তব চরণ দু'খানি'
বাসনা পূজিতে মনে হ'য়েছে শিবানী!
দীনহীন অতি আমি নাহি কোন বল।
ভাব ভক্তি হীন হিয়া জ্বলে অবিরল॥
পূজিতে তোমারে মাগো! কি আছে সম্বল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া তাই হ'য়েছি বিকল॥
ভকতের সঙ্গ গুণে একদিন এই হৃদি,
নানাভাব ফলফুলে সুশোভিত ছিল দেবি!
অন্তরে বাহিরে সদা শান্তি সমীরণ
বহিত, আনন্দরসে ভাসিত জীবন॥

নিজকর্ম্মদোষে বিধি বিরূপ হইল।
চকিতে সেভাব এবে কোথায় লুকাল॥

কর্ম্মফল ভোগ ক'রে হৃদয় আমার।
সংসারের তাপে এবে মরু সমাকার॥

শান্তি লভিবার আশা দূরে পরিহরি।
শান্তি এবে কি ভাবের ভাবিতে না পারি॥

ওমা দুর্গে! রাঙ্গা পদ পূজিতে তোমার।
কি আর সম্বল আছে বল অভাগার॥

এবে মাত্র নেত্রনীর করিয়াছি সার।
চরণ পূজিব নয়ন জলে এইবার॥

কিঙ্করে করুণা করি কৃপানেত্রে চাও!
হৃদয়ের পাপ-তাপ নিভাইয়া দাও॥

ধন জন তব পদে না করি কামনা।
কৃষ্ণ পদে ভক্তি দাও এই হে কামনা॥

কৃষ্ণ ভক্তি প্রদানিতে ধর তুমি বল।
বৃন্দাবনে তার সাক্ষী গোপীকা সকল॥

বিশ্বপ্রসবিনী মাগো পরমা প্রকৃতি।
জগতের হিত কর্ত্রী স্নেহের মুরতি॥

করযোড়ে তবপদে করি এ মিনতি।
অন্তিমেতে হেরি যেন যুগল মূরতি॥

(গুরুপদ ভরসা।)

গু—প্ত তত্ত্ব প্রকাশিয়া জানায় জগতে,
রু—ষ্ট কভু নহে, রক্ষে' সন্তানের মত।
প—রম পুরুষ রূপে প্রকাশ ধরাতে
দ—য়া দাক্ষিণ্যাদিগুণে হ'য়ে বিভূষিত॥

ভ—ক্তি করিয়া যাঁর লইলে স্মরণ।
র—হেনা ভাবনা, যায় ত্রিতাপ দহন॥
সা—বধান, ভুলিওনা যেন সেই পদে।
ধরায় স্বর্গীয় সুধা শ্রীগুরুপদে॥

—দীন সন্তান—

নিত্যধাম গত

পণ্ডিতপ্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন জীবনী প্রসঙ্গ।

(১০)

প্রাণের আহ্বান।

মানুষের প্রাণ যেন কি চায়, তাহা না পাইলে তাহার তৃপ্তি হয় না। এমন একটা অবস্থায় মানুষ যখন আসে, তখন সে সেই আকাঙ্খিত বস্তুটীর অন্বেষণে ছুটিয়া বেড়ায়। যা সম্মুখে দেখে, যাহাকে তাহার সেই উদ্দাম প্রবৃত্তি পথে অবস্থান করিতে দেখে, তাহাকেই তাহার সহায়, তাহার আনন্দের আধার ভাবিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তৃপ্তি হয়না, যা পায়, তাহা পাইয়া দেখে যে তাহাতে তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার নয়। সুতরাং সেটি ছাড়িয়া অপরটির প্রতি তখন সে ধাবিত হয়। সমগ্র মানব-হৃদয়ের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে, এই তত্ত্বটি আবিস্কৃত হইয়া পড়ে। আমাদের অতীত ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া, ব্রহ্মার বরে একরূপ অমরত্ব লাভ করিয়া, দেবগণকে বন্দী করিয়াও, পৌরাণিক কাহিনীর বীরগণের প্রাণে তৃপ্তি আসে নাই। এত ধন, এত জন, এত মান,—এত বিভব শক্তি-সামার্থ, এমন কি নানরূপ ছলে বলে কৌশলে, অপনাকে অমর সদৃশ করিয়াও, রাবণ বৃত্রাসুর প্রভৃতির প্রাণে তৃপ্তি আসে নাই। তাহাদের তুলনায়, ক্ষুদ্র মানব তো কোন্ ছার। এই ভাবে অতৃপ্তি বাড়িতে বাড়িতে, মানুষের প্রাণ, এটা সেটা করিয়া, তাহার আয়াস-লব্ধ পদার্থের ভিতর নাড়িয়া চাড়িয়া

যখন তাহার তৃপ্তির কারণ আর কিছুই খুঁজিয়া পায় না, তখন তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তীব্র অনুতাপ বা জ্বালায় জ্বলিয়া সে তখন আর্তনাদ করিতে থাকে। যেমন কোন পথিক, কোন নূতন পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে, তাহার গন্তব্য স্থানের পথ-গামী পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়; কিন্তু বেলাবসানে যদি এমন কোন স্থানে আসিয়া উপনীত হয় যে, সে স্থান হইতে আর এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই—সম্মুখে বিশাল বিস্তৃত স্রোতস্বতী, তাহার পারে যাইবার সুবিধা পাই, পশ্চাতে কেহ সুধাইবার নাই, অথচ বেলা অবসান প্রায়; যে পথে আসিয়াছে, সেই পথে ফিরিয়া যাইবারও উপায় নাই—তখন তাহার মনের অবস্থা কি ভয়ানক হয় বল দেখি? সে অবস্থায় তাহার শেষ সম্বল কি? সে তখন ভয় ব্যাকুলিত, চকিত কম্পিত কণ্ঠে আর্তনাদ করে, করুণস্বরে মর্ম্মভেদী রবে সাশ্রু নয়নে, যুক্ত করে—বলিয়া থাকে,—"ওগো কে আছো, আমায় পর পারে লইয়া যাও, আমার প্রাণ যেখানে যাইবার জন্য উন্মত্ত সেখানে লইয়া যাও; যাহা পাইলে প্রাণের পিপাসা মেটে, প্রাণ তৃপ্ত হয়, যাহা লাভ করিলে, প্রাণের আর কোন আকাঙ্খা থাকে না, একেবারে তন্ময় হইয়া যায়—সেই বস্তু লাভের উপায় বলিয়া দাও। ওগো! অনেক দূরে আসিয়াছি, বড় ব্যথা পাইয়াছি—এত দূরে আসিয়া, অতৃপ্ত প্রাণের আশা মেটে নাই এখন যাই কোথা, কোথা সে আনন্দ ধামের পথ? ওগো! কে আছো দয়াল! এস একবার কাছে এস, যদি তোমার কর্ণে আমার মর্ম্মভেদী বাণী প্রবেশ করিয়া থাকে তো করুণা করিয়া একবার এস এস, আমার চতুর্দ্দিক অন্ধকার, আমার কেহ নাই, কিছু নাই, আমি একা আছি, আর আছে আমার প্রাণের দারুণ জ্বালা। সে জ্বালায় জ্বলিয়া বার বার ডাকি, আবার ডাকি, যদি কেহ থাক তো দয়া করিয়া তাহা শ্রবণ কর। শুনেছি, দয়াময় একজন আছেন, আমি অধম, আমি তাঁহাকে জানিতে পারি নাই, এই অবসরে তিনি করুণা প্রকাশ করিয়া আমায় তাহা না জানাইলে, আর জানইবে কে?" প্রপন্ন হইয়া, এই যে আত্ম নিবেদন ইহাই প্রাণের আহ্বান; ইহাই শান্তি লাভের অব্যর্থ সন্ধান। প্রপন্ন হইয়া শ্রীভগবানের নাম গান, তাঁহার চরণে আত্ম নিবেদন, তাঁহার প্রার্থনা করাই কলির জীবের একমাত্র উপায়। অত বড় ভক্ত অর্জ্জুন, তাঁহাকেও তাই বলিতে হইয়াছে—' শিষ্য স্তেহং শাধি মাং তাং প্রপন্নম্।" আর মার্কণ্ডেয়

পুরাণন্তর্গত শ্রীচণ্ডীতেও, দেবীর প্রার্থনায় ভক্ত গাহিয়াছেন—"দেবী প্রপন্নার্ত্তি হরেঃ প্রসীদ"

দীনবন্ধু, প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই রূপ কথাই বলিতেন। আর এই ভাবে যে তাঁহার প্রাণের আহ্বান প্রতিধ্বনিত হইত তাহা তাঁহার লিখিত প্রার্থনা গুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কেহ মনে করিতে পারেন, কাগজ লিখিবার জন্য এই সকল প্রার্থনা রচনা করা হইত, লোক চিত্ত হরণের উপযোগী ভাষায় উহা প্রকাশিত হইত। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার এই প্রাণের আহ্বান প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে, তিনি যখন "শিবপুর নদীকূল সমিতির" শিক্ষিত যুবকদিগকে নৈতিক শিক্ষা দান করিতেন, তখন দেখিয়াছি, শাস্ত্র ব্যাখ্যার পর, ভাবে ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি যে প্রার্থনা করিতেন, ভাবোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে যে মধুর সুললিত কীর্ত্তন করিতেন তাহা শ্রবণে সভাস্থ সকলে মন্ত্র মুগ্ধবৎ নৃত্য করিত। সে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত তাহা বর্ণনাতীত। সে তো যে সে কীর্ত্তন নয়, সে যে প্রাণের আহ্বান—অব্যর্থ সন্ধান; সে গানে ভক্তগণের প্রাণের তাপ শীতল হইত।—প্রাণে আনন্দ অনুভূত হইত—আর নৃত্যে সে মধুর ভাবটি বিকশিত হইত। দেখিয়াছি, তাঁহার সেই ভাব তন্ময় অবস্থায় মধুর কণ্ঠস্বর বহু দূরেও যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে—সেও তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছে—যথায় কীর্ত্তন হইতেছে তথায় ছুটিয়া আসিয়া প্রাণ ভরিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে। শুধু হিন্দু নয়, মুসলমান সন্তানকেও এই কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়াছি—তাহার মুখেও মুক্ত কণ্ঠে—"প্রাণ ভরে সবাই মিলে হরিবোল্ হরিবোল্।" বলিয় উর্দ্ধ বাহু হইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। আরও দেখিয়াছি, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি ধারী যুবকগণ তাঁহার সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছে, ক্লান্তি নাই, বিরাগ নাই বিরাম নাই, যেন কত আনন্দ অনুভব করিতেছে ও কীর্ত্তনে, নাম-কীর্ত্তনে এত আনন্দ পাওয়া যায় জানিয়া কৃত কৃতার্থহইয়া প্রাণ ভরিয়া কীর্ত্তন করিতেছে।

এই ভাবটি জাগাইবার জন্য, দীনবন্ধু প্রকৃত পক্ষে প্রপন্ন হইয়াই প্রার্থনা করিতেন। কি পাঠের পূর্ব্বে, কি ভাগবত ব্যাখ্যার সময় অথবা ধর্ম্ম সভায় বক্তৃতা করিবার সময়, তিনি সর্ব্বাগ্রে তাই প্রার্থনা করিতেন। মনে পড়ে, এখনও সে প্রার্থনার ভঙ্গী মনে পড়ে: থাকিয়া থাকিয়া সে চিত্র নয়ন পথে পতিত হয়

আর যেন শুনিতে পাই, দীনবন্ধুর ভাবোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে;—

বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্বজীব বিগ্রহং
নারদাদি যোগীবৃন্দ বন্দিতং জনার্দ্দনং।
দীনবন্ধু সর্ব্বদেব পূজ্যপাদ পল্লবং
ত্বাং নমামি দেব দেব দীননাথমীশ্বরম্। ১।
ভূতভব্য বর্ত্তমান সর্ব্বকর্ম্ম কারকং
কর্ম্মপাশমোচকং সুশর্ম্ম কর্ম্ম দায়কং
কৃৎস্নলোক সাক্ষিণং ভবাব্ধিতারকং হরিং
ত্বাং নমামি দেব দেব দীননাথমীশ্বরম্॥ ২।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রেম ভক্তি দায়কং
ভক্তিযোগ গম্যরূপ মাদিভূত কারণং
পাদপদ্ম সক্তচিত্ত ভক্ত বিত্ত বর্দ্ধনং
ত্বাং নমামি দেব দেব দীননাথমীশ্বরম্॥ ৩॥
ভক্তিমুক্তিদায়কং বিপত্তি বিঘ্নবারণং
ধর্ম্মসেতু পালকং তুদ্ধর্ম্ম বুদ্ধি নাশকং
রোগ শোক দুঃখ দৈন্য পাপতাপ নাশনং
ত্বাংনমামি দেব দেব দীননাথমীশ্বরম্॥ ৪॥
বাসুদেব মিষ্ট বুদ্ধি দায়কং জনার্দ্দনং
শার্ব্ব-সর্ব্ব দুঃখ হারী দীন সুত পালকং
চক্রপাণি ঘোর শত্রু পাপ চক্র নাশনং
ত্বাং নমামি দেব দেব দীননাথমীশ্বরম্॥ ৫॥
কংসদর্প সূদনং পাপিষ্ঠ দুষ্ট ঘাতকং
দৈত্যবংশ নাশকারি দেববৃন্দ পালকং
শ্রীপতি প্রফুল্লমূর্ত্তি বেণুবাদ্যবাদকং
ত্বাংনমামি দেব দেব দীননাথমীশ্বরম্॥ ৬॥
আত্মরাম রামরূপ ধারিণং নিরাময়ং
তন্ত্র মন্ত্র বেদ শাস্ত্র ভিন্নবুদ্ধি ভেদকং

নির্ব্বিকার শান্ত বিষ্ণু বিশ্বভূত ভাবনং
ত্বাং নমামি দেব দেব দীননাথমীশ্বরম্ ৭ ॥
গাণপত্য সৌর শাক্ত শৈববৈষ্ণবেশ্বরমং
পঞ্চদেব মূর্ত্তিরূপ পাঞ্চজন্য বাদকং
শঙ্খচক্র দণ্ড পদ্ম ধারিণং নিরঞ্জনং
ত্বাং নমামি দেব দেব দীননাথমীশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

এহেন প্রার্থনায়, আবেগ পূর্ণ প্রাণে এই প্রার্থনায় যে কি অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব পর নহে। একথা কাল্পনিক নহে, জীবনী লিখিতেছি বলিয়া ইহা অতি রঞ্জিত করিয়া লেখা হয় নাই। সত্য বলিতেছি, একবার এই প্রার্থনা পাঠ কর, একদিনে না হয়, দুই দিনে, দুই দিনে না হয় দশদিনে,—পাঠ কর, আবেগ পূর্ণ প্রাণে পাঠ কর। দেখিবে কি পরিবর্ত্তন হয়, মনের অবস্থা কি হয়। দীনবন্ধু এ প্রার্থনাটি ভাবাবেশে স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই অনেকর ধারণা ইহা ভক্তি পত্রিকায় ও তদ্রচিত দম্পতি দর্পণে প্রকাশ হইযাছিল। তা, ইহার রচয়িতা যিনিই হউন, এই শ্রেনীর প্রার্থনায় যে প্রাণের ভাব পরিবর্ত্তন হয়, উচ্ছৃঙ্খল বিপথগামী, মোহ-লোলুপ মনকে সংযত করা যায়, এবং সরল প্রার্থনা ব্যতিত সে অবস্থা লাভ করা যে অসম্ভব, ইহা যুবক হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্য, দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে এই রীতি অনুসরণ করিবার জন্য দীনবন্ধু স্বয়ং সে পথ দেখাইতেন। লোকে দশ খানি পুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞান যে ভাব আয়ত্ত করিতে না পারে, গুরু কৃপায় বা আদর্শ চরিত্রের সংসর্গে অতি অল্প কাল মধ্যে তাহা করিতে সক্ষম হয়। তাই দীনবন্ধু লেখায়, উপদেশে, সভা সমিতিতে এই ভাবের উন্মেষ করিতেন ও মুখে যাহা বলিতেন আত্ম জীবনে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার এই নিষ্ঠা, এই সদাচার, এই সরলতার ফলে, লোকে তাহাকে যেমন প্রাগাঢ় ভক্তি করিতেন, তেমনি একাগ্র ভাবে তাঁহার উপদেশ পালনে তৎপর হইতেন। তাঁহার ভাগবতাশ্রমে নিত্য দলে দলে যুবক, বৃদ্ধ, শিক্ষিত, জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সমাবেশ হইত। এই যে লোক সমাবেশ, ইহা কি জন্য? কেহ তাঁহার নিকটে দৈব কৃপা লাভের জন্য বা বৈষয়িক লাভের জন্য

আসিতেন না। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, তাঁহার নিকট আসিয়া কেবল জ্ঞানের কথা কেবল ধর্ম্মের কথা, কেবল শাস্ত্রীয় তত্ত্বের কথা আলোচনা করিতেন। সময়ে সময়ে তাহা শুনিয়াছি। যাহা শুনিয়াছি তাহাতে এটুকু বেশ বুঝিয়াছি—যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের প্রাণ তৃপ্তির আশায়, শান্তির আশায় প্রকৃত আনন্দের অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়াছে। আর যে কথা শুনিলে তাঁহাদের আনন্দ হয়, যে উপদেশ পাইলে তাঁহাদের তৃপ্তি হয়, তা যেন দীনবন্ধুর সরল প্রার্থনায়, প্রাণোন্মাদিনী সঙ্গীতে, গভীর তত্ত্ব কথা পূর্ণ শাস্ত্র ব্যাখ্যায় মাখানো ছিল। কেন এরূপ হইত, না—সে সকল মৌখিক উক্তি মাত্র নহে—তাহা "প্রাণের আহ্বান।"

এই বিজ্ঞান বিভাবিত, পশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক সমাজে এই প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার প্রয়াস কেন? একথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মনে মনে আন্দোলন করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে বলি, দীনবন্ধুর অন্তরের কথাই আজ তাঁহাদিগকে বলি। তিনি বলিতেন "দেখ আমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই। শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন আমাদের আর কোন আশা নাই। যাহা কিছু কর মাথার উপরে একজন আছেন সেটি মনে করিয়া সকল কর্ম্ম-করিও। সকল কর্ম্মে সকল সময়—তাঁহার দোহাই দাও, আকুল প্রাণে তাঁহার রাতুল চরণে শরণ লও, কাতর কণ্ঠে তাঁহার নাম গান কর। নহিলে অন্য সম্বল আর নাই। ধীবর মৎস্য ধরিবার জন্য জাল নিক্ষেপ করে, জাল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহার ভিতর মৎস্য গুলি আবদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মৎস্য দিগের মধ্যে যাহারা ধীবরের চরণ প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় লয় তাহারা ঐ জালে আবদ্ধ হয় না; এসংসারের চারিদিকে মায়াজাল বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে? কিন্তু যিনি জাল ফেলিতেন তাঁহার চরণে শরণ লইলে তুমি তাহাতে আবদ্ধ হইবেনা। এটি স্মরণ রাখিও।"

দেহ মন প্রাণ শ্রীভগবৎ চরণে অর্পণ করিবার সরল উপায় আকুল প্রাণের আহ্বান, নাম কীর্ত্তন বা প্রার্থনা। আজ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে এই বঙ্গ দেশে, বাঙ্গালীর বেশে, বাঙ্গালীর অবতার হইয়া, স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে কথা ভুলিও না। জগতে ধর্ম্মের হানি, অধর্ম্মের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইলে, যখন একনিষ্ঠ ভক্ত কাতর প্রাণে জীবের দুর্দ্দশা

মোচনের জন্ত ভগবানকে শরণ করেন, তখন শ্রীভগবান, ধরায় অবতীর্ণ হয়েন। ইহা পরম সত্য। এই সত্য শ্রীনবদ্বীপে আজ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। তখন মানব সমাজের যে অবস্থা ছিল, এখন বোধ হয় তদপেক্ষা আরও হীন হইয়াছে। এই চারিশত বর্ষের ব্যবধানে, মানুষ আবার আত্ম স্বরূপ ভুলিয়া, নিত্য বস্তু ভুলিয়া, আবার ধংসের পথে চলিয়াছে—উচ্ছৃঙ্খল ভাবে উন্মাদ গতিতে চলিয়াছে। সুতরাং এঅবস্থায় আমাদের কিছু মাত্র সম্বল নাই, আছে কেবল বুক ভরা বেদনা, আর হৃদয় ভরা আর্ত্তনাদ। আনন্দ নাই শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। অতএব এতীব্র জ্বালা নিভাইবার জন্য, প্রাণের দারুণ অতৃপ্তি দমনের জন্য কেবল প্রার্থনা করা ভিন্ন উপায় নাই। প্রাণ যত জ্বলে, যত বেদনা বাড়ে—মুখে যেন ততই "হে! করুণানিদান হে! দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া পরিত্রাহি স্বর উত্থিত হয় প্রাণের এ আহ্বান ব্যর্থ হইবার নয়, বরং অতি মঙ্গলময়। তাই দীনবন্ধু, আজীবন ইহা বলিয়া ছিলেন আর ইহজীবন ত্যাগ করিবার সময়েও তাহা বলিয়াছেন। তাঁহার সেই শেষকথা সেই প্রাণের আহ্বান সেই শেষ প্রার্থনা "ভক্তি" পত্রিকা হইতে এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

"সংসারেইস্মিন্ যোগমায়া বিরচিতে প্রকৃতেঃ পর।
মামাং প্রলোভিতং কৃত্বা পরীক্ষাং কুরু মাধব!

হে মায়াতীত! হে নিত্যনিরঞ্জন! তোমারই ইচ্ছাশক্তি স্বরূপিনী যোগমায়া দেবীর বিরচিত এই বিচিত্র সংসারে এক মাত্র তোমার দয়া ব্যতীত কেহই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, নিরন্তর প্রলোভনের সামগ্রী আশে পাশে বিরাজমান, কার সাধ্য স্থির থাকে, হে দীনদয়াল! সহজেই দুর্ব্বল এই দীন হীনকে আর কত খেলায় ফেলিবে। ধন জন মান ও নানাবিধ ভোগ্য বস্তু প্রদানে প্রলোভিত করিয়া আর কেন পরীক্ষা করিতেছ? অন্তর্য্যামিন্ তুমি কি জাননা যে, তোমার শক্তি ভিন্ন আমার আর কোন ক্ষমতা নাই! তুমি কি জাননা যে, তোমার কৌশল, তোমার মায়ার নিপুনতা ভেদ করিয়া ভাব বুঝিয়া ভাব রক্ষা করিতে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য? আর তুমি কি জাননা যে, তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও তোমার প্রদত্ত শক্তি সাপেক্ষ? পরীক্ষা করিওনা; খেলিতে ইচ্ছা হয় খেল, খেলায় সাজাইয়া রাখ, তোমার হইয়া আপনা ভুলিয়া জগন্ময়

তোমার খেলা অনুভব করি। কর্ম্ম করাইতে ইচ্ছাহয় কর্ম্ম দাও; দিবানিশি তোমার কর্ম্ম সাধনে জীবন উৎসর্গ করি। আর যদি বার বার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হয় তবে, একাগ্রতা দৃঢ় বিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণ প্রদানে পরীক্ষার যোগ্য করিয়া পরীক্ষা কর। নতুবা আযোগ্যকে পরীক্ষা করিলে সর্ব্বান্তর্য্যামী ও দয়াময় নামে কলঙ্ক হইবে। হে ভাবনিধি ! যাহা ইচ্ছাহয় কর ; কেবল ইহাই প্রার্থনা—ভাবছাড়া করিওনা, যখন যে ভাবে রাখ তাহাতেই যেন তোমার শক্তি তোমার ভাব ও তোমার ঈশ্বরত্ব অনুভব করিতে পারি। অভাবে, দুঃখে রোগে শোকেও যেন তোমার ভাব ও ভালবাসা ভুলিয়া না যাই। ভাল-মন্দ সৎ-অসৎ যাহা কিছু করাইবে তাহাতেই যেন তোমার ভাবে বিভোর থাকিতে পারি ; অভি-মান কাড়িয়া লও, দীনের ইহাই প্রার্থনা।”

পাঠক। এ প্রার্থনা যেন পাঠেই সাঙ্গ না হয়। শয়নে স্বপনে, সর্ব্বদা যেন ইহা তোমার প্রাণে প্রতিধ্বনিত হয়, তোমার স্মৃতিতে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তোমার চিন্তা বিক্ষেপে সঞ্চারিত হয়, বিশ্ব মানব হৃদয়েযেন তাহার মধুর ঝঙ্কার উঠে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

কাঙ্গালের মনের কথা।

(শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

সর্ব্বনাশ !! এই পথ পথই না। এই পথে গেলে,—কেবল নরক ভোগ করিতে হয়। আর পরিণামে “মহারৌরব, নামক নরক কুণ্ডে যাইয়া পড়িতে হয়। আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পথের অবস্থাও পরিণাম বুঝিতে পারিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

ভুক্তভোগী ব্যক্তিদিগের কথায় আমার চৈতন্য হইল। বাবাজীর আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ছিলাম বটে,—আর অপেক্ষা

না করিয়া এক দৌড়ে সাবেক জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাপ্‌রে বাপ্‌ বাঁচা গেল!! গৌর! তুমি জান,— তোমার নবদ্বীপের পথে পথে যে এত গণ্ডগোল, আমি তাহার কিছুই জানিনা।

আমার দশা দেখিয়া, অন্যান্য পথের পাণ্ডাগণ বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন,— "কেমন মহাশয়! আমাদের কথা সত্য?"

আমি সলজ্জ ভাবে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কোন উত্তর করিতে সাহস হইল না। তখনও আমার অন্তরাত্মা কাঁপিতে ছিল।

এমন সময় আর এক জন পাণ্ডা বাবাজী আমাকে ধীর গম্ভীর ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন,— "মহাশয়! কুলোকের কুবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া আর বিড়ম্বিত হইবেন না। আমার এপথে আসুন। এপথে কোন বাধা বিপত্তি নাই;—মোটের উপর খুব্‌ সোজা আর খুব্‌ আনন্দময়।,,

আমি কহিলাম,—"প্রভো! আপনার কথিত পথের কর্ত্তব্য কার্য্য এবং বিশেষ বিবরণ আমাকে বিবৃত করিয়া বলুন।

বাবাজী কহিলেন "আর কিছু না,— কেবল একটী মাত্র যুবতী স্ত্রী আপনার সঙ্গিনী হইবে। এই স্ত্রীলোকটীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া পক্ক রসিকের মতে শুদ্ধ রসের ভজন অর্থাৎ কিছু করণ করিতে হইবে। যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা আমিই যত্নে শিখাইয়া দিব। ইহাই নবদ্বীপ প্রাপ্তির সোজা ও প্রশস্ত পথ।,,

বাবাজীর বক্তব্য শেষ হইলে আমি কহিলাম,—"প্রভো! স্ত্রীর কথা শুনিতেই আমার গা কাঁপিয়া উঠে। যৌবনে একটী স্ত্রী (ধর্ম্মপত্নি) গ্রহণ করিয়া আমি বড়ই লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়াছি। বহু চেষ্টায়,—ভগবানের কৃপায় কোন মতে তাহার কুহক জাল ছিন্ন করিয়া ছুটিয়াছি। এখন একমত স্বাধীন আমি। আমাকে আর মায়ার পুতুলী স্ত্রীর সংসর্গে যাইতে বলিবেন না। আর স্ত্রী সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ যাইতে হইবে এই বা কেমন কথা?

আমার এই কথার পর বাবাজী একটা উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন,— "না,—না,—এ স্ত্রী, স্ত্রী হইলেও সে স্ত্রীর মত না। তুমি কোন চিন্তা করিও না, আমার কথা মত চলিয়া আইস।

বিবাহিতা স্ত্রী হইলেন 'সহধর্ম্মিণী, সংসার ধর্ম্মের জন্য,— আর ইনি হইবেন 'সহকর্ম্মিণী, আসল কর্ম্মের জন্য,— আপনি কা'র সঙ্গে কা'র তুলনা করিতেছেন। ইনি হবেন আরাধ্যা দেবী,— নবদ্বীপ প্রাপ্তির মূল নায়িকা, সহজ পথের পরিচালিকা।,,

যে কোন জাতি হউক,— সধবা বা বিধবা হউক, মোট কথা একটি রমণী রত্নকে নায়িকা করিয়া, তাহার সঙ্গে সাধন ভজন পূর্ব্বক যে শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইতে হয়,— বাবাজী এ সম্বন্ধে অনেক গুলি রেজেষ্টারী করা দলীল পত্র আমার সম্মুখে খুলিয়া দিলেন। দলীলগুলি যে "কৃত্রিম দলীল" ইহা বুঝিবার শক্তি আমার মোটেই ছিল না। দলীল দেখিয়া এবং দলীলের পাঠ শুনিয়া বাবাজীর কোন কথাই অবিশ্বাস করিবার উপায় রহিল না। বাস্তবিক আমার খুব্ বিশ্বাস জন্মিল।

অগত্যা একটী স্ত্রী খুঁজিতে লাগিলাম। বাবাজী মহারাজের কৃপায় স্ত্রী (নায়িকা) সংগ্রহে আমাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। অতি অল্পকাল মধ্যেই সঙ্গিনীর সঙ্গ লাভে কৃতার্থ হইলাম।

আর নবদ্বীপ যাওয়ার ভাবনা কি? সুন্দরীকে দেবী বোধে কণ্ঠ-হার করিয়া আমার পথ প্রদর্শক প্রভুর প্রদর্শিত পথে নির্ভয় ভাবে চলিতে লাগিলাম। দেখা যা'ক নবদ্বীপ কত দূর !!

শিশুকালে শিশু শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগে পড়িয়া ছিলাম,—"তত্ত্বজ্ঞান না থাকিলে একবারে দুঃখ দূর হয় না।" কথাটা নিরেট সত্য। বিশেষতঃ কপালের দুঃখ মুছিয়া ফেলান যায় না। ভোগ করিতেই হয়।

কিছুদূর গিয়া দেখি,— এটি— (আমার কণ্ঠ হার রমনীটী) দেবী নহে, রাক্ষসী! আমার গায়ের রক্ত চুষিয়া খাইতে চায়,—অস্থি-মজ্জা ধরিয়া টানাটানি করে !! কি সর্ব্বনাশ! ঘোর বিপদ উপস্থিত !! জীবন নাশের উপক্রম !! রাক্ষসী যে আমাকে ধরিয়াছে,— সহসা ছাড়াইবার যো নাই।

হায়! হায় !! কি উপায়? নবদ্বীপ যাওয়া তো এই পর্য্যন্তই শেষ,— এখন প্রাণ লইয়া পলাই কোন্ পথে? পলায়নের পথ নাই! কামাদি পিশাচেরা এই রাক্ষসীর পক্ষ হইয়া আমার চারিদিক্ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহারা (কামাদি) তীব্র কটূক্তিতে আমাকে র্ভৎসনা করিতে লাগিল। "দেখ, নরাধম, তুই আমাদের হাত ছাড়াইয়া কোথায় যাইবি ? তোর নিষ্কৃতির সম্ভাবনা কি আছে ? আমরা কাম, ক্রোধাদি আমাদের প্রবেশাধিকার নাই কোথায় ? আমাদিগকে ছাড়াইবার জন্য সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছিলে,— কৈ ? পারিলে কি ? এই তো আমরা সংসারের বাহিরে আসিয়াও তোর ঘাড় ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছি।"

আমি ভয়ে বিষাদে কাঁদিয়া ফেলিলাম। কাঁদিলাম তো কিন্তু আমার কাঁদা শুনে কে ? আমাকে রক্ষা করে কে? এখানে তো আর কেহই নাই। কেবল শত্রু পক্ষ আর আমি ডাকি কা'রে ! নিরুপায় হইয়া চক্ষু বুঁজিয়া ফেলিলাম। আর বলিতে লাগিলাম, হা কৃষ্ণ ! যা কর তুমি ! হরিবোল ! হরিবোল !! হরিবোল !!!

ভুবন মঙ্গল হরি নামের ধ্বনি শুনিয়া শত্রু পক্ষ কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল, নারী রূপিণী রাক্ষসীও বদন ভার করিয়া বসিয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া আমি আর অপেক্ষা করিলাম না,— এক দৌড়ে সাবেক জায়গায়। বাপ্ রে বাপ্ বাঁচাগেল !!

বাঁচিলাম তো, কিন্তু এখনও মনে ভয় আছে,—যদি সেই রাক্ষসী আসিয়া আমাকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করে। দোহাই গৌরাঙ্গের এমনটা আর না হউক।

আমাকে এই বিপন্নাবস্থায় পতিত দেখিয়া অন্যান্য পাণ্ডারা ঈষদ্ধাস্ত সহকারে বলিতে লাগিলেন,—"কেমন আমাদের কথা সত্য ?"

আমি আর লজ্জায় কথা কহিলাম না। এমন সময় আর একজন খড়িয়া কাঁধে, গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা,—হাতে হরি নামের ঝোলা,— সর্ব্বাঙ্গে হরি নামের ছাপযুক্ত বাবাজী বলিলেন,—"আমাকে চিনেন কি ?"

আমি। আজ্ঞা না।

বাবাজী। আমি নবদ্বীপের বাবাজী।

আমি। আপনি কোথায় যাবেন ?

বাবাজী। শিষ্যালয়।

আমি। আপনার শিষ্যগণ কোথায় থাকেন ?

বাবাজী। মফঃস্বলের বহুস্থানে আমার শিষ্য আছে। আমি সর্ব্বদা মফঃস্বলেই ঘুরিয়া বেড়াই। আর কোন সময় নবদ্বীপের যাত্রী পাইলে সাদরে নবদ্বীপ লইয়া যাই।

আমি বুঝিলাম,—এত দিনে দিন ফিরিয়াছে। যখন নবদ্বীপের বাবাজীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তখন আর নবদ্বীপ যাওয়া একটা মুস্কিলের কথা না। দেখা যা'ক কি হয়।

ক্রমশঃ।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

(শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার লিখিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবী প্রথমে জলময় ছিল, তখন গ্রাম, নগর পর্ব্বত বৃক্ষলতা কীট পতঙ্গ সিংহ ব্যাঘ্র মনুষ্যাদি কিছুই ছিল না। মাটিও ছিল না সূর্য্যের কিরণও ছিল না শশীকরও ছিল না ছিল মাত্র বাস্প বা জলীয় পদার্থ। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, সেই বাস্পে লৌহ প্রভৃতি ধাতব ও নানা প্রকার আকরিক পদার্থ মিশ্রিত ছিল। তখন পৃথিবীর বাস্পাবরণের উত্তাপ ২০০০ সেনটি গ্রেড ডিগ্রির পরিমাণ ছিল। উত্তাপের হ্রাসে এবং পুনঃ বাস্পের পরিবর্ত্তনে বারিরাশি ধরা বক্ষে নিপতিত হইয়া বিরাট সমুদ্রের সৃষ্টি করিল। এইরূপ বারি পাতে বাস্পাবরণ কিছু পাতলা হইল এবং সেই দিগন্তব্যাপী অন্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্যকর ধরণী বক্ষে ছড়াইয়া পড়িল। তারপর বৃষ্টি জলের সহিত মিশিয়া এই সূর্য্যকর ধরিয়া ধাতব ও আকরিক পদার্থ রেণু সমুদ্র জলে থিতাইয়া থিতাইয়া স্তর সংস্থিতিদ্বারা পর্ব্বতদেশ, মহাদেশ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিল। আদিতে যখন পৃথিবীর প্রথম স্তর প্রস্তুত হয় তখন জগৎ জীবশূন্য ছিল তার পর সূর্য্যের আলোক পাতের সময় হইতে জীব জন্তুর সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর জীবন ইতিহাসে চারিটি যুগের নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক যুগকে অন্তর যুগে বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে অগ্রে উদ্ভিদ কিম্বা অগ্রে জন্তু জন্মাইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ

কারণ সমুদ্র কর্দ্দমে উদ্ভিদ ও জন্তু উভয়েরই দেহাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা অনুমান করেন যে অঙ্গার জনক যুগে প্রাণী অতি বিরল ছিল তখন উদ্ভিদই অধিক ছিল। তজ্জন্য জীবের অগ্রে উদ্ভিদই জন্মান সম্ভব এবং প্রথম যুগের সাইল্যুরিয়ান অন্তর যুগে উদ্ভিদ ও জীবের দেহাবশেষ বহুল রূপে লক্ষিত হয়। এই যুগে জগত উদ্ভিদ্, শৈবাল, কাকড়া ও শম্বুক জাতীয় বহু সংখ্যক জীব দেখিতে পাওয়া যায় এবং এক জাতীয় মৎস্যের দেহাবশেষ পাওয়া যায়।

ডিবোনিয়ান অন্তর যুগে শম্বুক, কাকড়া ওমৎস্য প্রবল জীব। এই সময় বহুপদী শম্বুক, অর্দ্ধভাগ আঁইস ও অর্দ্ধ কঠিন চর্ম্মাচ্ছাদিত একরূপ মৎস্য জন্মিয়া ছিল এবং ক্যালেমহিট্ ও ব্যাঙ্গের ছাতার ন্যায় এক প্রকার উদ্ভিদ এ সময় প্রথম জন্মে।

কারবণিকরস বা অঙ্গার জনক অন্তর যুগ উদ্ভিদ্ বহুল বলিয়া কথিত। বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর পর্ণী তরু ৮০।৯০ ফুট উচ্চ শৈবাল লতা, ক্যালামহিট নামে এক প্রকার শর গাছ এবং সমুদ্রতীরে নানা প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ এই যুগে দৃষ্ট হয়।

চুণে প্রস্তর গর্ভ যুগে প্রথম সরীসৃপ ও গ্যানয়েড নামক এক প্রকার অতি সুন্দর মৎস্য জন্মে।

পারমিয়ান অন্তর যুগেপ্রথম ঝিনুক জন্মে।

দ্বিতীয় যুগ।

ত্রিস্তর অন্তর যুগে কচ্ছপের প্রথম জন্ম হয় ও বৃহদায়তন কুম্ভীর জন্মে। জুরাসিক অন্তর যুগ ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। লায়াস অর্থাৎ কর্দ্দমময় চূণস্তর এবং ওয়োলহিট অর্থাৎ ডিম্বাকার প্রস্তর। লায়াস গর্ভযুগে আমোনহিট ও বেলেমনহিট নামক শম্বুক এবং ঝিনুক ও বহু প্রকার নূতন জাতীয় শম্বুক, মৎস্য পুরুভূজ ও অসংখ্য অদ্ভুদাকার সরীসৃপ উৎপন্ন হয়।

ওয়োলাইট গর্ভ যুগে স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হয়। এই সময় ভিন্ন ভিন্ন আরণ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

চা খড়ি অন্তর যুগে তাল জাতীয় বৃক্ষ, ওক্, আকরোট ও বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এই সময়ে প্রথম পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় যুগ।

ইয়োসিন অন্তর যুগে মৃত্তিকার হস্তী, মহিষ, শূকর প্রভৃতির জীব কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই যুগের ময়োসিন অন্তর যুগে পিচ, আকরোট, বাঁশ, ডুমুর ও বটবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বানর, কুকুর, ইঁদুর, খরগোস, কাট বিড়াল। পক্ষী— বাদুড়, চড়াই, বক, কাক। সরীসৃপ— সাপ, ব্যাং, গিরগিট, ম্যাশটডন অর্থাৎ এক প্রকার বৃহৎ হস্তী জাতীয় জীবের কঙ্কাল এই সময় দৃষ্টি গোচর হয়।

প্লায়োসিন অন্তর যুগে জলহস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, বৃষ, শূকর, হরিণ, গণ্ডার, শকুনি, ঈগল, কুক্কুট, হংস ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে সর্ব্বশেষ—

চতুর্থ যুগ।

ইহাতে মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। ইয়ুরোপীয়গণ ব্যক্ত সৃষ্টির অনুশীলন করিয়া জীব শূন্য অপার জলধি জলের প্রথম জীব মৎস্য দেখাইতেছেন। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সৃষ্টি রহস্যকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের বিকাশ নির্দ্দেশ করিয়া রূপক ছলে বিধাতাকে বার বার মৎস্যাদি অবতার রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের যুগ বিভাগানুসারে দেখাযায় যে প্রথম যুগ মৎস্য যুগ, দ্বিতীয় সরীসৃপযুগ এই যুগে কচ্ছপের সৃষ্টি। তৃতীয় স্তন্য পায়ী যুগ, এই যুগে বরাহের আবির্ভাব, এবং চর্থ যুগে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রে মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ ইত্যাদি ক্রমিক অবতার আবির্ভাবের উল্লেখ থাকিলেও তাহার অর্থ অন্য প্রকার উহা ব্যক্ত সৃষ্টির সহিত তুলনা হইতে পারেনা। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ক্রমে বিকাশ প্রণালীতে জগতের জীব জন্তু উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইবে। পাশ্চাত্য মতানুসারে প্রথম জলের আবির্ভাব তদনন্তর জীবের আবির্ভাব হয়। জলে স্তর নির্ম্মিত হইয়া বৃক্ষ লতা পর্ব্বতাদি স্থাবর সৃষ্টি হয় তারপরে পশু পক্ষী গো মহিষ ইত্যাদি জঙ্গম এবং অবশেষে অর্ব্বাক জাতীয় জীব মনুষ্য সৃষ্টি হয়। পরিণাম বাদী পণ্ডিত ডারউইন সাহেব ব্যক্ত সৃষ্টি তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমোন্নতির দ্বারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব ইহাতে (জীব শব্দে উদ্ভিদাদি বুঝায়) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জীব উৎপন্ন হইয়াছে প্রমাণ করিয়াছেন,

তাঁহার প্রচারিত মতকে পরিণাম বাদ বলা হয়। আর্য্য ঋষিগণের নিকট পরিণাম বাদ অবিদিত নয়। তাঁহারাও স্বীকার করেন যে এই বিচিত্র কৌশল সম্পন্ন শৈল, সাগর, দিবাকর, নিশাকরাদি মণ্ডিত জগৎ পঞ্চ মহাভূতের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ মরুৎ ও ব্যোমের পরিণাম। পরিণাম সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেঃ—

"তত্র পরিণাম ভাবোনাম বস্তুনঃ যথার্থতঃ স্বস্বরূপং পরিত্যজ্য স্বরূপান্তরাপত্তিঃ, যথা দুগ্ধমেব স্বস্বরূপং পরিত্যজ্য দধ্যাকারেণ পরিণমতে।" অর্থাৎ বস্তু সকলের নিজরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপান্তর ধারণের নাম পরিণাম যথা দুগ্ধই স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া দধি-রূপে পরিণত হয়। বেদান্ত সারে উক্ত হইয়াছেঃ—

"আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নি, রগ্নেরাপঃঅদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে।"

অর্থাৎ তমঃ প্রধান বিক্ষেপ শক্তি পূর্ণমদ জ্ঞানোপহিত চৈতন্য হইতে আকাশ' এবং আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে ঈথারের তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা হিন্দুদিগের আকাশ এই আকাশের পরিণামই দৃশ্য জগৎ; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ব্যক্ত সৃষ্টির মূল হইতে অনুসন্ধান করিয়া জল হইতে স্থাবর, জঙ্গম ও অর্ব্বাক সৃষ্টির বিকাশ দেখাইয়াছেন কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারগণ অব্যক্ত তত্ত্ব ধরিয়া জীব ও জগতের আবির্ভাব প্রদর্শন করেন। অব্যক্ত তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে সৃষ্টি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, ষড় বিধ প্রাকৃতিক সর্গের মধ্যে মহত্তত্ত্বই (বুদ্ধি) প্রথম সৃষ্টি অহঙ্কার দ্বিতীয়, ভূততন্ত্র তৃতীয়, ইন্দ্রিয় স্বর্গ চতুর্থ, মন পঞ্চম ও তামস স্বর্গ ষষ্ঠ সৃষ্টি। বৈকৃত সর্গের মধ্যে স্থাবর সপ্তম তির্য্যক বা জঙ্গম অষ্টম এবং অর্ব্বাক বা মনুষ্য নবম সৃষ্টি। প্রকৃতির নিয়মই পরিণাম ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এই নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূতে পরিণত হইয়া এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিতে জল সেই জলে আদিত্য মণ্ডল হইতে আকরিক পদার্থ সকল নিপতিত হইয়া সমুদ্র গর্ভে স্তরের সৃষ্টি হয়। স্তর সৃষ্টির পর স্থাবর ও জঙ্গম সৃষ্টি হইয়াছে ইহা আধুনিক বিজ্ঞান হিন্দু শাস্ত্রের মত। তার পর—মনুষ্য সৃষ্টি। পরিণামের মধ্য দিয়া নিকৃষ্ট শ্রেণী জীব হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আর্য্যঋষিগণ এসত্য বহু পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেনঃ—

"অশীতিং চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষং জন্ম পর্য্যয়াৎ ॥
ক্রম সন্দর্ভধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বচনং ॥

অর্থাৎ ৮৪লক্ষ (অসংখ্য) যোনী ভ্রমণের পর মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পদার্থ মাত্রেরই পরিণাম হইয়া থাকে সুতরাং স্থুল শরীরও এই নিয়মের অধিন যথাঃ—

"তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানাভূতং পঞ্চভূত বিকার সমদয়াত্মকং
(চরক শারীরস্থান।)

অর্থাৎ চেতনার অধিষ্ঠান স্বরূপ সমুদায় পঞ্চভূতের বিকার স্থুল শরীর নামে অভিহিত। এই স্থূল শরীর চতুর্ব্বিধঃ—

"চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীরাণি জরায়ুজাণ্ডজ স্বেদজোদ্ভিজ্জাখ্যানি।"

অর্থাৎ চারি প্রকার স্থূল শরীর যথা জরায়ুজ (মনুষ্য পশ্বাদি) অণ্ডজ (পক্ষি পন্নগাদি) স্বেদজ (যুক মশকাদি) এবং উদ্ভিদ (বৃক্ষ লতাদি)। পাশ্চত্য ও আর্য্য মতাবলম্বনে প্রদর্শিত হইয়াছে যে স্থুল শরীরীদিগের মধ্যে উদ্ভিদ জাতি প্রথমে জন্মিয়াছে তারপর স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ জন্মিয়াছে। জরায়ুজের মধ্যে মনুষ্যই শেষ সৃষ্টি। ক্রমোন্নতির পন্থা অনুসরণ করিয়া পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ডারউইন স্থির করিয়াছেন যে বানর মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ অর্থাৎ বানর যোনীর পরেই দুর্ল্লভ মনুষ্য যোনী লাভ হইয়া থাকে। এ মত আর্য্যগণও প্রচার করিয়াছেন যথাঃ—

স্থাবরে লক্ষ বিংশত্যো জলজং নব লক্ষকং।
কৃমিজং রুদ্র লক্ষঞ্চ পক্ষিজং দশ লক্ষকং ॥
পশ্বাদীনাং লক্ষ ত্রিংশৎ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরে।
ততোপি মানুষা জাতা কুৎসিতাদে দ্বিলক্ষকং ॥
(আর্য্য কায়স্থ পত্রিকা ১২৯৭সাল)।

অর্থাৎ জীব স্থাবর অবস্থায় ২০ লক্ষ জলজ কৃমি অবস্থায় ৯ লক্ষ, জল স্থল কৃমি অবস্থায় ১১লক্ষ পক্ষী আদি অবস্থার ১০ লক্ষ পশ্বাদি অবস্থায় ৩০ লক্ষ বানর অবস্থায় ৪ লক্ষ জন্ম থাকিয়া ২ লক্ষ কুৎসিত মনুষ্য জন্মের পর দুর্লভ শ্রেষ্ঠ জাতির মনুষ্যের জন্ম হইয়াছে।

প্রকৃতির গুণে ও পরিণাম প্রভাবে এই জগৎ বিস্তার হইয়াছে ইহা হিন্দু শাস্ত্রে অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে। শরীরের উন্নতির সহিত অন্তঃকরণেরও ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে ইহা কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত নয়, আর্য্যঋষিগণও ইহা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। শাস্ত্রমতে জীবাত্মা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষে আবৃত। অন্নময় প্রাণময় কোষ সকল জীবের এক। মনোময়কোষ উদ্ভিদাদি ব্যতীত ইতর জীব সমূহের নির্ম্মিত হইয়া থাকে এবং তাহারা যখন এক শ্রেণী জীব হইতে অপর শ্রেণী জীবে পরিণত হয় তখন তাহাদের মনোময় ও বিজ্ঞান ময় কোষ নির্ম্মিত হইয়া চিত্ত বৃত্তির উৎকর্ষতা সাধন হইয়া থাকে। জীবে যখন পঞ্চকোষ একত্রে জন্মায় তখন উহা শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সৃষ্টি তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সেই অব্যক্ত পুরুষ হইতে এই জগৎ ব্যক্ত হইয়াছে এবং বহু পরিবর্ত্তনের পর মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়া থাকে। এই দুর্ল্লভ জন্ম পাইয়া যে মনুষ্য গোবিন্দ পদ সেবা করিয়া থাকে তাহার জন্মই সার্থক হয়। এই জন্মে পুরুষের বিষ্ণুর পাদ সেবাই কর্ত্তব্য কারণ তিনি সর্ব্বজীবের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ।

সম্পূর্ণ।

ভক্ত-কুঞ্জ।

(শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় লিখিত।)

——:০:——

বাটীতে বসিয়া আছি। বসিয়া আছি বটে, কিন্তু একেবারে কিছু না করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে, কাহার সাধ্য? বাধ্য হইয়া আপনাপন স্বভাবে সকলেই কোনও না কোনও কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত। গীতা বলেন ;—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

ক্ষণকালও কেহ কর্ম্মহীন থাকিতে পারে না। স্বভাব-সঞ্জাত সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ, সকলকেই বশীভূত করিয়া, বিবিধ কর্ম্মপথে প্রধাবিত করে।

যাহার যে গুণের আধিক্য, তাহার কর্ম্ম, সেই গুণের বশে, ভাল বা মন্দ রূপে হইয়া থাকে। এই ভাল মন্দের ভিতর আবার অনেক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে দেখিতে পাই। অনেক 'মন্দ' যাহা ইহলোকে সাধারণ মানব চক্ষে 'মন্দ' বলিয়া পরিগণিত, বস্তুতঃ যাহা সংসারের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তাহাই আবার সংসারের পরপারে পরম মঙ্গলময় শুভ ফলোৎপাদক। আবার দেখি,—যে 'ভাল, ভব-বন্ধ মোহান্ধ জীবের পরমানন্দদায়ক প্রিয় বস্তু ; যাহার জন্য জীবগণ প্রাণপণ করিয়া, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত হা হা করিয়া মরিতেছে ; যাহার জন্য তাহারা সর্ব্বস্ব হারাইয়া, নিঃসত্ত্ব ও নিঃস্ব হইয়া, শেষে বিশ্ব অন্ধকার দেখিতেছে সেই 'ভাল'ই পরত্রে তাহাদের কাল স্বরূপ হইয়া অশেষ দুর্গতির কারণ হইতেছে ইহলোকে ও তাহা বিবিধ লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণার হেতু। একের পক্ষে যাহা সুধাসম সুমধুর দেখি, অন্যের পক্ষে তাহাই সুতীব্র কালকূট স্বরূপ ; একের চক্ষে যাহা জীবন্ত নরক স্বরূপ, দেখি অন্যের দৃষ্টিতে সেই আবার দেবানন্দ নন্দনকানন তুল্য। অতএব মায়াবিমূঢ় মানবের ভ্রান্ত দৃষ্টিতে যাহা ভাল বা মন্দ, তাহা প্রকৃত পক্ষে ভাল বা মন্দ নহে। সুতরাং এস্থলে সত্য নিরূপণে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সাদি দোষ শূন্য নিত্য সত্য 'মহাজন'-বাক্যই প্রকৃত পন্থা।

আমিও, এইরূপ একটি 'ভাল' বা 'মন্দের মোহ আকর্ষণে পড়িয়া, কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। জানিনা, হৃদয়স্থিত হৃষীকেশের কি যে প্রেরণা ;—বাল্য কাল হইতে, আমি, কবিতা-কুসুম-মধু-লোভী একটি অতি ক্ষুদ্র ভৃঙ্গ-রূপে, বিপুল সাহিত্য-কাননে ভ্রমণ করিতেছি। এই ব্রতে ব্রতী হইয়া, মধুব্রত আমি, অন্তরের দুরন্ত পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য একে একে অনেক পুষ্পে বিচরণ করিয়াছি। যদিও, অতি অল্প লোকেই এ অধমের সন্ধান রাখিয়াছে, তথাপি, আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি—ক্ষুদ্র প্রাণ লইয়া, ক্ষুদ্র দুই খানি পাখায় ভর করিয়া, অনেক কষ্টে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। বিন্দু বিন্দু করিয়া অনেক উগ্র ও মধুর পুষ্পের মধুর আস্বাদন লইয়াছি। কিন্তু হায়, প্রাণে পরিতৃপ্তি কোথাও মিলে নাই! ঘুরিতে ঘুরিতে, উড়িতে উড়িতে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে; কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, অন্তরস্থ ধূমায়মান আকাঙ্খা-অনলের প্রবলধূমে, অন্ধ ও পথহারা

হইয়া বিপন্ন হইয়াছি; কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছি;—কিন্তু হায়, তিলমাত্রও তৃপ্তি কোথাও পাই নাই! কোনও পুষ্পে অতি অল্প এক বিন্দুর অধিক মধু মিলে নাই! কোন স্থলে আবার সেই বিন্দুটিরও অসদ্ভাব হইয়াছে! প্রাণ চায় সিন্ধু; বিন্দুতে তাহার কি তৃপ্তি হইবে বল?

এইরূপ ভ্রমিতে ভ্রমিতে,—বহুজন্মার্জ্জিত কি যে সুকৃতি জানিনা,—একদা কানন মধ্যে একটি দিব্য মূর্ত্তি অভিনব মধুব্রতের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত সদ্ভাব হওয়ায়, আমি, তাঁহাকে অত্যন্ত প্রফুল্ল ও পরিতৃপ্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম;—"প্রভো! আপনাকে এরূপ প্রফুল্ল ও পরিতৃপ্ত দেখিতেছি কেন? আপনি কোন্ পুষ্পে মধু আহরণ করেন? তাহাতে মধুই বা কত ও কিরূপ?"

উত্তরে তিনি বলিলেন—"বৎস! আমাকে আর এ অকিঞ্চিৎকর বিন্দু বিন্দু মধুর জন্য, অনিত্য এ পুষ্পে সে পুষ্পে ভ্রমণ করিতে হয়না। পরম সৌভাগ্যে, আমি এমন এক চির-প্রফুল্ল অশেষ অমিয়-পূর্ণ নিত্য মহাপুষ্পের সন্ধান পাইয়াছি, যে তাহার অতি দূরে থাকিয়াও, আমার প্রাণ অনুপম অমৃত-রসে নিসিক্ত হইয়া, সর্ব্বদা পরমানন্দপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত থাকে! কি বলিব, বাছারে কেমন করিয়া বলিব,—যাঁহারা আবার সেই মহাপুষ্পে সংলগ্ন হইয়া প্রাণ পূরিয়া পীযুষ পান করেন, তাঁহারা কি আনন্দ, কি শান্তি সুখ উপভোগ করেন! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে তার তুলনা আর কোথাও নাই! আশা আছে পতিত পাবন প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, একদিন আমিও তথায় তাঁহাদের পদপ্রান্তে মিলিত হইতে পারিব।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আনন্দে উন্মত্ত প্রায় হইলাম; চক্ষুজলে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। দেখিলাম, তাঁহারও নয়নযুগলে প্রেমাশ্রু প্রবাহ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। নীরব অবস্থাতেই অনেকক্ষণ অতীত হইল।

পরে, ভাব গদগদকণ্ঠে তাঁহাকে আমি বলিলাম;—"প্রভো, কি শুভক্ষণে আজ আমার সুপ্রভাত হইয়াছিল! কত জন্মার্জ্জিত কত পুণ্যবলে, আজ আমি আপনার ন্যায় মহাপ্রাণ মহাত্মার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া কৃতার্থ ও পবিত্র হইলাম! অহো, আজ আমি কি শুনিলাম! প্রভো, আমারও প্রাণ, দারুণ ত্রিতাপে তাপিত, প্রবল পিপাসায় পীড়িত ও বৃথাপর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়া, কেন

প্রাণপণে এমনই একটি মহাপুষ্পেরই অভিলাষ করিতেছিল। বলুন, বলুন, প্রভো,—কৃপা করিয়া এ অধমকে বলুন সে মহাপুষ্পটি কি, কোথায় আছে, এবং কি প্রকারে আমিও তথায় যাইয়া এই নিদারুণ সন্তাপে শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইব।" এই বলিয়াই আমি তাঁহার চরণে লুঠাইয়া পড়িলাম।

তিনি আমাকে সসম্ভ্রমে স্বীয় চরণ হইতে উত্তোলন করিয়া, স্নেহ সুমধুর স্বরে কহিলেন ;—"বৎস, স্থির হও। সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। সেই পুষ্পটি পদ্মপুষ্প। ভাব মৃণালে নবীন-নীরদ-শ্যাম কৃষ্ণ সরোবরে তাহা বিকশিত। তাহাতে মধু--মধুরিপুবশীকারীসিন্ধোষধী প্রেম। তাই সেই পুষ্পরত্নটি 'প্রেমপুষ্প' নামে অভিহিত। তথায় লইয়া যাইতে একমাত্র ভক্তিই শক্তিমতি। এই ভক্তিকে আবার গুরু কৃষ্ণ-কৃপা ব্যতীত কেহ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় পায় ভক্তিলতাবীজ ॥"

এতক্ষণ আমার অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হইতেছিল। গভীর নৈরাশ্য-নীর-নিমগ্ন, কুচিন্তা-কীট-জীর্ণ, বিশাদ বিশীর্ণ হৃদয়, সেই আশাসূত্র অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল। কিন্তু, হায়, এই শেষ 'গুরু কৃষ্ণ কৃপা'—কথাটি শ্রবনমাত্র আমার মস্তকে যেন সমগ্র আকাশ সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল! অবলম্বন আশা সুত্র ছিন্ন হওয়ায়, নিরালম্ব বলহীন হৃদয়ও, আরূঢ়-চ্যুতের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ আবার সেই অতল নৈরাশ্য সাগরে সবেগে নিমর্জ্জিত হইল! হতাশ হৃদয়ে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ;—"হায় প্রভো, এই কাম কলুষিত-চিত্ত শিশ্নোদর পরায়ণ গৃহমেধী অধম জীবের ভাগ্যে, সেই সুদুর্লভ গুরু কৃষ্ণ কৃপা লাভ কি প্রকারে হইবে ?"

তিনি উত্তরে কহিলেন ;—"ভয় নাই, বৎস, ভয় নাই! হতাশ হইওনা। ব্যাকুলতাময়ী অতিপ্রবলা আকাঙ্খার পাদপীঠে, উপায় আপনি আসিয়া আত্ম-সমর্পণ করে। তোমার হৃদয়ে, সেই সর্ব্বার্থসাধক সাধ্যাতিত কৃপা লাভের জন্য যখন ব্যাকুলতা ও আকাঙ্খার উদয় হইয়াছে,—তখন আর চিন্তার বিষয় কি আছে? বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণই তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যাহা যাহা

আবশ্যক, সময়ে তিনিই সকল মিলাইয়া দিবেন। ওই শুন, ওই শুন বৎস, সেই পদ্মপলাশলোচন পদ্মনাভের শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত নিত্য সত্য সুধাস্নিগ্ধ অমূল্য অভয়-বাণী, অনন্তকাল ব্যাপিয়া, দিগ দিগন্ত পরিপ্লাবিত করিয়া, বিশ্ব চরাচরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে :—

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
"অনন্যচেতাঃ সততং যোমাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥
"অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"

বৎস, সকল ভুলিয়া, বিষময় বিষয়বাঞ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বকারণ কারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম-ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অভয় পাদপদ্মেই শরণ গ্রহণ কর; সর্ব্ববিধ বৃথাচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র সেই চিত্তচোর চিন্ময়নিধি চিন্তামণিরই চরণপদ্ম চিন্তাকর; দেখিবে, তাহা হইলেই তোমার সকল অভাব পূর্ণ হইয়া যাইবে; পরম দুর্ল্লভ বস্তুও পরম সুলভ হইবে; ত্রিলোকনাথ গোলোকেশ স্বয়ং তোমার বাঞ্ছিত বস্তু মস্তকে করিয়া বহিয়া আনিবেন। বৎস, অন্য পরে কা কথা, যদি অতি দুরাচার ব্যক্তিও একলক্ষ্যে অনন্যমনা হইয়া তাঁহার ভজনা করে তবে সেও সিদ্ধকাম হইয়া ধন্য হয়।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ ॥"

দ্বিগুণ দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হইয়া, আমি তাঁহাকে কাতরকণ্ঠে পুনর্ব্বার কহিলাম; প্রভো, এযে আরও গভীর সমস্যায় নিপতিত হইলাম! 'সকল ভুলিয়া', অনন্যমনাঃ হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে,—তবে, তাঁর কৃপালাভ হইবে। হায়, প্রভো, অন্যাসক্ত অবশচিত্ত অতি দুর্ব্বল আমি কেমন করিয়া তাহা পারিব? অহো, আমার ন্যায় নিকৃষ্ট নারকীর ভাগ্যে সে যে একান্তই অসম্ভব!"

শ্রবণ-রসায়ন সুমধুর গুঞ্জনে তিনি পুনরায় কহিলেন ;—কিছুই অসম্ভব নহে? বৎস, তুমি অবিদ্যা জনিত মহাভ্রমে পতিত হইয়াই, নিত্য সত্তব বিষয়কে

এমন অসম্ভব বলিতেছ! প্রথমে স্থলে সন্তরণ শিক্ষা করিয়া, পশ্চাৎ জলে নামিয়া যে শিক্ষার পরীক্ষা দেওয়া, কি উন্মত্তের প্রলাপ বাক্য নহে? জলেই সন্তরণ শিক্ষা করিতে হইবে; যেন তেন প্রকারেণ সর্ব্বাগ্রে জলেই নামিয়া পড়িতে হইবে। তেমনি সকল ভুলিতে হইলে, তদেকচিত্ত হইতে হইলে, তাঁহারই শরণ লইতে হইবে; তাঁহারই চরণকমল চিন্তা করিতে হইবে; স্বীয় শক্তিহীনতার জন্য সেই সর্ব্বশক্তি সম্পন্নের নিকটেই কাতর প্রাণে শক্তি ভক্তি ভিক্ষা করিতে হইবে; এবং সর্ব্বোপরি, তাঁহাহইতে অভিন্ন, সর্ব্বার্থ সাধক, ভবব্যাধিবিনাশক, ত্রিলোক পাবক তাঁর যে নাম তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এই এক নামেই সকল শূন্য পূর্ণ হইবে। এই নামেই যাহা কিছু সমস্ত নিহিত আছে। এই নামেই প্রেমফল প্রসবিনী ভক্তিলতাবীজ। এই পরমশুভ পরমশান্তিপ্রদ, পরমনিধি কৃষ্ণ নামই তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সাধন করিবে। বৎস, কলিকলুষিত জীবের এই নাম ব্যতীত আর অন্য গতি নাই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এস বৎস,—এই নাম গ্রহণ কর। আজ তোমার পরম সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে!"

এই বলিয়া, তিনি আমার আপাদ-মস্তক অন্তরবাহির, অপূর্ব্ব অমৃত রসে অভিষিক্ত করিয়া, আমার কর্ণমূলে এই কয়টি শব্দ প্রদান করিলেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এবং পুনর্ব্বার কহিলেন;—"এই তারকব্রহ্ম নাম মহা অন্তরে অন্তরে সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত করিয়া লও। সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বসময়, যে ভাবেই হউক, ইহাই স্মরণও কীর্ত্তন করিতে করিতে, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন কর? কৃষ্ণেচ্ছায় এই যে মহামন্ত্র আমি তোমার কর্ণপুটে প্রদান করিলাম, ইহারি সম্যক সাধন বলে অচিরকালমধ্যে তুমিও সেই সুমহান প্রেম-পুষ্পের অনাবিল অপরিণামী অমিয়-মধু আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইবে। তোমার চিরপিপাসিত, ত্রিতাপ তাপিত, কামকলুষিত অন্তরে, অনন্ত শান্তি-সুধা বর্ষিত হইবে। কোনও অভাবই আর থাকিবে না; ভাবময়ের মহাভাবে মগ্ন হইয়া, ধন্য হইবে!!"

কোটিজন্মার্জ্জিত-পুন্য বলে, আমি,—অতি-ক্ষুদ্র, তৃণাদপি-তুচ্ছ, জীবাধম আমি,—সেই মহাপ্রাণ মহামঙ্গলময় মধুর আদেশ বাণী, দৈববাণীর ন্যায়, শিরোধার্য্য করতঃ; এক্ষণে তাঁহারি পদানুসরণ করিয়া, এই কানন মধ্যস্থ এক মহামহিম পরম রমণীয় সুপবিত্র প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

ক্রমশঃ।

১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ, ১৩২০,।

ভক্তি।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

ভক্তির্ভগবত সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

"ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল" কর্ত্তৃক পরিদর্শিত।

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভক্তি কার্য্যালয়,
ভাগবতাশ্রম, কোঁড়ার বাগান, হাওড়া
হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হাওড়া
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২ টাকা। প্রতি খণ্ড ৵৹ দুই আনা।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
প্রার্থনা	সম্পাদক	৮১
গান	সম্পাদক	৮২
একটী কথা	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ	৮৩
কুঞ্জকুঞ্জ	শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়	৮৪
একটী গান	শ্রীহরিদাস গোস্বামী	৮৬
কাঙ্গালের মনের কথা	শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য	৮৬
ভক্ত কালিদাস	শ্রীশশীভূষণ সরকার	৮৯
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন	শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র বি, এল,	৯৩
দুটী গান	শ্রীবনমালী দাস ঘোষ	১০২
আশ্রম ধর্ম্ম	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী	১০৩
দীনবন্ধু জীবনী	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১১০

পাথরের উৎকৃষ্ট ব্রেজিল চসমা।

যথানিয়মে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অথবা চক্ষু পরীক্ষক ডাক্তারদিগের ব্যবস্থানুসারে চসমা বিক্রয় করি। ইহাতে কোন ত্রুটী লক্ষিত হইলে ১মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিই, ষ্টীল চসমা ৬৲, রূপার ১০৲, সোনার ২৫৲, হইতে ৩৬৲ টাকা। আইপ্রিসারভার ১৲।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ তাঁহাদের বয়স ও দিবালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কিরূপ দেখিতে পান, লিখিলে ঠিক চক্ষের উপযোগী চসমা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান যায়।

রায় মিত্র এণ্ড কোং।

১৮ নং ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ব্র্যাঞ্চ দোকান, পটুয়াটুলি, ঢাকা।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

১২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ। সন ১৩২০ সাল।

প্রার্থনা।

—ঃ০ঃ—

বাঞ্ছাকল্পতরুং সমস্তসুখদং ভাবৈকলভ্যং সতাং
বেদ্যং বেদবিদাং গুণৈকনিলয়ং লীলাময়ং মাধবম্।
গোবিন্দং গুণজন্মকর্ম্মভিরহো সন্তারয়ন্তং জগৎ
রাধাপ্রেম-নিধি প্রযামিশরণং ভাবপ্রদং শ্রীহরিম্॥

হে বাঞ্ছাকল্পতরু! সমস্ত সুখের, সকল প্রকার আনন্দের একমাত্র আধার তুমি, তোমার অসীম দয়াবলে যে সেই ভাব বুঝিতে পারে এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারে সে-ই ধন্য সেই ব্যক্তিরই মনুষ্যজন্ম সার্থক হইয়াছে। আমি সর্ব্বদাই রিপুগণের কৃত দাস হইয়া তাহাদের আদেশ মত নানা প্রকার কুৎসিত কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া নানাপ্রকার কুৎসিত ভাবসকলকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি ভুলেও একবার তোমার সদানন্দময় ভাবের ভাবনা ভাবিনা। তোমার সেই চির মঙ্গলময় চৈতন্য সত্ত্বার সর্ব্বব্যাপিত্ত্ব ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াই এমন সুবিমল আনন্দ লাভে বঞ্চিত রহিয়াছি। ভীষণ মোহ নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া পুনঃ পুনঃ নানারূপ সুখ দুঃখের দারুণ কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছি। ভজন সাধন কিছুই করিতে পারিতেছি না, তাই তোমার এমন সুদুর্ল্লভ ভক্তিধনে চির বঞ্চিত। লীলাময়! জীবের সহিত অবিরত কতভাবে কতরকমের খেলা যে খেলিতেছ তাহার অন্তনাই, তোমার এই সুবিস্তৃত ক্রীড়াভুমির নানাবিধ খেলার ভাব একমাত্র তোমার কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত ভিন্ন আর কে

বুঝিবে বল? সর্ব্বদা সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রাণে প্রাণে শক্তি সঞ্চার দ্বারা জীবকে নানা ভাবে নানা ভাবের খেলায় মত্ত রাখিয়াছ, প্রাণে প্রাণে প্রাণরূপে তুমিই বিদ্যমান রহিয়াছ, তথাপি মোহবশে তোমার এই সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাব ভুলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দুঃখ পাইতেছি। তোমার লীলা খেলার গুঢ়তত্ত্ব ভাবনা করি না, তোমার অজ ভব বাঞ্ছিত চরণ ভজনা করি না, তোমার সেবায় অকপট প্রাণে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিনা বলিয়াই তোমার মহিমা অনুভবে সম্পূর্ণ অক্ষম। প্রত্যেক কার্য্যে প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার অপূর্ব্ব কৌশল, আশ্চর্য্য শক্তি কেবল ভক্তই অনুভব করিয়া সুখে দুঃখে লাভে অলাভে সম ভাবে থাকিয়া সদানন্দ লাভ করিতে পারে।

প্রভো! আমার আর কোনপ্রার্থনা নাই কেবল যে ভক্তি লাভ করিয়া ভক্ত সংসারের যাবতীয় সুখ দুঃখ বিপদাপদকে পদদলিত করিয়া তোমার মঙ্গলময় ভাবে তন্ময় হইয়া যায়, সেই সদানন্দ দায়িনী ভক্তিই প্রার্থনা করি। তোমার কৃপাশক্তি ভিন্ন আমার আর কোনই বল নাই। দয়াময়! দয়াকরিয়া ভক্তি দাও, ভক্তি ভাবে তোমার পূজাকরি। ভাবদাও তোমার ভাবে আত্মহারা হইয়া অভাবের যাতনা ভুলিয়া, ভাবময়! তোমার ভাবনাকরি। অবিচারে তোমার অমৃতোপম আদেশ বুঝিয়া কার্য্য করিবার শক্তিদাও। প্রভো! আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞান, তোমার ভাব ছাড়া প্রাণে কার্য্য করিয়া কেবল অনুতাপানলেই দগ্ধ হইতেছি, দয়াময়! দয়া কর, প্রার্থনা অনেক করিয়া বলিবার আর কিছু নাই তুমি অন্তর্য্যামী অন্তরের ভাব বুঝিয়া আমায় কৃপাকর, আমার আর প্রার্থনার কিছু নাই দীনের আশাপূর্ণ কর।

গান।

(ভজ) রাধাবল্লভ চরণে।
মিছে দিন যায় অকারণে;—
শ্রীরাধা কৃষ্ণের নাম, জীবের সুখমোক্ষধাম,
যদিপুড়াইবি কাম ভজ একান্ত সাধনে॥
অহৈতুকি প্রেম গোপীভাব লাভ যদি হয়,
ভাবনা ব্যতীত ভাব অভাবেতে হবার নয়,

দেহে রিপু আছে ছয়, আগে তারে কর জয়,
হবে রতির উদয় গোপীনাথের চরণে॥
করে করি করমালা মনে মনে ভাব সার,
ভেবেদেখ এ সংসারে কে তোমার তুমি কার,
মনেভাব সার, সেই হরি সারাৎসার,
হবে ভবনদী পার যাবে শান্তির সদনে॥
শ্রীগুরু শ্রীমুখবাক্য হৃদয়ে করি বিশ্বাস,
বারেক জপিয়ে দেখ অন্তরে পীতবাস,
পূর্ণহবে আশ, কর সাধুসঙ্গ বাস,
শ্রীগোবিন্দ দাসের দাস দীনহীন ভণে॥

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

একটি কথা।

তুমি যে সুরে বাজাও বাঁশী, কেমনে সে সুর
আমার প্রাণের জ্বালা করে দেয় দূর।
যখনি যে মূর্চ্ছনায় বাজাও যে তার,
আমার তন্ত্রীতে উঠে তেমনি ঝঙ্কার।
তোমার জ্যোছনারাশি কেমনে অলখে—
হৃদয় কুমুদে মোর দেয় ফুটাইয়া?
তোমার সে শান্তি সুধা আমরি পুলকে
আমার সকল ক্ষুধা দেয় মিটাইয়া।
মালঞ্চ বিতানে তব কল কুহুতানে
আমার হৃদয় কুঞ্জ উঠে গো নাচিয়া
ফিরে চাহি নাই লাজে—ছি ছি যার পানে
তারি পদরেণু প্রাণ ধরিছে যাচিয়া।
সঙ্গীত থামিয়া যায়, থাকে তার রেশ্।
গৌরাঙ্গ চরণ ধূলী সাধনার শেষ।

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

ভক্ত-কুঞ্জ।

—:০:—

(শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এ স্থলের নাম 'ভক্ত-কুঞ্জ'। ইহার লোকাতীত, অতুলনীয়, অবিনশ্বর শোভা-সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কথা ক্ষুদ্র মুখে বর্ণনা করিয়া ব্যক্ত করা একান্তই অসম্ভব। ইহা উদ্যানের অন্যান্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। উদ্যানের অন্যান্য স্থলে যেমন সাধারণের অবাধ গতিবিধি ও অযথা কোলাহল-কোন্দল দৃষ্টিগোচর হয়, এস্থলে কদাপি তাহার সম্ভাবনা নাই। সদানন্দ, সদ্ভাব ও শান্তি এস্থলে সর্ব্বদা বিরাজিত। এই 'ভক্তকুঞ্জেই' সর্ব্বসন্তাপহারক স্নিগ্ধ মধুর সাধু-মুখ-মারুত, সেই ভাব-বৃন্ত-বিকশিত শ্যামসরোবর-শোভী সুমহান্ প্রেম-পুষ্পের, প্রাণোন্মাদক শীতল সুরভি সতত বহন ও সর্ব্বত্র বিতরণ করিতেছে। সেই সুরভি আঘ্রাণেই উন্মত্ত হইয়া, মধুলোভী মধুব্রতগণ, তাঁহাদের অগ্রসর হইতেছেন। দেখিলাম,—ইঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম শ্রেণীর নাম 'প্রবর্ত্তক', দ্বিতীয়ের নাম 'সাধক'। প্রবর্ত্তক-গণ সাধক গণের অনেক পশ্চাতে অবস্থান করিতেছেন! কিন্তু, প্রেম-বন্ধনে তাঁহারা পরস্পর অতি সন্নিকট ও সম্মিলিত। আরও দেখিলাম,—ইঁহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া, অনেক দূরে, 'সিদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ, আর কতকগুলি দিব্যকান্তি মধুকর, গন্তব্যে উপস্থিত হইয়া, পঞ্চ-কেশর প্রেম-কমলের এক এক কেশরে পরমানন্দে উপবেশন করতঃ, একাধ্যানমনে মকরন্দ-পানে বিভোর রহিয়াছেন! সেই পঞ্চ কেশর, 'শান্ত' 'দাস্য' 'সখ্য' 'বাৎসল্য' ও 'মধুর' নামে প্রথিত।

এক্ষণে, আমি যেন আর সে 'আমি' নাই। আমি যেন সম্পূর্ণ এক নব জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। কি ছিলাম, কি হইয়াছি! কোথা হইতে কোথা আসিয়াছি! কিসের পরিবর্ত্তে, অহো, আজ আমি কি পাইয়াছি! মরি, মরি, কি সুন্দর—কি মনোরম স্থান! আঃ কি স্নিগ্ধ-শীতল, অমিয়-মধুর, মনোমোহন

সৌগন্ধ! প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে রে—প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে! যে 'সর্ব্ব' লইয়া আমি এতদিন গর্ব্বে অন্ধ ছিলাম, সে 'সর্ব্ব' আজ খর্ব্ব হইয়া ঐ মাটিতে মাটি হইয়া মিশিয়া গিয়াছে! খাঁটি বলিয়া এতদিন যাহা জ্ঞান ছিল, এখন দেখিতেছি সে সব মাটি—সব মাটি; মাটি—মাটি—মাটি। গন্ধে মন অন্ধ হইয়াছে; এতদিন যাহা সে শত চক্ষু হইয়া দেখিতেছিল, তাহাতে তাহার লোলুপদৃষ্টি নষ্ট হইয়াছে; পরন্তু, সাধ করিয়া অন্ধ সাজিয়া, যাহা সে দেখিয়াও দেখিতেছিল না, তাহাতে তাহার দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়াছে। এ জীবনে যে আমার সাধু-সঙ্গগুণে সহসা এমন সুদুর্ল্লভ মহা-সৌভাগ্যের উদয় হইবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!—"ধন্যোঽহং! কৃতকৃত্যোঽহং! সফলং জীবনং মম!"

ঋদ্ধসিদ্ধি ব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি
ব্র্হ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেবতাবৎ
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং,
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রযাতি॥

(ললিত মাধব।)

আহা, শুনিয়াছি,—এই মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধী প্রেমের গন্ধ, পরম সৌভাগ্যে, সাধু-সঙ্গগুণে, একবার যার চিত্ত-পথের পথিক হইয়াছে, সে-ই সকল ভুলিয়াছে—আত্মহারা হইয়াছে। অকিঞ্চিৎকর কালনাশ্য বিষময় বিষয় সম্পদের কথা তো অতি দূরে,—অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি, মোক্ষাদি চতুর্বর্গ, এমন কি অতি গুরুতর যে ব্রহ্মানন্দ, তাহাও তাঁহার তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। হায়, হায়,—হরি হে,—এমন শুভদিন এই অধমাধমের অদৃষ্টাকাশে কবে পরিদৃষ্ট হইবে?—হইবে কি?—গুরুকৃষ্ণ কৃপায় অবশ্যই হইবে।

এস, এস, ভাই,—কাল কণ্টক কুটিল, জটিল সংসার-অরণ্যে বিষয়-বিষ-পুষ্প-বিলাসী অতৃপ্ত হৃদয় মধুপ— মানবনিচয়,—এস, এস, ভাই! আর এ দারুণ ত্রিতাপ-তাপে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া, প্রতিনিয়ত বৃথা আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করিও না। এস ভাই, এই মহাসুযোগ, সুদুর্ল্লভ মানব জীবনে, আমরা সকলে এই ভব-নাশন শান্তিময় ভক্ত-কুঞ্জে, ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া, মহানন্দে মহামন্ত্র

প্রেমময় হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া, ঐ গন্ধে গন্ধে, সচ্চিদানন্দের আনন্দ নিবাসে প্রেম-মকরন্দ-আশে অগ্রসর হই—জীবন-জনম সফল করি।

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল॥

একটী গান।

—:০:—

এস হে এস!

সুন্দর শচীনন্দন মধুর অধরে হাস,
আসি ভুবন মোহন রূপে জ্যোতি পরকাশ'।
এস মঙ্গলময়! ভকত প্রিয় পূর্ণ কর অভিলাষ।
এস বিশ্বম্ভর, নিমাই সুন্দর হৃদয়েরি তম নাশ'।
(আমি) আসন পাতিয়া রহেছি বসিয়া, চরণে তোমারি আশ।
ষড় বিচলিত হিয়া, প্রাণ ভরিয়া, শুনিব মধুর ভাষ'।
দিব অঞ্জলি পদে, চরণ প্রসাদে,
ছুটিবে প্রেমোচ্ছ্বাস'।
ধরি চরণ প্রান্ত, প্রাণ কান্ত!
উদ্ধার' হরিদাস'।

দীন—শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

কাঙ্গালের মনের কথা।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য লিখিত।)

আমি। মহাশয়! আমি বহু কোটি জন্ম পরিগ্রহণান্তর এবার মানব জন্ম লাভ করিয়াছি, কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ নবদ্বীপ যাইবার পথ পাইতেছি না,

আপনি এ দীনহীনকে দাসানুদাস করিয়া নবদ্বীপ লইয়া যাইবেন কি?

বাবাজী। কোন চিন্তা নাই। আমি যখন নবদ্বীপেরই একজন বৈষ্ণব, তখন আর তোমাকে নবদ্বীপ লইয়া যাইতে পারিবনা কেন? আইস, আমি তোমাকে নবদ্বীপ লইয়া যাইতেছি।

আমি। আপনার সঙ্গে নবদ্বীপ যাইতে হইলে পথে কোন্ কার্য্য করিতে হয়?

বাবাজী। কিছুনা,—তুমি কেবল আমার পদাঙ্কানুসরণ করিবে মাত্র।

আমি দণ্ডবৎ প্রনামপুর্ব্বক করযোড়ে বাবাজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, বাবাজী তাঁহার কন্থা, কাপড়, খড়িয়া, ঝোলা, প্রভৃতি জিনিষ পত্র দিয়া এক বিশাল মোট আমার ঘাড়ে তুলিয়া দিলেন।

আমি বাবাজীর অনুগ্রহ প্রাপ্তে পুলকিত হইয়া, অতি কষ্টে বোঝা লইয়া পাছে পাছে চলিলাম।

বাবাজী মহাশয় শিষ্যালয় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে বোঝা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এইরূপে সম্পূর্ণ এক বৎসর।

পরে আর বোঝা বহিতে পরি না, বড় অসহ্য হইয়া উঠিল। অগত্যা মধ্যে মধ্যে বলিতে বাধ্য হইলাম, "মহাশয়! নবদ্বীপ আর কতদূরে?" উত্তরে তিনি খুব শক্ত ধমক্ মারিতেন।

আমি বুঝিলাম, বাবাজীতো নবদ্বীপ যাইবে না, কেবল আমাকে একটা মোট বাহক বেগার ধরিয়াছেনমাত্র। যতদূর বুঝিলাম, ইহার অন্তঃকরণে নবদ্বীপের কোন ভাব লেশ নাই। কেবল অর্থোপার্জ্জনই ইঁহার মুখ্যোদ্দেশ্য ইনি কামনাময় হৃদয় লইয়া সর্ব্বদা স্থুল কার্য্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

তিনি যখন প্রথমই বলিয়াছেন, "আমি নবদ্বীপের বাবাজী" তখন বহু শিষ্য করাই ইঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, এ কথাটা আমি আগে বুঝিতে পারি নাই।

আর বোঝা ঘাড়ে করিয়া নিরর্থক কত ঘুরিয়া বেড়াইব। ইনিও নবদ্বীপ যাইবেন না, আমারও যাওয়া হইবে না। অগত্যা বাবাজীর বোঝা, বাবাজীকে বুঝাইয়া দিয়া নমস্কার পুর্ব্বক সটান সরিয়া পড়িলাম।

সেই হইতে, বাবাজী দেখিলেই আমার প্রাণ চমকিয়া উঠে। ভাবি, এই বুঝি নবদ্বীপের বাবাজী আমাকে নবদ্বীপ নিতে আসিতেছেন।

কোন মতে আসিয়া পূর্ব্ব স্থানে উপস্থিত হইলাম! এখন কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়াবস্থায় দাঁড়াইয়া আছি; এমন সময় একজন, বৈষ্ণব আসিয়া বলিলেন "আপনি আর কারো কথা শুনিবেন না, আমার এই পথে আসুন, এ পথ অতি পবিত্র এবং গোস্বামী সিদ্ধান্ত সম্মত।

আমি কহিলাম, "মহাশয়! পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া আমি আর কাহারও কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, আপনার পথের কর্ত্তব্যাদি কিছু কিছু বলুন তো।"

বৈষ্ণব ঠাকুর কহিলেন, "আপনাকে সম্পূর্ণ বলিতে এখন সময় নাই, ক্রমে বলিব এখন দিক দর্শন স্বরূপ কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি। এপথে, প্রাতঃ স্নান, তুলসী সেবা, সাধুসঙ্গ, নাম কীর্ত্তন, একাদশী ব্রত, বিগ্রহ সেবা, ইত্যাদি পরম কল্যাণকর অনেক বিষয় আছে।"

এই বৈষ্ণব ঠাকুরের কথা মত আমি খুব নিয়ম নিষ্ঠার অধীন হইয়া চলিতে লাগিলাম। একাদশী করি, সাধুসঙ্গ করি, আর শ্রীনাম কীর্ত্তনতো লাগিয়াই আছে।

শিষ্টাচার সম্মত ভজন পথে অগ্রসর হইতে হইতে, বোধ হইল যেন আমি শ্রীধাম নবদ্বীপের নিকটস্থ হইয়াছি।

কৃপাময় বৈষ্ণব ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর! নবদ্বীপ আর কতদূরে?" তিনি কহিলেন, "আপনার পক্ষে নবদ্বীপ এখনও বহু দূরে।"

শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। হায়! কি সর্ব্বনাশের কথা, প্রায় ১০বৎসর কাল, একাদশী, নাম কীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ করিয়াও যদি নবদ্বীপ বহু দূরে থাকে, তবে কি আর আমার যাওয়া ঘটিবে না?

কহিলাম, "ঠাকুর! আপনার কথামত সকল কার্য্যই প্রাণপণে করিয়াছি, তবু যে নবদ্বীপ অনেক দূরে বলেন?"

ঠাকুর কহিলেন,—"আপনি সদাচার সম্পন্ন এক জন বৈষ্ণব হইলেও নবদ্বীপ প্রবেশের এখনও উপযুক্ত হন নাই। শুধু নিয়ম নিষ্ঠায় কি বৈধী আচারাচরণে কেহ নবদ্বীপ যাইতে পারে না। নবদ্বীপ যাইতে হইলে, প্রেম ভক্তির সম্পূর্ণ

আবশ্যক। প্রেম ভক্তির অভাবে, সেই প্রেম-রসময় ভগবানের রাজ্যে যাওয়া বড় কঠিন। কঠিন কি? যাওয়াই ঘটেনা। আপনার নিয়মাচার বেশ সুন্দর হইয়াছে কিন্তু, আপনার অন্তঃকরণে প্রেম ভক্তির বিকাশ পায় নাই।

হায়! হায়! এতদিন এত অপতিত একাদশী, এত নাম কীর্ত্তন, এত সন্ধ্যা পূজা কি আমার ভস্মে ঘি ঢালার মত হইল? "বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা" তুলসী দাস ঠাকুরের এই কথাটা তো তবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যাহা হউক, শেষোক্ত বৈষ্ণব ঠাকুরের মতানুসারে সদাচার পথে আসিয়া আমার মন প্রাণ অনেকটা পবিত্র হইয়াছে। পাপ স্পৃহা অন্তর হইতে অন্তরিত হইয়াছে।

আবার সেই জংসনে আসিলাম কোন পথে—কোন দিকে চলিয়া যাই কিছুই ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। এই দুঃসময়ে, এই অন্ধকারে কে আমাকে নদীয়ার পথে পরিচালিত করিয়া দিবে।

হায়! আমি কি করিব? আর কত কাল এই যাতায়াতের পথে আঁসিব যাইব। গৌরগণ! তোমরা ব্যতিত এই লাঞ্ছিত জীবাধম নরপিশাচের আর গত্যন্তর নাই। তোমরাই আমার ভরসা স্থল, তোমরাই পতিত পাষণ্ডের, পথহারা পথিকের এক মাত্র অবলম্বন! আমি একান্ত মনে তোমাদের চরণে শরণ লইলাম;—তোমাদের দয়ার শরীর, আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দেও—বলিয়া দেও "কোন্ পথে যাব॥"

ভক্ত কালিদাস।

—:০:—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের হয় "মহাপ্রসাদ" নাম।
ভক্ত শেষ হইলে "মহা মহাপ্রসাদ" আখ্যান।
ভক্ত পদধূলি, আর ভক্ত পদ জল,
ভক্ত ভুক্ত-শেষ, এই তিন সাধনের বল॥

এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়।
পুনঃ পুন সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তা'তে বার বার কহি, শুন ভক্তগণ!
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬শ।

শ্রীবৈষ্ণব শ্রীভগবানের প্রতিমূর্ত্তি। এ হেন বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলে, পদরজ সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে বিনা সাধনেই চিত্ত নির্ম্মল হইয়া হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের সঞ্চার হয়।

যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে ভক্তগণ সহ লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় গৌড় দেশে কালিদাস নামে জনৈক উদারচেতা ভক্ত বাস করিতেন। তিনি কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। তিনি উত্তম উত্তম খাবার সামগ্রী উপহার লইয়া বৈষ্ণবের বাড়ী যাইতেন এবং তাঁহাদের নিকট উচ্ছিষ্ট পাত্র মাগিয়া লইতেন, কেহ না দিলে লুকাইয়া থাকিতেন পরে উহা ফেলাইয়া দিলে কুড়াইয়া লইয়া চাটিতেন।

এক দিন কালিদাস কতকগুলি সুপক্ক আম্র লইয়া ঝড়ু ঠাকুর নামক জনৈক বৈষ্ণবের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। ঝড়ু জাতিতে ভুঁইমালি। কালিদাস আম্রগুলি প্রদানানন্তর ঝড়ু এবং তদীয় পত্নীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর কালিদাসকে বহু সম্মান করিয়া বসাইলেন এবং কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত ইষ্ট গোষ্ঠী করতঃ বিনয় বাক্যে কহিলেন, মহাশয়! আপনি অতিথি, কিন্তু আমি নীচ জাতি আপনি জাতিতে উত্তম, কিরূপে আপনার সৎকার করিব। অনুমতি দিন, ব্রাহ্মণ গৃহে আপনার সেবার আয়োজন করিয়া দিই; আপনি তথায় গিয়া প্রসাদ পাইলে আমরা পরম আনন্দিত হইব। কালিদাস কহিলেন, ঠাকুর! আমি পতিত ও অধম, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি দর্শন পাইয়া পবিত্র ও কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে দয়া করিয়া কিঞ্চিত পদধূলি দিন এবং আমার মস্তকে একবার শ্রীচরণ অর্পণ করুন। ঠাকুর কালিদাসের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে কহিলেন মহাশয়! আমি নীচ জাতি, আপনি সৎকুলোদ্ভব অতএব আমার প্রতি আপনার

ওরূপ কথা বলা উচিত নহে। তখন কালিদাস নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পড়িয়া শুনাইলেন।

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥

"চতুর্ব্বেদ পারগ ব্যক্তিও মদীয় প্রিয় নহে, আবার আমার ভক্ত চণ্ডালও মদীয় প্রিয়। আমার ন্যায় সেও পূজনীয়, আমাকে দেয় (পূজা ভক্তি) তাহাকে দিবে আমার নিকট যাহা (জ্ঞানাদি) গ্রহণীয়, তৎসকাসে তাহা গ্রহণ করিবে।"

বিপ্রাদ্দি ষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যেতদর্পিত মনোবচনে হিতার্থং প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভুরিমানঃ।

"দ্বাদশ গুণ সম্পন্ন অথচ পদ্মনাভ শ্রীহরির চরণ কমলে বিমুখ বিপ্র অপেক্ষাও সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, যে চণ্ডাল আপন বাক্য, অর্থ, কায়মন প্রাণ ভগবানে সমর্পণ করিয়াছে। সেই চণ্ডালই আপনার বংশ পবিত্র করে, কিন্তু বিপ্র পারেনা।"

অহোবত শ্বপচোহতে বরীয়ান্,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নু রার্য্যাঃ,
ব্রহ্মান্ চুর্ণাম গৃণন্তি যে তে।

"যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান রহিয়াছে, সে চণ্ডাল হইলেও পূজ্যতম, যেহেতু তাহারা তোমার নাম গ্রহণ করে, তাহাতে তাহাদের তপস্যা, হোম, সর্ব্বতীর্থ স্নান, সদাচার এবং সামবেদ অধ্যয়ন করা হয়।"

শ্লোক শুনিয়া ঠাকুর মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং কহিলেন সত্য বটে যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমি নীচ জাতি এবং কৃষ্ণ ভক্তিহীন সুতরাং আপনার ওরূপ বাসনা পূর্ণ করিতে আমি সম্পূর্ণ অশক্ত।

অনন্তর কালিদাস তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণানন্তর গমন করিলে ঝড়ু ঠাকুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতদূর আসিয়া পুনরায় বাটী ফিরিয়া গেলেন। পথিমধ্যে যে যে স্থানে ঠাকুরের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল, কালিদাস ফিরিয়া আসিয়া সেই সেই স্থানের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করতঃ তাঁহার বাটীর নিকটস্থ কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

ঠাকুর বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া কালিদাস প্রদত্ত আম্র মানসে কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পণ করিলেন। সাধ্বী পত্নী পতিকে খাওয়াইয়া পশ্চাৎ নিজে খাইলেন এবং আম্রের চোকা, আঁঠি বাটীর বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে কালিদাস আসিয়া সে গুলি কুড়াইয়া লইয়া মনের আনন্দে চুষিতে লাগিলেন। গৌড় দেশে যত বৈষ্ণব বাস করিতেন কালিদাস এইরূপে সকলেরই উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

প্রতিবৎসর রথ যাত্রার সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর দর্শনার্থ নীলাচলে গমন করিতেন। কালিদাস যথা সময়ে তাঁহাদের সহিত নীলাচলে পঁহুছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কালিদাসের প্রতি কৃপামৃত বর্ষণ করিলেন। প্রভু প্রত্যহ জগন্নাথ দর্শনে যাইতেন, সেবক গোবিন্দ জলকরঙ্গ লইয়া তাঁহার অনুগামী হইতেন। সিংহদ্বারের উত্তর দিকে কপাটের আড়ে এক নিম্ন গর্ত্ত আছে, প্রভু তথায় পদ প্রক্ষালন করিয়া পরে ঈশ্বর দর্শনে যাইতেন। গোবিন্দের প্রতি প্রভুর আদেশ ছিল যে, কোন ব্যক্তি যেন তাহার পদজল লইতে না পায়। এইজন্য প্রাণীমাত্র কেহই সে জল লইতে পাইত না, কেবল অন্তরঙ্গ ভক্ত কোন ছলে তাহা লইতেন। এক দিন প্রভু পাদধৌত করিতেছেন এমন সময় কালিদাস তথায় আসিয়া হাত পাতিলেন। সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য প্রভু কালিদাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি ক্রমে তিন অঞ্জলি পান করিতেই প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন এবার তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলাম অতঃপর আর কখন এরূপ করিও না।

ধন্য ধন্য কালিদাস! আজ তুমি বৈষ্ণবে বিশ্বাসের ফলে প্রভুর শ্রীচরণামৃত পানে অধিকারী হইলে। যে পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা উদ্ভূত হইয়া জগৎ পবিত্র করিতেছেন, যে পাদপদ্ম লাভের আশায় শিব শ্মশানে ভ্রমণ করিতেছেন, আজ তুমি বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদে সেই ত্রিলোক-বন্দিত শ্রীচরণ প্রক্ষালিত সুধাবারি বিনা সাধনে পান করিলে। বল,বল কালিদাস! কবে আমাদের বৈষ্ণবে বিশ্বাস হইবে, কবে আমরা তোমার মত ঘৃণা লজ্জা ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিব, কবে আমরা তোমার মত জাত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের পদরজে লুণ্ঠিত হইব।

প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, কালিদাস আশা করিয়া বাহিরে বসিয়া রহিলেন। ভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র ভোজনান্তে গোবিন্দের দ্বারা স্বীয় দেবদুর্লভ শেষ পাত্র প্রদান করিয়া কালিদাসের মনোরথ পূর্ণ করিলেন।

শ্রীশশিভূষণ সরকার।

শ্রীসংকীর্ত্তন।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি, এল, লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

কলির জীবকুল স্বল্পায়ু, অন্নগতপ্রাণ এবং নিঃসত্ব। তাহাদের মন নিতান্ত চঞ্চল, ধ্যান ধারণার একান্ত অনুপযুক্ত। অবশ্য এ যুগে যে, একবারেই কেহ ধ্যান ধারণা করিতে পারেন না এরূপ নহে। বক্তব্য এই যে কলিযুগে ধ্যান ধারণাক্ষম লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। অধিকাংশ অধিবাসীর অবস্থা আলোচনা করিয়া কোন একটী যুগের ধর্ম্ম নিরূপিত হয়। সত্যযুগের মানব ধ্যান ধারণার যোগ্য ছিলেন। ত্রেতাযুগে যাগ যজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বরারাধনা সম্পন্ন হইত। দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইত। কিন্তু কলিতে যাগ যজ্ঞ করা কঠিন। কারণ সেরূপ সাত্ত্বিক পুরোহিত ও নাই এবং সেরূপ বিশুদ্ধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। রাজার ন্যায় সেবাই পরিচর্য্যা শব্দের বাচ্য। এখনকার লোক পরিচর্য্যা বিষয়েও অসমর্থ। যেহেতু তাহারা জীবিকা সংগ্রামে অষ্টপ্রহরই ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত। পূর্ব্বের ন্যায় জীবিকা সংগ্রাম সহজ নাই। সেই জন্য দয়ালু ঋষিগণ ব্যবস্থা করিলেন হরিনাম সংকীর্ত্তনই কলিজীবের ধর্ম্ম।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ,
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"
"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

তিনবার "এব" কার দ্বারা নামকীর্ত্তনই যে বর্ত্তমান যুগের একমাত্র সাধন তাহাই খ্যাপন করা হইয়াছে, কি কৃপা, কি অসীম অনুকম্পা! মানুষের কোন পুত্র যদি অশক্ত অকর্ম্মণ্য হয়, মানুষ তার জন্য কি করে? সে যাহাতে সহজে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে পিতামাতা তাহারই ব্যবস্থা করেন না কি? ঠিক সেইরূপ, ভগবান তাঁহার এই কলিযুগের অসমর্থ সন্তানগণের নিমিত্ত কোন কঠোর তপস্যার ব্যবস্থা করেন নাই। কেবল নাম কীর্ত্তন কর। সকল সাধনার ফল তোমার করতলগত হইবে। অবিশ্বাস করিও না। ত্রিসত্য করিয়া, ত্রিবাচক করিয়া তিনবার নিশ্চয়ার্থবোধক "এব"কার দিয়া শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুবর্ত্তী মহাজনগণ ঘোষণা করিয়াছেন যে, শ্রীহরির নামকীর্ত্তনেই জীব সাধ্য বস্তু প্রাপ্ত হইবে। নতুবা আর গত্যন্তর নাই।

আর অধিকার? কোন নিষেধ বিধি নাই। স্ত্রী শূদ্র বিধর্ম্মী সকলেই সমভাবে অধিকারী। চাই কেবল আন্তরিক শ্রদ্ধা। যার তাহা নাই মাত্র সে-ই অনধিকারী। কিন্তু শ্রদ্ধা থাকুক আর নাই থাকুক একবার যে ব্যক্তি প্রকৃত বৈষ্ণববীরের মুখোদ্গীর্ণ সংকীর্ত্তন বেণু শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহার হৃদয় সেই বিমলানন্দ আস্বাদন জন্য নিশ্চই লোলুপ হইবে। এত মধুরতা, এত সুধা, এত অমিয়া, এত নির্ভীকতা, এত অমরতা, এত পবিত্রতা, এত পাবকতা, এত সুখ আর এত আনন্দ, এত বীরত্ব, এত ধীরত্ব, এত অমায়িকতা জীব আর কোথায় পাইবে? একাধারে এত গুণের সন্নিবেশ শ্রীভগবানের স্বরূপ কোথায় দেখিতে পাইবে? তাই ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—

হরিনাম সংকীর্ত্তন গোলোকের প্রাণধন
রতি না জন্মিল কেন তায়।
সংসার বিষানলে দিবা নিশি হিয়াজ্বলে
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥

কেনই বা না হইবে? নামগান যে দেহ মন ও প্রাণের মূলীভূত আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট। দেহের জন্য যদি কোন চেষ্টা করা যায় প্রাণও মন তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপকৃত হয় না। মানসিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য যে সকল চেষ্টা করা যায় দেহ তাহাতে নাও উপকৃত হইতে পারে—উপবেসনশীল বিদ্যার্থীর দৈহিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সকলের মূলাধার যে আত্মা

তাহার উৎকর্ষ উপলক্ষে যে কোন কার্য্য করুন, দৃষ্ট হইবে যে তাহাতে দেহ মনও প্রাণ সকলকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বৃক্ষের মূলে সলিল সেচন করিলে তাহার পত্র পল্লব শাখা কি রসাভিষিক্ত হইতে বাকী থাকে? শ্রীভগবানের প্রীতি উদ্দেশ্যে অথবা ভগবৎপ্রীতির বশীভূত হইয়া কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই কর্ম্মের দ্বারা কি সর্ব্ব জীবের, না—না, সর্ব্ব বিশ্বের উপকার হইতে বাকী থাকে? ঠিক সেইরূপ, আত্মাকে আনন্দের পথে রাখিতে পারিলে দেহ মন প্রাণ স্বভাব বশেই সুস্থও সুখী হইয়া থাকে। শত অভাবেও ক্লেশ বোধ হয় না। শত দুর্ব্ব্যবহারেও বেদনা অনুভূত হয় না। সততই প্রাণে এক বিমল আনন্দ জ্যোতি খেলা করিতে থাকে। ভীতির পরিবর্ত্তে, নির্ভীকতা বিষাদের পরিবর্ত্তে প্রসাদ জীবাত্মার সহচর স্বরূপ হৃদয় ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকে। প্রাণ যেন সেই আনন্দময় ও আনন্দময়ীর বিহার মন্দিরে পরিণত হয়।

সংকীর্ত্তনে প্রকৃত পক্ষেই কলির জীব ধন্য হইয়াছে। ভগবানের অভয়বাণী সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যেই শুনা যায়। মানুষ নির্ভয় ও নিষ্পাপ হয়; ভয়কে জয় করে। শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শ্রবণে গোপিকাগণ যেমন তাঁহার সন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া সদ্য প্রক্ষীণবন্ধনা হইয়াছিলেন, সঙ্কীর্ত্তনের মধুর কর্ণানন্দী ধ্বনি শুনিয়া জীবগণ ও সেই-রূপ শ্রীভগবানের সামীপ্য লাভ পূর্ব্বক সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। এমন প্রাণোন্মাদক আনন্দ ত আর কিছুতেই নাই। যোগিগণেরব্রহ্মানন্দ নামগানানন্দের নিকট তিরস্কৃত হয়। যাঁহাদের কোন অভাব নাই, কোন অপেক্ষা নাই, আত্মারাম হইয়াছেন, অহঙ্কার গ্রন্থিচ্ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারাও ভগবন্নাম কীর্ত্তন জনিত নির্ম্মল আনন্দের বাঞ্ছা করেন। বৈদিক যুগের সামগাতা ঋষিগণের যে অপার আনন্দ তাহা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এক্ষণে সর্ব্বজীবের সুখায়ত্ত হইয়াছে। নাম গান সামগানের পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে।

তাই শাস্ত্রকারগণ সকল ক্রিয়াতেই হরিগুণকীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। "স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেসুমাধবঃ।" যাহা কিছু করণীয় স্নান আচমন তর্পণ, আহার বিহার, শয়ন পর্য্যটন সকলই শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি কামী হইয়া ও তাঁহার বিবিধ নামগুণ স্মরণ করিতে করিতে করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। স্বার্থসিদ্ধির কথা কদাপি যেন মনে না উঠে। তাহা হইলেই অমঙ্গল। সকল

কর্ম্মই বিশ্বহিতায় বা জগদ্ধিতায়, এই কথা যেন সততই স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে। তাহা না হইলে সকলই নিস্ফল।

"দানং ব্রতং তপোযজ্ঞং শ্রাদ্ধং বা পিতৃতর্পণং।
সকলং নিস্ফলং লোকে হরি সংকীর্ত্তনং বিনা॥"

কারণ মানবের চাই বিশুদ্ধ আনন্দ। তাহাই তাহার মঙ্গলের হেতু। সেই আনন্দ আমরা দেখিয়াছি সংকীর্ত্তনের মধ্যেই নিহিত আছে। যেমন শুক্তিতে মুক্তা থাকে, খনিতে মণি থাকে, জননীতে স্নেহ থাকে, পাত্রীতে প্রেম থাকে, ঠিক সেইরূপ সংকীর্ত্তনেই আনন্দ থাকে। সংকীর্ত্তনই আনন্দের নিধান। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন "সকলং নিস্ফলং লোকে হরি সংকীর্ত্তনং বিনা।" কেননা আনন্দই সফলতা। যদি সেই সফলতা চাও তবে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে সংকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিতে ভুলিও না। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ।

আনন্দ শব্দটীর প্রকৃত অর্থ 'বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম জনিত নিত্য সুখ' হইলেও লোকে সাধারণতঃ ইহাকে আমোদ প্রমোদ, সাংসারিক সচ্ছলতা প্রভৃতি নানা বিকৃত অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। এইগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে আনন্দ শব্দের বাচ্য নহে; কারণ ইহারা ক্ষণিক, কেহবা সদোষ, কেহবা নির্দ্দোষ বিশেষত এই গুলি দেহ ও মনকে অধিকার করিয়া সংঘটিত হয়। আত্মা পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃত আনন্দ আত্মাকে অধিকার করিয়া সমুদিত হয়। তাহা নিত্যও নিরবচ্ছিন্ন। সদোষতো নয়ই, পরন্তু কেবল মাত্র নির্দ্দোষ হইয়াই তাহার পর্য্যবসান হয়না, তাহা সগুণও বটে।

এই যে গুণ ইহা প্রাকৃতিক বা সৃষ্ট অর্থাৎ সত্ব রজঃ তমঃ ধর্ম্মাত্মক এবং অপ্রাকৃতিক বা আদিকারণের স্বরূপাংশভূত অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত বা অমায়িক ভেদে দ্বিবিধ। প্রকৃত আনন্দ প্রাকৃতিক গুণ বিশিষ্ট নহে, উহা প্রকৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী নিত্য গুণান্বিত পদার্থ। সংকীর্ত্তন এই শেষোক্ত শ্রেণীর আনন্দ। তাহার বহুবিধ অপার্থিব গুণ আছে। তন্মধ্যে যে গুলি শ্রেষ্ঠ তাহা শ্রীমন্ মহাপ্রভু একটী শ্লোকে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন—

"চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীসংকীর্ত্তনের প্রথম গুণ "চেতোদর্পণমার্জ্জনং" চিত্ত মুকুরের মালিন্য ক্ষালন করা। মানবের চিত্ত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মায়াবৃত করিয়া সৃষ্টি করা আছে। চিত্ত স্বভাবতঃ স্বচ্ছপদার্থ হইলেও মায়া মালিন্য তাহাকে অস্বচ্ছ করিয়া রাখিয়াছে। তাই তাহাতে হৃদয় গুহার অভ্যন্তরস্থিত বস্তু দৃষ্ট হয়না, তাই তাহার গতি বাহ্যবস্তুর দিকে। অন্তর্ম্মুখীন হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন। এই মায়াবরণ উন্মোচন করিতে পারিলে অন্তরাত্মার প্রতিবিম্ব তাহাতে প্রকাশিত হয়। তখন মানব-চিত্ত অন্তর্ম্মুখীন হইতে সমর্থ হয়, বাহ্যবস্তুকে উপেক্ষা করিতে পারে এবং আত্মানন্দ লাভ করতঃ অমর ও সদানুখী হয়। এই মায়াবরণ উন্মোচন চেষ্টার নামই সাধন। শ্রীভগবানের নাম রূপ গুণ লীলাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তের স্বচ্ছতা ফিরিয়া পাওয়া যায়। মায়ামালিন্য অপগত হয়। এই আবর্জ্জনা অপসারণ করিবার জন্য বহুবিধ সাধনা আছে কিন্তু শ্রীসংকীর্ত্তন যেমন সহজ সাধ্য ও আনন্দপ্রদ এমন অন্য কোনটীই নহে।

সংকীর্ত্তনের দ্বিতীয় গুণ "ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্" ভব অর্থাৎ সংসার বা জন্ম রূপ মহা দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করা। অরণ্যে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ ফলে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া অরণ্যকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। সংসারও ভীষণ অরণ্য সদৃশ। কামক্রোধাদি শ্বাপদ সমূহ এখানে সততই ক্ষুধার্ত্ত ভাবে বিচরণ করিতেছে। এই ভবারণ্যে ভক্তিরস বিহীন মানব শুষ্ককাষ্ঠ সদৃশ। এইরূপ দুই বা ততোধিক মানবের মধ্যে কোন কারণে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে ক্রোধানল সময়ে সময়ে দেশব্যাপী সমরানলে পরিণত হয়। শ্রীসংকীর্ত্তনের এই এক গুণ যে ইহাতে মানবগণের হৃদয়ে উদারতা, বিশ্ব প্রেমিকতা আসে। ক্রোধ দ্বেষ হিংসাদি সংকীর্ত্তিত সে মুক্তহৃদয়ের মুক্তবাতাসে পরিপুষ্ট হইতে পায়না। কাজে কাজেই সংসারের মহাদাববহ্নি ক্ষীণ, নিস্তেজ ও নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সর্ব্বত্র শান্তি, সখ্য ওঅন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়।

কেহ কেহ ভব অর্থাৎ জন্মই মহাদাবাগ্নি এইরূপ অর্থও করিয়া থাকেন। তাহা হইলে ভব অর্থাৎ জন্মকে নির্ব্বাপিত অর্থাৎ নিবৃত্ত বা নিরুদ্ধ করে এইরূপ

অর্থ হয়। বাস্তবিক, বাবাজী মহাশয়গণের উন্নত জীবনপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে এই অর্থও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক জীবের জন্ম জনিত ক্লেশ মোচন করিয়া দেন এবং এই রূপেই তাঁহারা জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করেন কিন্তু জীব না হইলে কাহার প্রতি আর করুণা করা হইবে? তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দের ব্রহ্মচর্য্য ব্রতখণ্ডণ করিয়া তাঁহাকে পরিণয় পাশে আবদ্ধ করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশানুযায়ী শ্রীমন্নিত্যানন্দও পরিণীতা ভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক সংসারী বা গৃহীর আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন।

অবশ্য সকলেই বাবাজী হইতে পারেনা। কিন্তু তর্কস্থলে যদি কখন তাই হয় এরূপ ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবী জনমানব শূন্য হইবার আশঙ্কা পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং গৃহীর পক্ষে প্রাগুক্ত অর্থ ও অগৃহীর পক্ষে শেষোক্ত অর্থ গ্রহণীয়।

সংকীর্ত্তনের তৃতীয়গুণ "শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং" অর্থাৎ মঙ্গল কুমুদ বিকসিত করিবার জন্য ইহা জ্যোৎস্না বিস্তার করে,—

"আপদাং কথিত পন্থা ইন্দ্রিয়ানাং অসংযমঃ।
তজ্জোয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম॥"

শ্রীসংকীর্ত্তনে ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হয় সুতরাং ষড়রিপু প্রবল হইতে পারেনা, ক্রমশঃ পরাজিত হয়। মানব জিতেন্দ্রিয় হয়। কাজে কাজেই সম্পদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত অভ্যুদয় দেখা দেয়, এমন দেখা গিয়াছে, একটী পল্লীস্থিত যাবতীয় গৃহীই পানাসক্ত অমিতব্যয়ী ও অত্যাচারী ছিলেন। কি ভগবানের করুণা, সেই পল্লীতে একটী সাধুআসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিলেন। এই অবস্থান কালে তিনি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন কিছুদিন পরে দুই একটী করিয়া পল্লীবাসী সেই সংকীর্ত্তনানন্দে যোগদিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ সেই বিমল আনন্দ তাহাদের এত ভাল লাগিল যে, পরিশেষে তাহারা সকলেই আপনাপন দুর্ব্ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তম গৃহস্থলক্ষণাক্রান্ত হইল। মনের সুখেও শান্তিতে পুত্র কলত্র লইয়া যথারীতি গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রতি পালন করিতে লাগিল। পরন্তু প্রত্যহ শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে ভুলিল না। কলিকাতা মাণিকতলার কোন পল্লীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

অতএব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে, শ্রীসংকীর্ত্তনে মঙ্গল কুমুদ বিকসিত করিয়া উপযুক্ত জ্যোৎস্না বিস্তৃত হয়।

ইহার চতুর্থ গুণ "বিদ্যাবধূ জীবনম্" অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃত বিদ্যা অর্জ্জন করেন তাঁহারা শ্রীভগবানের নাম গুণাদি কীর্ত্তন করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করেন। তাই মহাকবি মিল্টন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্যে লিখিয়াছেন যে, মানবসমাজের প্রতি শ্রীভগবানের কিরূপ ন্যায়পরতা তাহাই প্রদর্শন করা আমার এই রচনার মূল প্রয়োজন।

ইহার পঞ্চমগুণ "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্"। আনন্দসমুদ্রের স্ফীতি সম্পাদন করে, সুধাংশুর আকর্ষণে সাগর যেমন স্ফীত হয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের আকর্ষণেও তেমনি আনন্দ সাগর প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কেননা একমাত্র সংকীর্ত্তনই জীবকে নিখিল আনন্দধাম শ্রীভগবানের সম্মুখবর্ত্তী করায়। অন্য কিছুই তাহাকে আনন্দময় ও আনন্দময়ীর সমীপবর্ত্তী করিতে পারেনা।

ইহার ষষ্ঠগুণ "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং"। ইহার প্রতি পদে পূর্ণসুধা আস্বাদিত হয়। সুধা আস্বাদজনিত সুখ অমরগণেরই ভোগ্য। তাহাতে যেরূপ আনন্দ শ্রীসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠানেও ঠিক তদ্রূপ আনন্দ হয়। শ্রীসংকীর্ত্তন আনন্দময় ও আনন্দময়ীর প্রসঙ্গ। আনন্দই অমৃত। আনন্দময়ের প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই অমৃত ক্ষরিত হয়। অক্ষরে অক্ষরে সুধা ঝরে। পাষাণের ন্যায় কঠোর হৃদয়কেও কুসুমবৎ কোমল করে।

ইহার সপ্তমগুণ "সর্ব্বাত্ম স্নপনং।" ইহা সর্ব্বাত্মাকে পরিস্নাত করে। প্রেমরসে জীবের সর্ব্বাত্মাকে অভিষিক্ত করিয়া তাহার প্রাণে সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেয়। আত্মা, হৃদয়, জ্ঞান, দেহ কেহই অবশিষ্ট থাকেনা। সকলেই জাগ্রত ও পুষ্ট হয়। শ্রীসংকীর্ত্তন জীবকে সকলদিকে সমুন্নত করিয়া তুলে।

এপর্য্যন্ত আত্মার উন্নতি সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় বলা হইল। আত্মা আনন্দের কণা স্বরূপ। সেই আনন্দকে শ্রীসংকীর্ত্তন প্রবর্দ্ধিত করেন। কাজেই আত্মার উন্নতি সাধিত হয়।

অতঃপর হৃদয় বা নীতি ও জ্ঞান বা বুদ্ধি এবং দেহ বা স্বাস্থ্য শ্রীসংকীর্ত্তন দ্বারা কিরূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহোদয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিগত চট্টগ্রাম অধিবেশনে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহার সারাংশ নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন ;—

শ্রমশীল ব্যক্তিগণের সারাদিনের পর সংকীর্ত্তনই এক মাত্র আনন্দোৎসব। বাল্যকালে তিনি নিজেও এক সংকীর্ত্তন দলে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু যৌবনে সংকীর্ত্তন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কীর্ত্তনকারিগণের ঘর্ম্মাক্ত দেহ, উল্লম্ফন, বিকট চীৎকারাদি দর্শনে কীর্ত্তনের উপর তাঁহার অশ্রদ্ধা হইত। মনে করিতেন যাহারা গ্রহ নক্ষত্রের পরিচয় জানেনা, পরমাণু তত্ত্ব পাঠ করে নাই, ত্রিকোণমিতির জটিল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে শিখে নাই তাহারা লাঙ্গুল হীন জন্তু মাত্র।

কিছুদিন হইল শরীর বিধান পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সংকীর্ত্তনের মত ভাল জিনিস আর নাই। যাহাতে প্রতি গ্রামে ও প্রতি নগরের প্রতি পল্লিতে সংকীর্ত্তনের দল স্থাপিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয় লেখকবৃন্দের লেখনি সঞ্চালিত করা উচিত। সংকীর্ত্তনের ফল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

(১) তিনি ইহার পারমার্থিক ফল জানেন না। তাঁহার বিশ্বাস যে সংকীর্ত্তন না করায় বঙ্গীয় ভদ্রলোকগণের ঐহিক ও আর্থিক ক্ষতি হইতেছে।

(২) ইহা ইতর ও ভদ্রলোকগণের একমাত্র সম্মিলন স্থল। গ্রাম্য বিরোধের আদালত খরচ যদি সংকীর্ত্তন সূত্রে ঐক্য জন্য পুষ্করিণী খননে ব্যয়িত হইত তাহা হইলে পল্লীগ্রামে যুগপৎ প্রজাগণের স্বাস্থ্যোন্নতি ও জমিদারবর্গের আর্থিক উন্নতি হইতে পারিত।

(৩) ইহাতে চিত্ত বিষয় সমূহ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া কিয়ৎকালও শ্রীভগবানে অর্পিত হয়। ক্রমে উত্তম ভাব লইয়া কার্য্য করা মস্তিষ্কের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া উঠে।

(৪) ইহা একান্ত নিরীহ অথচ আমোদ জনক ও উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহার অনুষ্ঠান ফলে ডাক্তার ও ঔষধ খরচ বহু পরিমাণে হ্রাস হয়। দেশ মধ্যে অতি ক্ষীণ, অতিস্থূল, অজীর্ণ ও অম্লরোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা কমিয়া যায়। ফুস্ফুস ও হৃদয় যন্ত্রের ক্রিয়া সবেগে হইতে থাকে। উদরের পেশী, পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃত ও মূত্র যন্ত্র আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। রক্ত সঞ্চালন

অত্যন্ত বেগে হইতে থাকে। উদরের চর্ব্বিহ্রাস ও শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। ক্ষুধা তীক্ষ্ণ হয়।

এই জন্যই সক্রেটিশ নৃত্যকে উত্তম ব্যায়াম বলিয়া গিয়াছেন। ইংরাজদিগের বল নাচেও এইরূপ শারীরিক ফল আছে।

সংকীর্ত্তনে আনন্দ, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন একত্রে লাভ হয়। জীবন সংগ্রামের আয়াস কিছুক্ষণ বিস্মৃত হওয়ায় স্বাস্থ বৃদ্ধি হয়। ফুটবল ক্রীকেট আদি ক্রীড়া প্রচলন অপেক্ষা এরূপ নির্দ্দোষ আনন্দোৎসবের প্রচলন সমধিক বাঞ্ছনীয়।

সংকীর্ত্তনের আপত্তি কারীরা বলেন সংকীর্ত্তনে মন্দ লোকও যায়। উত্তরে তিনি বলেন যাহারা সংকীর্ত্তন করেনা তাহাদের মধ্যেও অনেক মন্দ লোক আছেন। ফুট বল ক্রীড়াথী, স্বদেশ সেবক প্রভৃতি সকল দলেই কুলোক থাকেন প্লেটোবলেন, "সাধুলোকে নেতা না হইলে কাজে কাজেই কুলোকে নেতা হইবে।"

অধ্যাপক মহাশয়ের খণ্ডিত উক্ত আপত্তি সত্ত্বেও অনেকে এখন বলেন যে, চীৎকারের প্রয়োজন কি? চীৎকারের শুভফল পূর্ব্বেই শরীর বিধান হইতে উক্ত অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন। এক্ষণে পবিত্রচেতা শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর উচ্চ কীর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন। হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন॥
ওহে হরিদাস একি ব্যাভার তোমার। ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়। ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়?
হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ত্ব। তোমরা সেজান হরিনামের মাহাত্ম্য॥
তোমা সবার মুখে শুনিয়া সে আমি। বলিতে কি বলিবাও যেবা কিছু জানি॥
উচ্চ করি লইলে শত গুণ পুণ্য হয়। দোষত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥

তথাহি;—উচ্চৈ শতগুণাধিক ইতি—

বিপ্রবলে উচ্চ নাম করিলে উচ্চার। শত গুণ ফল হয় কি হেতু ইহার।
হরি দাস বলেন শুনহ মহাশয়! যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয়॥
শুন বিপ্র সকৃত শুনিলে কৃষ্ণনাম। পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে সুদর্শনবচনং

"যন্নামগং ননখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভুয়স্তস্য পুর্ব্বউদাহৃত॥

পশুপক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে। উর্চ্চসংকীর্ত্তনে পর উপকার করে॥
জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তন কারী। শতগুণাধিক ফল পুরানেতে ধরি॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ। কেহ বা পোষণকরে সহস্রেকজন॥
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে। এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চসংকীর্ত্তনে॥
তথাহি শ্রীনারদীয় প্রমান বাক্যং ;—

"জপতো হরিনামানি শ্রবণে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনর্য্যুচ্চৈ জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ॥"

দুইটী গান।

(দীনবন্ধু বেদান্তরত্নের পরলোকগমনে।)

রাগিনী ইমন কল্যাণ—তাল কাওয়ালী।

—:০:—

মোহন মুরতী কেন, আঁধার করি জীবন
গগনে গাহিছ প্রেম গান।
বিরহ পবন বয়, নিরাশা নীরদ তায়,
শ্রবণ বধীর কায় কাঁপে মম ঘন ঘন॥
চরণে ঠেলিয়া গেছ, হৃদি দহে যাতনায়
এসেছি ছুটিয়া তাই তব প্রেম লালসায়।
দারুণ আঁধার ময়, এবে দশদিশী হায়
প্রেমদায় প্রাণ যায় কব কায় এ বেদন॥

রাগিনী ঝিঁঝিট—একতালা।

কি করে যে প্রাণ, কেমনে কহিব,
সতত তোমারি লাগিয়া।

ভুলি নাই দেব! তোমার মুরতী,
কেমনে রহিব ভুলিয়া॥
থাকিয়া থাকিয়া এই মনে হয়
দেবতা গো তুমি এ জগতের নয়
এসেছিলে তাই, দীন দয়াময়,
"দীনবন্ধু" নাম ধরিয়া॥
অন্তরে থাকনা ক্ষতি কিবা তায়,
হৃদয়ে আঁকিয়া রেখেছি তোমায়,
ভুবন আলো করা, কি মাধুরি হায়,
প্রকাশি কেমনে কহিয়া॥
যাচি জানুপাতি এই ভিক্ষা পায়,
পদতরী যোগে, তব অনুরাগে,
(যেন) প্রাণ যায় দেহ ছাড়িয়া॥

শ্রীবনমালী দাস ঘোষ।

আশ্রম ধর্ম্ম।

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামি লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—ঃ০ঃ—

এই আশ্রম গ্রহণ করিয়া বন্য বৃক্ষের পর্ণ, মূল ও ফল ভোজন, কেশ, শশ্রু ও জটা ধারণ, এবং ভূমি শয্যায় শয়ন করা আবশ্যক। বানপ্রস্থাশ্রমী প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান দেব পূজা, হোম, অতিথি সৎকার, ও ভিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক শীত গ্রীষ্মাদি জন্য ক্লেশ সহ্য করত তপোনুষ্ঠান করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে সর্ব্বদোষ বিমুক্ত হইয়া নিত্য লোক লাভ করিতে সমর্থ হন। এইরূপে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম প্রতি-

পালন করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। এই আশ্রমাবলম্বন করিলে, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সাধন কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হয়। সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বভূতে সমদর্শী, প্রাণিমাত্রের অনিষ্ঠাচরণে পরাঙ্মুখ ও ভেদ জ্ঞান বিহীন হইবেন। গ্রাম মধ্যে একরাত্র ও পুর মধ্যে পঞ্চ রাত্রির অধিক বাস করা তাহাদের কর্ত্তব্য নহে। যে স্থানের লোক সমুদয় তাহাদের প্রতি ভক্তি অথবা দ্বেষ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিবেন। গৃহস্থ পাক ভোজনাদি সমাপনান্তে চুল্লী হইতে অঙ্গার সমুদয় উদ্ধৃত করিলে সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারা প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ভিক্ষার্থী হইয়া তাহাদিগের নিকট গমন করিবেন। কাম ক্রোধ ও লোভাদি একবারেই তাহাদিগের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তাহারা কদাচ কোন প্রাণীকে ভয় প্রদর্শন অথবা কোন প্রাণী হইতে ভীত হইবেন না। সর্ব্বদা হিংসাদি বর্জ্জিত ও সমদর্শী হওয়া তাঁহাদিগের একান্ত আবশ্যক। এইরূপ নিয়মাবলম্বী না হইলে কোনরূপেই ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করা যায় না। অতএব ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় কর্ম্ম বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলে সন্ন্যাসিগণ অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরমার্থ মোক্ষলাভে সমর্থ হইতে পারে।

যে মহাত্মা এই নিয়মে সন্ন্যাসাশ্রম প্রতিপালন করেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হন সন্দেহ নাই। সমুদায় আশ্রম ধর্ম্ম সংক্ষেপে পরিকীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে বিশেষরূপে গৃহধর্ম্ম বর্ণন করা যাইতেছে।

গৃহস্থ ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। যে গৃহী কামনা পরিশূন্য হইয়া প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে দৈব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই কর্ম্মফল সনাতন নারায়ণে সমর্পণ করেন তাঁহাকে সাত্ত্বিক, যে গৃহী অহংকর্ত্তা জ্ঞানে ভোগ কামনায় ভগবানের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে রাজস, এবং যে গৃহী তমোগুণে প্রমত্তহইয়া কেবল যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায় দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহাকে তামস গৃহস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই তিন প্রকার গৃহস্থের মধ্যে সাত্ত্বিক গৃহস্থই প্রশংসনীয়। অতএব গৃহী মাত্রেরই সত্ত্বগুণ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। গুণভেদেই গৃহস্থের ধর্ম্মাধর্ম্ম ও শুভাশুভ প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হয়। যে গৃহস্থ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিয়া তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারেন তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া চরমে পরম

গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। সংযত ভাবে দৈবকর্ম্মের আচরণ গৃহস্থের চিত্তশুদ্ধির একমাত্র কারণ। অতএব গৃহিগণ প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শৌচ ক্রিয়া সমাপন করিয়া স্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপনানন্তর নিত্য-কর্ম্ম সমাধান করিবেন। তৎপরে দৃঢ়তর ভক্তি সহকারে নত শির হইয়া পরমারাধ্য জনক জননীর পদরেণু মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা লইয়া বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। শাস্ত্রে কথিত আছে, ব্রাহ্মণ, সাধ্বী স্ত্রী, সুরা পুরিত কলস ও অগ্নি দর্শন করিলে দেবীকে বা বিষ্ণুকে স্মরণ পূর্ব্বক প্রণাম করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

গৃহিগণ তত্ত্ব জ্ঞানী পরমহংস ও ভগবৎ পরায়ণ সাধু ব্যক্তিকে দর্শন করিবা-মাত্র প্রণাম করিবেন। অশোক বৃক্ষ, চতুষ্পথ ও শশ্মান ভূমিকে নমস্কার করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে গৃহস্থ অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণে পরাঙ্মুখ, পিতৃ যজ্ঞে, দেবারাধনায় বিরত এবং সুরাপানাদি দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসদাচার অবলম্বন করে, যে গৃহস্থ নিয়ত লোভপরতন্ত্র হইয়া অন্যের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত, আচার ভ্রষ্ট, সাধুনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, যে গৃহস্থ ব্রহ্মস্বাপহরণ ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্ম করিতে ও কুণ্ঠিত না হয় এবং যে গৃহস্থ প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া স্ব কপোল কল্পিত অবৈধ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করে, সেই নরাধমগণ স্বীয় মহাপাতক হইতে কদাচ নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয় না। তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ নিরয়গামী হইয়া অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। গৃহিগণ ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সম্পদের অভিলাষী হইলে সত্যবাদী হইবেন। সত্যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত আছে। সত্যবাদী সদ্ গৃহস্থ ইহলোকে যাবজ্জীবন পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন। অসত্যবাদীর উভয় লোকেই যন্ত্রণা। যে ব্যক্তি স্বীয় সুখাভিলাষে মিথ্যা বাক্যে সত্যের প্রলেপ দিয়া অন্যকে প্রতারণা করে, তাহার সেই মিথ্যা জনিত সুখ ক্ষণিক মাত্র। অল্পকাল মধ্যেই তাহার মিথ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তখ তাহাকে আর কেহ বিশ্বাস করে না, সুতরাং সেই হতভাগ্য ব্যক্তি ইহলোকে যার পর নাই ক্লেশ ভোগ করে এবং পরলোকেও তাহাকে সেই মিথ্যা জনিত দুষ্ক্রিয়ার ফল ভোগ করিতে হয়।

সত্যের জয় অসত্যের পরাজয় এই মহাবাক্য লোকসমাজে চির প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। অতএব গৃহবাসী মহাত্মারা সর্ব্বদা সত্যবাদী ও সদ্ বুদ্ধিশালী হইবেন। সত্যপরায়ণ ধী শক্তি সম্পন্ন গৃহস্থকে কদাচ অবসন্ন হইতে হয় না। শাস্ত্রে বুদ্ধিকে হিতাহিত জ্ঞানরূপে ব্যাখ্যাকরা হইয়াছে। কোন জীবই সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধি বিরহিত নহে। কিন্তু মানব শরীরে অধিষ্ঠিতা বুদ্ধিই স্ফুর্ত্তিমতী হয়। এই বুদ্ধির গুণগ্রাহিণী শক্তি বিদ্যমান আছে। পরিচালনার তারতম্যেই ইহাতে সৎ অসৎ উভয় গুণের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্র জ্ঞানোপদেশাদি দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি অসৎ গুণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে, কাম ক্রোধাদি রিপু সমুদায়ের প্রলোভনে তাঁহাকে কদাচ মুগ্ধ হইতে হয় না। অসৎ প্রবৃত্তি যখন তাঁহাকে অসৎমার্গে নীত করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তিনি কেবল সেই সদ্বুদ্ধির সহায়তায়ই কুপথে পদার্পণ না করিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থান করেন। সুবুদ্ধি ধার্ম্মিক গৃহস্থ লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন। ধর্ম্ম বলের তুল্য বল আর কিছুই নাই। ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে কথন কখন জন্মান্তরীন কর্ম্ম ফলে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু ধর্ম্মই তাহাকে সমুদয় বিপদ হইতে উদ্ধার করে। ধার্ম্মিক গৃহস্থের ভবনে লক্ষ্মীদেবী দীর্ঘকাল সুস্থির ভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। এই সংসারক্ষেত্রে সুখ দুঃখ কুলাল চক্রের ন্যায় নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। সুখের অবসানে দুঃখ ও দুঃখের অবসানে সুখ সমাগত হয়। সম্পদ ও বিপদ সুখ দুঃখ সমুৎপাদন করে। সুতরাং জীব মাত্রেই সম্পদ সময়ে সুখ বিপদ সময়ে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কোন গৃহস্থের ক্রমান্বয়ে চিরকাল দুঃখ সমুৎপন্ন হয় না; বিপদ সম্পদ সমুদায় পরিবারকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। যে কোন অবস্থা উপস্থিত হউক গৃহিগণ কোন সময়েই অবসন্ন হইবে না। সর্ব্বদা তাহাদিগের ধৈর্য্য গুণ অবলম্বন করা আবশ্যক। আপদ কাল উপস্থিত হইলে তাহারা ব্যাকুলিত না হইয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত প্রশান্ত ভাবে সদুপায় উদ্ভাবন করিবে।

বিপদ কালে অবসন্ন বা হতবুদ্ধি হওয়া কাপুরুষের কার্য্য। সাহস ও ধৈর্য্য গুণ না থাকিলে বিপন্ন ব্যক্তিকে বিষম ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এই রূপ বিপদ কালের ন্যায় সম্পদ সময়েও গৃহিগণ ধৈর্য্যাদি গুণ হইতে বিচলিত হইবেন।

যাহারা সম্পদ সময়ে গর্ব্বিত উদ্ধতও অপরিমিতাচারি হয়, তাহারা অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া অশেষবিধ মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব কোন কালেই ধৈর্য্যগুণ পরিত্যাগ করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে। ধৈর্য্য বিহীন ব্যক্তিই শোকে মোহে জড়ীভূত হয়। পুত্র কলত্রাদির বিয়োগ ধৈর্য্যশালী তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা ব্যক্তিকে কোন রূপেই ব্যাকুলিত করিতে পারেনা। ইষ্ট বিয়োগ সময়ে সংসারী শোকাভিভূত না হইয়া স্থির চিত্তে এইরূপ বিবেচনা করিবে যে, ইহলোকে সমুদায় পদার্থই অনিত্য। ভবিতব্যতা অতিক্রম করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। যখন সংযোগের পরিণাম বিয়োগ ও বিয়োগের পরিণামই সংযোগ বিহিত রহিয়াছে এবং প্রতি নিয়তই যখন বহু সংখ্যক বস্তুর উদ্ভব ও বিকার লক্ষিত হইতেছে, তখন নষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক করা কদাচ বিধেয় নহে। আত্মার কোন কালেই রূপান্তর ও বিনাশ নাই। আত্মার আধার দেহই বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা দ্বারা রূপান্তরিত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ধৈর্য্যাদি গুণাবলম্বন গৃহস্থের যেরূপ আবশ্যক ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা ও গৃহীর সেইরূপ প্রয়োজনীয়। ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলে গৃহীকে পদে পদে বিপন্ন ও মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়। কাম ক্রোধাদি ষড়রিপুর অসাধ্য কিছুই নাই। উহারা প্রত্যেকেই মহা অনর্থ উৎপাদন করে। বিশেষতঃ কামই রিপুগণের অগ্রগণ্য। উহার প্রভাবে যে কত শত বিশুদ্ধকুল কলঙ্কিত ও কতশত ধার্ম্মিক লোক কুপথ গামী হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অতএব গৃহিগণ রিপু শাসনে কদাপি শৈথিল্য প্রদর্শন করিবে না। যে রিপু যাহার প্রতি একবার প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়াছে পুনর্ব্বার তাহাকে দমন করা সেই ব্যক্তির অতিশয় কঠিন কর্ম্ম।

যিনি জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয় সমুদায় পরাজয় করিয়াছেন, ইহলোকে তিনিই যথার্থ সাধু। জিতেন্দ্রিয় নিরহঙ্কারী মহাত্মারা উভয় লোকে অনির্ব্বচনীয় পবিত্র সুখ সম্ভোগের অধিকারী। অহঙ্কার গৃহস্থের অনিবার্য্য শত্রু। অহঙ্কৃত ব্যক্তি কখনই সুখী হইতে পারে না। অহঙ্কার মদে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হয়। অহঙ্কারী আপনিই আপনার রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করে। যে কোন ব্যক্তি যতদূর কুলশীল সম্পন্ন, ধনী, মানী ও জ্ঞানবান হউন না কেন, অভিমানী মনে করেন এই জগতে আমার তুল্য প্রধান কেহই

নাই। আমি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক। আমি কোন বিষয়ে কাহার পরামর্শ গ্রহণ করিবনা। যে ব্যক্তি এইরূপে অভিমানে পরিপূর্ণ হয়, সংসারে তাহার কোনকালেও সুখ লাভ হয় না। সকল লোকেই ঈদৃশ ব্যক্তিকে অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা করিয়া থাকে। অতএব অহং বুদ্ধি ত্যাগ করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। অভিমানীর কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই ধন মান কুল বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়েই লোকের অভিমান সমুৎপন্ন হয়। এই অভিমানই মনের মল স্বরূপ। সুতরাং ইহাকে দূর করিতে না পারিলে মনকে নির্ম্মল করা যায় না। আমার তুল্য ধনী কেহই নাই। আমি সর্ব্বাপেক্ষা মানী, আমার মত কুলীন কে আছে। বিদ্যাতে আমাকে কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না ইত্যাকার জ্ঞান কেবল মূঢ়তারই পরিচয় প্রদান করে। যাঁহারা সতত সাধুসংসর্গে বাস করিয়া সাধুদিগের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করেন অভিমান তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না। অতএব সাধুসঙ্গে বাস করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গৃহিগণ অসৎ সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন। ইহলোকে গৃহস্থ ধর্ম্মের তুল্য উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। যিনি যথা বিধানে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনিই পুণ্য জনিত পবিত্র সুখের আস্বাদন করিতে সক্ষম হন। এই সংসারেই পাপ ও পুণ্য উভয় প্রকার পথ বিদ্যমান আছে। পাপ পথে বিবিধ প্রকার প্রলোভনীয় বস্তু রহিয়াছে। কিন্তু এই পথের শেষ সীমায় যন্ত্রণাময় নরক। অজ্ঞানান্ধ মূঢ় ব্যক্তিরা আশু সুখ লোভে এই পাপ পথের পথিক হইয়া পরিশেষে সেই যন্ত্রণাময় নরকে নিপতিত হয়। পুণ্য পথে লোভনীয় কোন বস্তু নাই কিন্তু এই পথের প্রান্ত ভাগে পবিত্র নিত্য সুখের আধার শান্তিময় ধাম বিরাজিত রহিয়াছে। প্রথমে ব্রত নিয়মাদি শারিরীক ক্লেশ সহ্য করিয়া এই পথে বিচরণ না করিলে সেই শান্তিময় ধামে গমন করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক মহাত্মারা আশু সুখে বিমোহিত না হইয়া কঠোর নিয়মাবলম্বনে পুণ্য পথে বিচরণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সেই নিত্যানন্দময় পরমধামে গমন করত অনন্ত কাল বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিয়া থাকেন। পুণ্য জনিত পবিত্র সুখের নিকট পাপ জনিত ইন্দ্রিয় সুখ অতি তুচ্ছ। কোন একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অন্তঃকরণে যে একটী অপূর্ব্ব সুখের উদ্রেক হয়, তাহাই পবিত্র সুখ, আর অসৎ কার্য্য দ্বারা

নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থ করিলে যেসুখ জন্মে তাহাই ইন্দ্রিয় সুখ। এক্ষণে ধীমান ধার্ম্মিক সম্প্রদায় বিবেচনা করুন, পবিত্র সুখের সহিত ইন্দ্রিয় সুখের কত অন্তর। অতএব গৃহিগণ বিষয় লালসায় বিমোহিত হইয়া পাপ পথে বিচরণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সুখে কদাচ আসক্ত হইবেন না। যেকার্য্য দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ হয়, সেই কার্য্যই গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। শৌচাচার পরায়ণ পিতৃ মাতৃ ভক্ত ধার্ম্মিক গৃহস্থের ভবনে দেবগণের আবির্ভাব হয়। আপদ সময়েও গৃহিগণ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। অতিথিকে দেবতুল্য জ্ঞানে যথোচিত সৎকার করিয়া স্বয়ং পান ভোজন সমাপন করিবেন। জনক জননী জীবিত থাকিলে ভক্তি সহকারে তাঁহাদিগের শুশ্রুষাকরা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি এই রূপে ধর্ম্মপথে অবস্থিত থাকিয়া বিধি পূর্ব্বক গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন করেন তিনিই ইহলোকে পরম সুখে কাল যাপন করিয়া পরলোকে স্বর্গ সুখের অধিকারী হন। এই নিমিত্তই গৃহস্থ ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয় হইয়াছে, এই ধর্ম্ম বিধি পূর্ব্বক প্রতিপালিত হইলে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গার্হস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া সেই ধর্ম্ম নিয়মিত রূপে পালন না করেন তাঁহাকে উভয় লোকেই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। স্বধর্ম্ম পরায়ণ ধার্ম্মিক গৃহস্থ উভয় লোকেই স্বর্গ সুখ অনুভব করিতে সক্ষম হন। ধর্ম্ম পথে বিপদের লেশ মাত্র নাই। অতএব গৃহিগণ প্রকৃত রূপে স্বধর্ম্ম পালনে যত্নবান হইবেন। যে গৃহী আন্তরিক ভক্তির সহিত স্বীয়ধর্ম্ম রক্ষা করেন তাহাকে যথার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া গণণা করা যায়। যাহারা লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্খার দৈব অথবা পৈত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাহারা কখনই ধার্ম্মিক পদবাচ্য হইতে পারেন না। যে গৃহস্থ অকপট ভাবে ঐকান্তিক মনে স্বধর্ম্মোচিত কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠান করেন, তাহারই ইহলোকে পরম সুখ ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়। অলমিতি।

নিত্যধামগত

পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন।

(জীবনী প্রসঙ্গ)

(১১)

—:০:—

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা।

জীবের চির সুহৃদ, জগতের আশা, আনন্দ ও আশ্রয়, পরম করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর উপদেশ দিয়াছিলেন—

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং

শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।

সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।

অর্থাৎ যে নাম সংকীর্ত্তন চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জনা করে, যাহার অনুষ্ঠানে মনের মলিনতা দূর হয়; যাহা সংসার রূপ দাবানল নির্ব্বাপন করে, চন্দ্র কিরণে যেমন কুমুদ প্রস্ফুটিত হয় সেইরূপ যে নাম সঙ্কীর্ত্তনে হৃদয়ে ভাবের আবির্ভাব হয়; যে নাম সংকীর্ত্তনে জ্ঞানের উজ্জ্বলতা বা দৃঢ়তা বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে মনে অসীম আনন্দ লাভ হয়, যাহাদ্বারা প্রতিপদে পূর্ণ অমৃত রস আস্বাদন হয় এবং যাহাতে অন্তরে ও বাহিরে ভগবদ্ভাবের উদয় হওয়ায় চিত্ত ও দেহ শুদ্ধ হয়, সেই নামের জয় হউক।

নাম কীর্ত্তন বা প্রার্থনার এই যে প্রয়োজনীয়তা, ইহা দীনবন্ধু, আদি ও দৃঢ় সোপান বলিয়া নিজে যেমন ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচিত অপরিচিত সকলকেই, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেন। ভবানীপুর ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার হইতে লাগিল, কিন্তু তৎসঙ্গে, যাহাতে লোক-চিত্ত-নির্ম্মলকারী নাম কীর্ত্তনের প্রচার হয়, লোকে সরল ভাবে প্রার্থনা করিতে উদ্যত হয়, ভাবে ভাবে ভাবিত হইয়া সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব জাগাইতে সমর্থ হয়, এইজন্য বিবিধ প্রবন্ধ 'ভক্তি' পত্রিকায়

প্রকাশ করিতেন, এবং "পাণ্ডব গীতা" 'স্তোত্র পদ্ধতি", 'উপাসনা সঙ্গীত" প্রভৃতি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন।

নাম, ভগবানের নাম আমরাও করি পাখীতেও করে, আবার "গ্রামোফোণের যন্ত্র হইতেও উত্থিত হয়। কিন্তু ইহাওতো শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী নিনাদে যমুনায় উজান বহিয়াছিল। প্রহ্লাদের বিশ্বাস ও ভক্তিতে, স্ফটিক স্তম্ভে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল। এ সকল পৌরাণিক আখ্যান ছাড়িয়া খাঁটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা আলোচনা করুন। এই বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর বেশে, বাঙ্গালীর অবতার, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, যখন নাম কীর্ত্তন করিতেন তখন কি দৃশ্য ভক্তজনের নয়ন পথে পতিত হইত। শ্রীভগবান সেই লীলা এখনও করেন, ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া যখন প্রার্থনা করেন, নাম কীর্ত্তন করেন তখন—তাহা প্রত্যক্ষ হয়। ভাবের স্রোতে কীর্ত্তন করিতে করিতে যে আনন্দ প্রবাহ ছুটিয়া যায়—মধুর নৃত্যই তাহার বাহ্য বিকাশ। তাই শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন :—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।"

আর এই সার সত্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াই, ভক্ত বৈষ্ণব গাহিয়াছেন :—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

বাস্তবিক এহেন ভক্তেরা প্রকৃত ভাগ্যবান বটেন। নাম কীর্ত্তনে, চিত্তশুদ্ধ হইলে এই রূপ ভক্তি লাভ হয়, নচেৎ কেবল চিটে, ফোঁটা, টিকি, তুলসী মালা বা নামাবলীর ভিতর ভক্তি সীমাবদ্ধ নহে। তাই বৈষ্ণব সাধক বলিয়াছেন,—

"ভক্তি ভক্তি ভক্তি—কহে সর্ব্বজন
ভক্তি এই—'কৃষ্ণ' ব'লে—শরণ ক্রন্দন।"

ভক্তবর দীনবন্ধু, তাই কাতর প্রাণে কেবল ভগবৎ চরণে শরণাপন্ন হইয়া, আকুল ভাবে প্রার্থনা করিতেন, আর সকলকেও তাহাই করিতে উপদেশ দিতেন। ভাগবত প্রচার হইতে লাগিল, অন্যান্য পুস্তিকা প্রচার হইতে লাগিল, লোকে ধর্ম্মালোচনায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি প্রচার কার্য্যে

ব্রতী হইলেন। কেবল লেখায় বা কথায় নয়, প্রকৃত ভাবে জন সমাজে তাঁহার প্রাণের উন্নত ভাবগুলি প্রচার করিবার জন্য মানুষকে মানুষ হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবার উপযোগী করিবার জন্য, তিনি শিক্ষক রূপে, আচার্য্য রূপে, প্রচারক রূপে জন-সমাজে বাহির হইলেন।

কলিকাতা ও বঙ্গের নানাস্থানে সভা সমিতি হইতে লাগিল। দীনবন্ধু, সর্ব্বত্র গমন করিয়া, নানাবিষয়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বক্তৃতার ভিতর— সেই একতত্ত্ব, এককথা সর্ব্বত্র পরিপুষ্টিত হইতে লাগিল। মানুষ কে? কি নিমিত্ত এজগতে আসিয়াছে? এজগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? এজীবনের পরিণতি কোথায়? শ্রীভগবানের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? কেমনে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়—সে আনন্দময়ের আনন্দধামের পথে অগ্রসর হইতে হয়— এই কথাই আলোচিত হইত।

সে আলোচনারও একটু বিশেষত্ব ছিল। সর্ব্ব প্রথমে কোন কিছু বলিবার অগ্রেই দীনবন্ধু, সরল ভাবে প্রার্থনা করিতেন। সে সরল ও সুমধুর প্রার্থনা গীতি বা স্তোত্রের সুললিত আবৃত্তি শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের বিক্ষিপ্ত চিত্ত, স্থির হইত; বক্তার প্রতি তাহারা যখন আকৃষ্ট হইত, তখন বক্তৃতা আরম্ভ হইত। সে বক্তৃতার ভাবও ঐরূপ। যেমন ছোট শিশুকে তাহার জননী হাত ধরিয়া ' চলি চলি পা পা" বলিয়া পদচারণা করিতে শিক্ষা দেন, দীনবন্ধুও সেইরূপে, শ্রোতৃবর্গের চিত্তকে ধীরে ধীরে উন্নত ভাবের পথে অগ্রসর করাইতেন। এইরূপে যখন শ্রোতৃবর্গ ভাবে ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেন, তখন তিনিও তন্ময় হইয়া উঠিতেন এবং ভাবের অনুযায়ী মধুর কীর্ত্তন করিতেন। সে কীর্ত্তন শ্রবণে, শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে বীণাযন্ত্রের তারের মত ঝঙ্কার উঠিত।

সে মধুর সংকীর্ত্তনের এমনিই পূর্ব্ব প্রভাব ছিল। উহা কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে আকুল করিয়া দিত। শিবপুর "নদীকুল সমিতির" নৈতিক শাখার প্রথম অধিবেশনে, "এ জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য" সম্বন্ধে আজ দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে, তিনি এই ভাবে বক্তৃতা করিয়া যে কীর্ত্তন করেন, তাহা এখনও যেন কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

বলা উচিত, এই সমিতির সভ্যগণ, সকলেই উচ্চশিক্ষিত; ইহাদের মধ্যে অবসর প্রাপ্ত জজ, ডেপুটি, উকীল প্রভৃতি ও ছিলেন। আর, মান্যবর ডিউক সাহেব এই সমিতির পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন। এহেন শিক্ষিত ব্যক্তিদের হৃদয়ে দীনবন্ধুর কীর্ত্তন ভক্তিভাবের উন্মেষ করাইয়া দিত। তাঁহারা, প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া, রীতি মত ভাবে সভার অধিবেশন করিতেন এবং দীনবন্ধুকে ইহার আচার্য্য পদে বরণ করিয়া ছিলেন।

(ক্রমশঃ) শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। পৌষ, ১৩২০।

ভক্তি।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

ভক্তির্ভগবত সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

"ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল" কর্ত্তৃক পরিদর্শিত।

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভক্তি কার্য্যালয়,
ভাগবতাশ্রম, কোঁড়ার বাগান, হাওড়া
হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হাওড়া
ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টীং ওয়ার্কস্
হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা। প্রতি খণ্ড ৵০ দুই আনা।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
প্রার্থনা	শ্রীদীনেশ চন্দ্র শর্ম্মা।	১১৩
দীনবন্ধু জীবনী	শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।	১১৫
গান	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ	১২১
জ্ঞানের বিকৃতি	শ্রীমধুসূদন গোস্বামী	১২৩
শ্রীগৌরাঙ্গের ফুল-সাজ	শ্রীহরিদাস গোস্বামী	১৩১
প্রেমময়ী-চিন্তা	শ্রীগোপীবল্লভ গোসাঞি	১৩৩
শ্রীগুরু-তত্ত্ব	শ্রীসচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্মময়ী	১৩৭
শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুর	শ্রীরাধারমণ দাস গুপ্ত	১৩৯
শ্রীল বংশীবদন ঠাকুর	শ্রীহরিদাস গোস্বামী	১৪৩

মাত্র তিন মাসের জন্য,

ভক্তির গ্রাহকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ।

আগামী ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে যিনি ১৲ টাকা জমা দিয়া ভক্তির বর্ত্তমান ১২শ বর্ষের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তিনি বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত ভক্তিতো পাইবেনই অধিকন্তু নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী বিশেষ সুলভ মূল্যে পাইবেন। মনে রাখিবেন মাত্র তিন মাসের জন্য।

পুস্তকের নাম।	সাধারণ মূল্য।	গ্রাহকের পক্ষে।
প্রীতি (ধর্ম্মভাবোদ্দীপক গীতি কাব্য)	।৵০	।০
অমিয়া বিন্দু	॥০	।৵০
শ্রীচৈতন্য চরিত	৶০	৵০
অবধূত নিত্যানন্দ	৶০	৴১০
হরিবোল (গীতপঞ্চবিংশতি উপহার সহ)	১৲	॥০
বৈষ্ণবদর্পণ (১ম ও ২য় ভাগ একত্রে)	১৲	৸০
দম্পতীদর্পণ	৵০	।০
৩য় বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষের ভক্তি প্রতি বর্ষ পৃথক ভাবে বান্ধান	৯৲	৭৲
প্রতি বর্ষ	১৲	৸৵০
দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি	৵০	৴০

প্রত্যেক পুস্তকের ডাক মাশুল পৃথক একত্রে সমস্ত গুলি লইলে ডাঃ মাঃ অর্দ্ধেক লাগে।

ঠিকানা—

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
ভাগবতাশ্রম, ভক্তি কার্য্যালয়,
কৌড়ার বাগান, হাওড়া।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

১২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, পৌষ। সন ১৩২০ সাল।

প্রার্থনা।

—:০:—

যৎকৃতং যৎকরিষ্যামি তৎসর্ব্বং ন ময়াকৃতং।
ত্বয়া কৃতন্তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥

হে মধুসূদন! আমাকে সর্ব্বদাই এই ভাবে রাখ, যেন যাহা করিয়াছি, যাহা করিতেছি এবং যাহা যাহা করিব তাহা সকলই তুমি করাইতেছ, তুমিই সকল কর্ম্মের ফলভোক্তা আমি তোমার দাস এই ভাবে কার্য্য করিতে পারি।

মঙ্গলময়! তোমারই মঙ্গল ইচ্ছায় এই বিশ্বের যাবতীয় কার্য্য সুমঙ্গলে সাধিত হইতেছে, যে তোমার ভাবে হৃদয় বিশুদ্ধ করিয়া তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছার সংযোগ করিতে পারিয়াছে সেই ব্যক্তিই ধন্য এবং সে-ই তোমার এই বিশ্ব-বিমোহিনী মোহজননী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরমানন্দ প্রদ ভক্তি ধনে ধনী হইতে পারিয়াছে। যাহার কিছুতেই আমিত্ব বোধনাই, যে সকল পদার্থেই সর্ব্বদার জন্য তোমার সেই ত্রিভুবনবিজয়ী শ্যামসুন্দর নব-কৈশোর-নটবর মদনমোহনরূপ দর্শন করে তুমি তাহারই নিজসম্পত্তি এবং সে যথার্থই অকপটে বলিতে সক্ষম হয় যে;—

ত্বমেব মাতা চ পিতাত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ প্রভুস্ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণাং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মমদেবদেব ॥

প্রভো! আমিকি তোমাধনে ধনী হইতে পারিব না? আমার এই দুর্জ্জয় আমিত্বভাব, বৃথা জাতি, কুল, ধন জনের অভিমান একেবারে কাড়িয়া লও, আমি নির্ব্বিবাদে তোমাধনে ধনী হইয়া প্রাণেরজ্বালা জুড়াই।

সর্ব্বান্তর্য্যামি! তুমিতো অন্তরের সকল কথা, সকল ব্যথাই জানিতেছ? তোমার তো কিছুই অবিদিত নাই? যদি দয়া করিয়া আমার ব্যথিত প্রাণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া, তোমার অতুলনীয় প্রেম পূর্ণ ভালবাসায় আপন করিয়া লইবে বলিয়া আশা দিয়াছ, তবে একবার ভাল্ করিয়া দেখ যে, তোমার ভালবাসা ভুলিয়া, অনিত্য সংসারের স্ত্রীপুত্র পরিবারের সঙ্গে অলীক আনন্দে মত্ত হইয়া প্রাণ কত কাতর, হৃদয় কত মলিন, কত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। "আমি বুঝি" "আমি করি" ইত্যাকার মিথ্যাভাবে বিমোহিত হইয়া তোমাকে ভুলিয়া যে কত কাল চলিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই, আর কত পরীক্ষা করিবে, নাথ! যখন তোমার অমোঘ আশ্বাসবাণী পাইয়াছি তখন শক্তিদাও যেন আর না তাহা বিস্মৃত হই, যেন প্রত্যেক কার্য্যেই তোমার মহিমা বুঝিয়া আত্মহারা প্রাণে তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া থাকিতে পারি। যা দাও, যা করাও যা ভাবাও সকলই যেন তোমার মঙ্গলময় বিধান বলিয়া অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারি, জগতের ভাল মন্দ কোন বিষয়েতেই যেন অভিমান না আসে, হৃদয়ে যেন আমিত্ব রূপ কুসংস্কারের দাগ না পড়ে, তোমার প্রেমে যেন "আমার আমি" ভুলিয়া 'তোমার" হইয়া থাকিতে পারি। দয়াময়! দীনহীনের আশা পূর্ণ করিয়া দীনবন্ধু নামের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদন কর। আমার মতন দীন ত্রিভুবনে আর কোথাও পাইবে না। দীনবন্ধো! এবার এই দীন হইতেই তুমি কেমন দীনবন্ধু তাহা জানাযাবে।

"কেমন বন্ধু দীনবন্ধু এবার আমাহ'তে জানাযাবে।
(আমায়) দিয়ে ভক্তি ভাব হে ভববান্ধব ভাবনা ঘুচাতে হবে॥
ঘোর অন্ধকারে, এঘোর সংসারে, আর কত দিন ঘুরিতে হবে।
(আমি) অন্ধ যেমন তেমনহ'য়ে আর কতকাল রইব ভবে॥
কত মত খেলা খেলিছ হে কালা তোমার খেলা বুঝাবে কবে।
বল এমনি ক'রে অন্ধকারে আর বা কত জনম যাবে॥
ক্রমে ফুরাইল দিন আসিতেছে দিন যে দিন এদেহ ছাড়িতে হবে।
না শুনিবে বারণ সেকাল শমন কেশেধ'রে আমায় লয়ে যে যাবে॥
আমায় অপরাধীপেয়ে মায়া বেড়ীদিয়ে চোরের মতন রাখ্‌ছভবে।
(বল) কারা মুক্ত চোরের মতন মায়ার বেড়ী খুল্‌বে কবে॥

আমি ঘোর অপরাধী ওহে দয়ানিধি দয়ার বিধি দেখাবে কবে।
(আমার দোষ না গণিয়া প্রেম ভক্তি দিয়া কোলে তুলে কবে বা লবে॥"

শ্রীদীনেশচন্দ্র শর্ম্মা।

নিত্যধামগত

পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন কাব্যতীর্থ

জীবনী-প্রসঙ্গ।

(১২)

—:০:—

(প্রচারক বেশে।)

কলিপাবনাবতার ভগবান, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শ্রীসনাতন গোস্বামীকে উপদেশচ্ছলে সমগ্র জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন :—

জীবেদয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
ইহাবই ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন॥

জীবে দয়ার প্রকৃত অর্থ যে কি, ইহার আদর্শ যে কি তাহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারে যেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল— পূর্ব্বে অন্য কোন অবতারে তেমন হয় নাই। ইহাতে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের কোন রূপ হীনতা প্রদর্শিত হইতেছে তাহা নহে, আর সেরূপ তুলনা করাও মহাপাপ। তবে এইটুকু বলি, শ্রীভগবান যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক অবতারে এক একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল। মানব হৃদয়ের ভাব তারতম্যে, জগতের তন্মাত্রিক অবস্থার অনুসারে যখন যেরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির আবশ্যক হইয়াছিল, তথায় সেইরূপ মূর্ত্তিতে, সেইভাব জাগাইয়া সেই ভাবের অনুকূল তরঙ্গ শ্রীভগবান প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি বেদের সেই "রসো বৈ সঃ" সেই চিন্ময় মূর্ত্তি "রসভাবিতাভিঃ"তো বটেনই অধিকন্তু যে সমাজের মানুষ তাঁহাকে যে ভাবে ভাবিয়াছে, তিনি সেই সমাজে সেই ভাবে ভক্তের হৃদয়ানন্দ-কর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। আর, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবে, তখনই তিনি আবির্ভূত হইবেন একথাও বলিয়াছেন।

ধর্ম্মের গ্লানি কি? সে কথার উত্তর দান করিতে হইলে, অবশ্য বলিতে হইবে কপালে ফোঁটা গায়ে নামাবলী জড়াইলেই ধর্ম্ম হয় না। মানুষ যাহা ধারণ করিয়া আছে বলিয়া তাহার অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। মানুষ কি ধারণ করিয়া আছে? তাহার আলোচনা করিতে গেলে, আত্ম তত্ত্বের কথাই উঠে। মানবের আত্মা যে অবিনাশী, নিত্যবস্তু তাহাতে বৈজ্ঞানিক জগতে কাহারও সন্দেহ নাই। এই নিত্য বস্তুর ধর্ম্ম কি? তৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল।
সেই হেতু মায়া আসি তাহারে গ্রাসিল ॥

জীব নিত্য এবং কৃষ্ণদাস, ইহাই মানবের সহজ ধর্ম্ম। যেমন জলের সহজ ধর্ম্ম শীতলতা; কিন্তু অগ্নি তাপে উহা উত্তপ্ত করিলে উহার সে সহজ স্বভাব নষ্ট হইয়া যায়, এবং উহার নৈসর্গিক স্বভাব প্রকাশ করে বা উহাকে সহজের বিপরীত ভাবে পরিণত অর্থাৎ শীতলের বদলে গরম করে। কিন্তু উত্তাপের কারণ গুলির বিলোপ সাধন করিলে বা পরিবর্ত্তন করিলে, জলের সে নৈসর্গিক ভাব যেমন নষ্ট হইয়া যায়, উহা যেমন পুনরায় সহজ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে, অর্থাৎ শীতল হইতে পারে। মানুষের ও সেইরূপ, যে সহজ ভাব লইয়া আসিয়াছে অর্থাৎ সে যে নিত্য এবং কৃষ্ণদাস সেই ভাবটি, পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক কারণে বিকৃত হইয়া যায়। কিন্তু সে ভগবানের এই ভাব হইলেই, আবার সে সহজ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে।

আনন্দের আধার না হইলে, আনন্দ দিবে কে? কলিতে যখন জীব, একেবারে মায়ার অন্ধকারে আবদ্ধ হইয়া, বিচরণ করিতেছিল তখন মহাপ্রভু, কনক-কান্তি-বিভায় সে তমোহরণ করিয়া, কলির মলিন জীবের দুঃখে বিগলিত হইয়া, রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত, ভুবন মোহন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইলেন। এবার অস্ত্রে শস্ত্রে নয়, ঐশ্বর্য্যে বা ভীতি প্রদর্শনে নয়,—এবার কাঙ্গালের ঠাকুর স্বয়ং কাঙ্গালের বেশে, নেচে নেচে, হেসে হেসে কেঁদে কেঁদে—জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইলেন। জীবের সকল পাপ নিজে যাচিয়া লইয়া, দন্তে তৃণ ধরিয়া তাহাকে নাম লইতে অনুরোধ করিলেন, তাহাকে আনন্দ ধামের পথ দেখাইলেন। আর ভগবান যে কেমন দয়াল, কেমন মধুর, কেমন আপন হইতে

আপন, তাহা জগতের নর নারীর চক্ষে স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়া দিলেন। বেদে তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, পুরাণে তাঁহাকে "চিন্ময় রস ভাবিতাভিঃ" বলিয়া যোগিগণ বর্ণনা করিয়াছেন বটে কিন্তু কলির মলিন জীব মলিন চক্ষে তো আর সেইরূপ দেখিতে পায় না, ধ্যান ধারণার ধৈর্য্য নাই, তাই বলিয়া কি তাহারা ভগবৎ বিমুখী হইয়া ধ্বংসের পথে চলিবে? ভগবানের প্রাণে কি ইহা সহ্য হয়? তাই তিনি স্বয়ং জীবের দ্বারে আবার গৌর মূর্ত্তিতে আসিলেন। মানুষ তাঁহাকে ভুলিয়া আছে, সে তার আত্ম ধর্ম্ম পালন করেনা কিন্তু অন্তর্য্যামী ভগবান যে তাঁকে ভোলেন নাই, তাই তিনি স্বয়ং জীবের দ্বারে আসিয়া দেখা দিলেন। তাহা না হইলে সে অধরাকে ধরে কে?

সুতরাং চিত্তে, মানব চিত্তে, সহজভাব জাগাইবার প্রধান উপায় — "জীবে দয়া নামে রুচি"। আর স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য এই উপদেশ দিয়াছেন, ও আপনি আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, প্রিয় পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুকেও বলিয়াছিলেন—

শুন ভাই নিত্যানন্দ জীব সব হইল অন্ধ
কেহত না লয় হরিনাম;
এক নিবেদন তোরে, নয়নে হেরিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম।
মহাপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ড আর
কেহ যেন পতিত না রয়।

নামের এ মহিমা,—এ শক্তি, কলি-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গের এ অভয় বাণী ভক্ত প্রবর দীনবন্ধুর হৃদয়ে যেন কি এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাই তিনি সমগ্র বঙ্গে, এমন কি সমগ্র ভারতে, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। সমাজের, অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তিনি যে ভাবে, অনুপ্রাণিত হইয়া প্রচারক বেশে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা তদ্রচিত "বৈষ্ণব দর্পণ" গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি অকপট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে নিম্নে সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জীব সুখের কাঙ্গাল। সুখের জন্য দিবা রাত্র ঘুরিতেছে। সুখের আশায় আহার, সুখের আশায় বিহার, সুখের আশায় ধন, জন, বন্ধু, বান্ধব, এমন কি সুখের প্রত্যাশাতেই জীবন ধারণের বাসনা। যতদূর বুঝিয়াছি, এবং সাধুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একান্ত বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি যে, আমাদের জীবনের চিরলক্ষ্য সুখ লাভ, ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। "ধর্ম্মাদ্ধি সুখং" এই শাস্ত্র বাক্য যে অভ্রান্ত সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সুখ পাইব বলিয়া নিত্য সুখের কারণ যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম কি, এবং কিসে ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা অনুসন্ধান করিতে করিতে বহু দিন চলিয়া গিয়াছে, নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রকার লোকের সঙ্গ করিয়া কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সৎউপদেশ পাইয়াছি, আবার অনেক বিষয়ে ঘোরতর সংশয় সঞ্চয় করিয়াছি। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের লক্ষ্য যে পরমানন্দ প্রাপ্তি তাহা এক হইলেও প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি ভেদে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ অনেক রকম প্রকার ভেদ (উপাসনার ও কর্ত্তব্যের বিভিন্নতা) দেখাইয়া গিয়াছেন। নিপুণতার সহিত ঐ সকল মতের বিষয় চিন্তা করিলে সকল মতেরই সামঞ্জস্য বুঝা যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় ধর্ম্ম প্রচারক ও শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাদের ভাব ও ভাষার বিশেষ তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আজকাল অনেকে ধর্ম্ম করিতে গিয়া অধর্ম্ম করিয়া বসেন; সুতরাং প্রার্থনীয় সুখের পরিবর্ত্তে মহা দুঃখ সঞ্চয় করত ধর্ম্মের গ্লানি ও পাপ পথেরই প্রচার দ্বারা নিজেরাও অধঃপতিত হয়, আর অপরকেও অধঃপাতিত করে। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম যাজকদিগের মত ও উপাসনার প্রকার আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে সুখকর ও সহজ সাধ্য মনে করত, বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম জানিবার মানসে সাধ্য মত চেষ্টা করিয়াছি। ঐ চেষ্টার ফলে কখন কখন কোন কোন মহাজনের নিকট আশানুরূপ ভাব ও সৎ শিক্ষা পাইয়াছি। আবার কোন কোন স্থানে বাহ্যিক চাকচিক্য দেখাইয়া আড়ম্বর প্রিয় বহু নর নারীকে বিমুগ্ধকারী বহু বহু সাধককে আসল পথ হারাইয়া কুপথে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি। এমন কি ধর্ম্মের নাম করিয়া, সাধনের অঙ্গ বলিয়া, শাস্ত্র বিরুদ্ধ ঘোরতর নারকীয় ভাবেই আমোদ প্রমোদ করিতে দেখিয়াছি। ঐ সকল ভ্রান্ত মতের অনুসরণ-কারী বহু নর নারীকে দেখিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, সারবত্তা ও পরমার্থ

সাধনের উপকারিতাও অনেকে স্বীকার করিতে চান না। মনের আবেগে তাই আজ শাস্ত্র সঙ্গত বৈষ্ণব কাহাকে বলে ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। জানিনা আশা পূর্ণ হইবে কি না, আর ভাষার দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ভ্রান্ত মত ও কুসংস্কার অপনোদন করিতে পারিব কি না। আশা করি, বৈষ্ণব মহাত্মগণ, আমার এই কার্য্যের সহায় হইবেন, এবং কপটাচারীর কপটতার প্রশ্রয় না দিয়া যাহাতে স্বীয় স্বীয় সমাজের মধ্যে কোনরূপ কপটতা প্রবেশ না করে সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিবেন। আর বিশুদ্ধ বৈষ্ণব মত প্রচারের অনুকূলে যে সকল সত্য ঘটনার প্রচার করিব, তাহা বৈষ্ণব নিন্দা রূপে গ্রহণ না করিয়া কুসংস্কার অপনোদনের অনুকূলেই গ্রহণ করিবেন।

মনের আশা এই যে যেন কেহ ভ্রান্ত মতের অনুসরণ না করেন। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যাহারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচার বিচারে আপাতরম্য ভোগ পিপাসু জনগণের মনোমোহিনী শক্তিতে লোক সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের মতে ও ব্যবহারে কেহ বিমুগ্ধ না হন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই গ্রন্থে দেখাইব যে, কেন্ কোন মহাত্মা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান প্রচারক ছিলেন; এবং তাঁহাদের মত কি, আর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আচরণ ও মত কি, আরও দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, মহাপ্রভুর মতের নিগূঢ় মর্ম্ম না বুঝিয়া যে সকল উপশাখা বাহির হইয়াছে তাহারও মূলে কি সত্য ছিল বা আছে এবং পর পর প্রচারকদের অশিক্ষা অজিতেন্দ্রিয়তা ও অসাবধানতায় আজকাল মূল ছাড়াইয়া কত দূর নিম্ন স্তরে ঐ সকল সম্প্রদায় নিপতিত হইয়াছে। আমি কাহাকেও আমার মত অভ্রান্ত বা এই মতই গ্রহণ করুন, এরূপ অনুরোধ করিনা; তবে সানুনয় নিবেদন এই যে, যথার্থ যাহা ধর্ম্ম, ধর্ম্মের যাহা লক্ষ্য এবং সাধনের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা কিসে লাভ হয়, এবং লক্ষ্য সিদ্ধির আশা থাকিলে কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা একটু বিচার করিয়া সাধক সাধিকাগণ সত্য পথে অগ্রসর হউন। সাধারণ কুসংস্কার এবং আপনাপন গোঁড়ামি ছাড়িয়া যেটি ধর্ম্মের যথার্থ পথ তাহাই আশ্রয় করুন, শান্তি পাইবেন। আমি ব্যথিত হৃদয়ে বলিতেছি যে,—

"ধর্ম্মস্য ফলমিচ্ছন্তি ধর্ম্মং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
পাপস্য ফলং নেচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥"

লোকে ধর্ম্মের ফল ইচ্ছা করে কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান করেনা, পাপের ফল ইচ্ছা করে না কিন্তু যত্ন পূর্ব্বক পাপানুষ্ঠান করে। সুখ আমারা চাই, কিন্তু যে কার্য্যে কখনও সুখ হইবে না বা হইতে পারে না নিরন্তর তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছি। নিজে অনুষ্ঠান করিয়া অশান্তি সাগরে নিমগ্ন হই, আবার আত্ম গোপন রূপ কপট ভাবের আশ্রয় করত শান্তি পিপাসু নর নারীর হৃদয়ে ঘোরতর অশান্তির বীজ রোপন করিয়া দিই। হায়, হায়, এই আত্ম গোপন ও কপটতার জন্যই যে আমাদের ধর্ম্ম সমাজের এত অবনতি তাহাতে সন্দেহ নাই। সহস্র কণ্ঠে সত্যের অনুভূতিতে মুক্ত ও পরম যোগী মহাত্মা পণ্ডিতগণ যে সকল সাধন তত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার অবহেলা করিয়াই এই ঘোর বিপদে নিপতিত। শাস্ত্রের আলোচনা এবং শাস্ত্রানুমোদিত সাধন ভজনের অনুষ্ঠান ব্যতীত আমাদের কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতা দূর হইবার যে অন্য উপায় নাই, তাহা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন।"

* * * * * * *

"শাস্ত্র বিরুদ্ধ মতে চলিয়া নিজ নিজ মত সংস্থাপনেরত কপটাচারিদের নিকট তাহাদের অবলম্বনীয় পথ জানা বড়ই কষ্টকর। কারণ তাহারা বেশ জানে যে, আপন অনুষ্ঠেয় বিষয় ব্যক্ত করিলেই তাহাদের ভুল বাহির হইবে, এবং আপন আপন প্রসার প্রতিপত্তিও নষ্ট হইবে। তাই "আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা।" এবং "গোপয়েন্মাতৃজারবৎ" ইত্যাদি বাক্যে সাধারণকে ভাল মন্দ বিচার করিয়া ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইবার আশায় নিরাশ করে। আমার মনে হয় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসমাজ যদি ঐ ধর্ম্মধ্বজী কপটাচারী কেবল বেশমাত্রধারীদের আদর না করে, সমাজ যদি কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মূর্খের প্রশ্রয় না দেয়, তবে অন্ততঃ উদরান্নের জন্যেও কপটতা পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি লোক সত্য পথে চলিতে চেষ্টা করে। সাধুর পোষাক পরিলেই হিন্দু সমাজে বিশেষতঃ বৈষ্ণব ভক্তের মধ্যে আদর যত্ন ও গ্রাসাচ্ছাদন পাওয়া যায় বলিয়া আজকাল অন্য উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদন জনিত কষ্ট না করিয়া অনেকে ধর্ম্মের ভান বিশেষতঃ বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া ধর্ম্মভীরু হিন্দু ভক্তগণের মধ্যে অনায়াসে অর্থোপার্জ্জন ও নিরাপদে উদর পূরণ করিতে পারিতেছে। এই জন্যই নানাপ্রকার বেশ ভূষা ও নূতন নূতন মতাবলম্বী উপশাখা সৃষ্টি

হইতেছে। যাহারা প্রকৃত সাধু তাহারা ঐ সকল কপটীদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত। আর যাহারা সাধুসঙ্গ করিতে অভিলাষী তাহাদের মধ্যেও অনেকে কপটীর ব্যবহারে সকল সাধককেই কপটী মনে করিয়া প্রকৃত সাধু সঙ্গে বঞ্চিত হন। আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি :— অকপট, জড়, অন্ধ, আতুর, এমন কি পশু পক্ষীদিগকে পোষণ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, ঐ সকল কপটীকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া তাহার শতাংশের একাংশ পুণ্যও সঞ্চয় হয় না। অধিকন্তু ঐরূপ কপটীদিগের প্রশ্রয় দিয়া বহু বহু কপটাচারী বাড়াইয়া অর্থ দাতা অর্থের দ্বারা পাপ ও সমাজের অকল্যাণই সঞ্চয় করেন। পাপী অপেক্ষা কপটী যে অধিকতর হেয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

হে ধর্ম্ম পিপাসু নরনারীগণ! তোমরা সত্য পথ অবলম্বন কর! যাহাতে সমাজের ও নিজের প্রকৃত মঙ্গল হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর! শ্রীভগবানের কৃপায় বুঝিবার ও বিচার করিবার শক্তিসম্পন্ন মনুষ্য জীবন পাইয়াছ; অতএব বিচার করিয়া, পরিণাম চিন্তা করিয়া, সাধু, গুরু ও শাস্ত্র বাক্য মিলন করিয়া অবলম্বনীয় পন্থা স্থির কর; বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত পরের কথায় ভ্রান্তমতের অনুসরণ করিও না। যদি বৈষ্ণব ধর্ম্মই অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির হয়, তবে যাঁহারা শুদ্ধাচারী পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের আচরিত পথাবলম্বী শ্রদ্ধাবান্, বিনীত ও সাধক, তাঁহাদের অনুগত হইয়া পরম কল্যাণকর শান্তিপ্রদ শান্তিময় বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মানব জীবনের স্বার্থকতা কর। ক্ষণভঙ্গুর ভোগাদি সুখের প্রত্যাশায় কপটতার আশ্রয় করিয়া ইহ পরকাল নষ্ট করিও না; কপটতা ও কপটীকে বিষবৎ পরিত্যাগ কর।"

ক্রমশঃ

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

গান।

(১)

—:০:—

এস ওগো বাঞ্ছিত মানসাকাঙ্খিত
লাঞ্ছিত প্রাণে এস প্রাণেশ হে!
কত আশা সঞ্চিত ক'রনা হে বঞ্চিত
কিঞ্চিত কৃপাদানে দীনেশ হে!

শান্তির আশে আসি তব পাশে,
জানিনা বরষিবে কবে কোন্ মাসে ?
তবু তৃষিত প্রাণ তব সকাশে
আকুলে ফিরিছে প্রাণেশ হে !
শান্তি সুখের চির মঙ্গল ধাম
জয় জয় হোক্ সখা তোমার নাম,
(মম) চিত্ত মলিন যেন গায় অবিরাম—
কোথা নাথ কোথা নাথ প্রাণেশ হে !
উথলি উঠুক্ হৃদে তব প্রেম সিন্ধু
উজলি উঠুক তায় তব রূপ ইন্দু,
(কৃপা) বিন্দু লাগিয়া কাঁদে দীন গোপেন্দু
(বলে) দীনবন্ধু কোথা প্রাণেশ হে।

(২)

ওরা দুই দুটা মাতালে আমায় মাতাল করেছে,
আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে ভয় ধরেছে।
আমার মদ খেতেই কোন্ সাধ ?
ওরা জোর ক'রে দেয় মদ খাওয়াইয়ে ঘটায় পরমাদ ;
শেষে গুরুজনার গঞ্জনাতে লজ্জাতে মুখ ঢেকেছে।
ওদের মদের এম্নি গুণ,
ওরে পেয়ালা ছুঁলেই মাতাল করে লাজে ধরায় ঘুণ ;
নইলে বেহায়া বেধারাপানায় মদ খেয়ে সব ঢেলেছে।
কাঙ্গাল গোপেন্দু ভণে
মাতাল কয় কাণে কাণে
আবার ঘর ছেড়ে তার সঙ্গে গেলে গয়না দেবে বলেছে।

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

জ্ঞানের বিকৃতি ।

(সার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী লিখিত ।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।)

—:০:—

ব্রহ্ম স্ত্রী-পুরুষভেদ শূন্য। স্ত্রী-পুরুষভেদ কেবল মায়িক ভ্রান্তিমাত্র, কাজেই অঙ্গনার অঙ্গপিহিত ব্রহ্মও তদ্রূপ। রমণীরত্নও গৈরিকবশন পরিধান করিয় মায়াময় পতি পুত্রাদি প্রপঞ্চ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্ম সাজিলেন। অহো! ব্রহ্ম আর দুই নয় এক ও অভিন্ন তত্ত্ব! ঔপাধিক নারী পুরুষরূপ দৈহিক ভেদ বিদূরিত হইলে উভয়েই এক অদ্বয় জ্ঞানী ও অভেদবাদীর সম্মুখে ভ্রমজনিত দৈহিক প্রভেদ আর কতকাল দাঁড়াইতে পারে? সুতরাং দুইই এক,— একই ব্রহ্ম; দ্বৈতভ্রম কল্পিতভেদ; উহা নিবৃত্ত হইলে আবার সেই একই এক। ব্রহ্ম নির্লেপ বটেন, কিন্তু কোন্ অনির্ব্বচনীয় শক্তি দ্বারা মায়া তাহাকে আবরণ করিয়া ফেলিল, ব্রহ্মেরও তাহা জানিবার আবশ্যক নাই। যে শক্তি-দ্বারা আরম্ভে ব্রহ্ম জীব হইয়াছিলেন সে শক্তি ব্রহ্মভূত জীবকে যে আক্রমণ করিবে না, তাহারই বা প্রবল প্রমাণ কি? অদ্বয় ভাব প্রযুক্ত ব্রহ্মের দেহ, মন, প্রাণ সকলই এক হইয়া উঠিল। পুং ব্রহ্ম ও নারী ব্রহ্ম অভিন্ন হইল। কিন্তু এই ঐক্য দেখিয়া সমাজে কোলাহলের সৃষ্টি হইল। তখন মুক্তিময় আপ্ত বাক্য উদিত হইল:—

চর্ম্মণি চর্ম্ম নিবিষ্টং ব্রহ্মণি কিং লগ্নম্?

ব্রহ্ম নির্লেপ। শরীরের কোনও সম্বন্ধ নাই। নির্লেপ পদ্মপত্রে জল থাকিলেও জল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেহ সম্বন্ধ প্রযুক্ত স্ত্রী পুং ভাব

এবং তজ্জনিত ভ্রান্তিময় ব্যবহারসকল কি প্রকারে ব্রহ্মভূত দেহিগণকে স্পর্শ করিবে? পরব্রহ্মস্বরূপ ভেদশূন্য। স্বপরভেদ মানিলেই অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইতে হয়, তাহাই স্বরূপভেদশূন্যা কোন একটী রমণী এই শ্রেণীর অভেদ বাদিগণের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

ব্রহ্মৈব বস্তু নিখিলং নহি কিঞ্চিদন্যং
তস্মান্ন মে সখি! পরাপরভেদবুদ্ধিঃ।
জারে তথা নিজবরে সদৃশোঽনুরাগো
ব্যর্থং কিমর্থ মসতীতি বিগর্হয়ন্তি।

এই সকল ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মবাদিনীদের ব্রহ্মৈক্য যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন তাহারা প্রয়াগ বা হরিদ্বার, উজ্জয়িনী বা নাসিকের কুম্ভপর্ব্ব সময়ে এবং গৈরিক বসনাবৃত জ্ঞানীদের কোন কোন আখড়ায় যাইয়া নয়ন সফল করুন, দেখিবেন এই উক্তিতে বিন্দুমাত্র অসত্যের লেশ নাই।

নর-নারীর ব্রহ্ম ঐক্যভাব পাঞ্জাব অঞ্চলের জ্ঞাননিষ্ঠ সমাজবিশেষেও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বর্গনিরয়াদি যখন সকলই ভ্রান্তি, তখন জিহ্বোপস্থসঙ্করণের পরিসর সুপ্রশস্ত। সেই জন্য মায়াবাদরাজ্যে কন্দর্পদেব নিজ ব্যাপারের প্রসরণ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারটী পরিশেষে অত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া দেশকে কলঙ্কময় করিয়া তুলিল। সর্ব্ব জাতীয় রমণীরত্ন ও সর্ব্বজাতীয় পুরুষগণের অভেদ ও ঐক্য প্রবৃত্ত হইল। কুলকামিনীগণ অভ্রান্ত ব্রহ্মস্বরূপিণী হইয়া মায়াময় পতিপুত্র বন্ধুবান্ধব বিসর্জ্জন করিয়াও জীবন্মুক্ত হইলেন।

মায়াবাদ সিদ্ধান্ত যে ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বর্গ নরক ও বেদাদি শাস্ত্রকে ভ্রান্তিময় বলিয়া কেবল পরমার্থ দশাতেই জীবন্মুক্তগণের কামিনী সহবাসে পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা নয়; অপিতু ইহা ব্যবহার-দশাতেও পরবনিতাবিনোদনের ভেরী ঘোষণা করিয়াছে। পবিত্র ত্রিবেণী তটে কুম্ভ পর্ব্বোপলক্ষে সামান্য মায়াবাদি-গণের একটী জমাতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণের সংখ্যা অধিক দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভগবন্! এই সকল গৈরিক-বসনাবৃতা যুবতি ও প্রৌঢ়ার কে?" মহান্ত মহোদয় উত্তর করিলেন, "এরা ব্রহ্মবাদিনী অবধূতানী।" পুনর্ব্বার আমি বলিলাম এই সকল রমণী যুবতী। যুবকদের সঙ্গে সঙ্গে দিবানিশি

ইঁহাদের অবস্থান কি আপনি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন? ইহার উত্তর যাহা শুনিলাম তাহা অতি চমৎকার সভ্যসমাজে তাহা প্রকাশ করা বড়ই, কঠিন কিন্তু পাঠকগণের কৌতুহল প্রশমনার্থে ইঙ্গিতে লিখিতেছি। ইহাতে যদি অশ্লীল দোষ হয়, তাহা ক্ষম্য। মহান্ত মহারাজ আমার প্রশ্নের উত্তরে উপেক্ষার হাসি হাসিলেন। তাঁহার ভাব এই যে ব্যভিচার যেন কোন দোষই নয়। লোকে যে ব্যভিচারকে দোষ বলিয়া মনে করে, তাহা অজ্ঞান! জ্ঞানময় সিদ্ধ মহাপুরুষ অজ্ঞানের কথা শুনিয়া হাসিবেন না কেন? তিনি একজন লোককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "উপনিষদ লে আনা" পুস্তকখানি আনাইয়া নিম্নলিখিত প্রকরণটী বাহির করিয়া আমার সম্মুখে রাখিলেন।

"উপমন্ত্রয়তে স হিংকারো, জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্গীথঃ প্রতি স্ত্রী সহ শেতে স প্রতিহারঃ, কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি, তন্নিধনমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্।

স য এবমেতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ বেদ মিথুনী ভবতি, মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্ব মায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্‌ব্রতম্।"

(ছান্দোগ্য উপনিষদ) ২য় প্রপাঠক ১৩ খণ্ড।

ইহার শাঙ্কর ভাষ্য এইরূপ:—

ন কাঞ্চন কাঞ্চিদপি স্ত্রীয়ং স্বাত্মতল্প প্রাপ্তাং ন পরিহরেৎ সমাগমার্থিনীং বামদেব্য সামোপাসনাঙ্গত্বেন বিধানাদেতদন্যত্র প্রতিষেধ স্মৃতয়ঃ। বচনপ্রামাণ্যচ্চধর্ম্মাবগতেঃ ন প্রতিষেধশাস্ত্রেণাস্য বিরোধঃ।

ইহার ভাবার্থ এই—নিজতল্পে সমাগতসমাগমার্থিনী কোন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে না। বামদেব্য সামোপাসনা অঙ্গত্ব বিধান হেতু।

ইহা হইতে অন্যত্র প্রতিষেধ (পরাঙ্গনাগমননিষেধক) স্মৃতি সকলের অধিকার। বচন প্রামাণ্যহেতু (পরা ঙ্গনাগমনের) ধর্ম্মত্ব সিদ্ধ হইলে প্রতিষেধ শাস্ত্রের বিরোধ হয় না।

পরিব্রাজক চূড়ামণি আনন্দগিরি মহাশয় শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদের ভাষ্যকে আরও বিস্তৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্‌যথা:—

কাঞ্চিদপীতি পরাঙ্গনাং নোপগচ্ছেদিতিস্মৃতিবিরোধমাশঙ্ক্যাহ,—বাকদেব্যেতি বিধি নিষেধয়োঃ সামান্য বিষয় বিষয়ত্বেন ব্যবস্থা প্রসিদ্ধেতি ভাবঃ। কিঞ্চ শাস্ত্রপ্রমাণ্যাদত্র ধর্ম্মোবগম্যতে। ন কাঞ্চন পরিহরেদিতি চ শাস্ত্রাবগমত্বাদ-বাচ্যমপি কর্ম্ম ধর্ম্মো ভবিতুমর্হতি তথাচ শ্রোতেহর্থে দুর্ব্বলায়াস্মৃতেন প্রতিস্পর্দ্ধি-তেত্যাহ বচনেতি যথোক্তোপাসনাবতে ব্রহ্মচর্য্য নিয়মাভাবোব্রতত্বেন বিবক্ষিত তন্ন প্রতিষেধশাস্ত্রবিরোধাশঙ্কেতি ভাবঃ। (শঙ্কর ভাষ্যের আনন্দগিরি কৃত টীকা।

অস্যার্থ—কোন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে না, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়, "পরাঙ্গনা গমন করিবে না" এই স্মৃতিশাস্ত্রে পরাঙ্গনাগমনের নিষেধ দেখা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ পরাঙ্গনা গমন কি করিয়া করিবে, এই শঙ্কায় উত্তর করিতেছেন। বিধিনিষেধের ব্যবস্থা সামান্য বিশেষ বিষয় লইয়া হইয়া থাকে। পরাঙ্গনাগমন নিষেধ সামান্য নিষেধ। তাহাতে এই বিশেষ শাস্ত্রোক্ত পরাঙ্গনাগমন বিধানে নিষেধ হইতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র প্রমানহেতু ইহাতে ধর্ম্মই হয়। "ন কাঞ্চন পরিহরেদিতি', (কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না) শাস্ত্রে এইরূপ বিধান পাওয়া যায় বলিয়া এই অবাচ্য কর্ম্ম'ও ধর্ম্ম হইতে পারে। তাহা হইলে এই শ্রুতি (বেদপ্রযুক্ত) পরাঙ্গনাগমনের বিধানের সঙ্গে দুর্ব্বলস্মৃতির প্রতিস্পর্দ্ধিতা হইতে পারে না। যদি বলেন যে, এইভাবে পরাঙ্গনাগমন করিলে ব্যভিচার দোষ না হইতেও পারে, কিন্তু সাধকের ব্রহ্মচর্য্য ভংশ অবশ্য হইবে। তাহাও হইতে পারে না। যথোক্তরূপে উপাসনা ভাবে পরাঙ্গনাবিলাসে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গ হয় না, এই জন্য উহাকে ব্রত বলা হইয়াছে। সেই জন্যই কোন প্রতিষেধ শাস্ত্রের বিরোধ শঙ্কা করিবে না।

কি আশ্চর্য্য! যে সিদ্ধান্তে যে ধর্ম্মে যে সম্প্রদায়ে পরবনিতা বিলাসকে শ্রৌত (বৈদিক) উপাসনাঙ্গ বলিয়া ধর্ম্মের আসনে স্থাপন করা হইয়াছে, সেই সমাজের সেই সম্প্রদায়ের অনুগত লোক যদি এই সমস্ত আচারকে বিশুদ্ধ আচার বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং যে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে একটী অশীতিবর্ষীয়া জরতীর নিকট হইতে তণ্ডুল ভিক্ষা করা অপরাধে ছোট হরিদাসকে গুরুতর অপরাধি-জ্ঞানে জন্মের মত ত্যাগ করা হয়, প্রাণান্তেও তাহাকে ক্ষমা করা হয় নাই, ইঁহারা যদি সেই সম্প্রদায়কে ব্যভিচারদোষে দূষিত বলেন, তাহা হইলে মেধাবী-

গণ হাস্য-সংবরণ করিতে পারেন কি? সুতরাং সহজেই বোধগম্য হয় যে, এইরূপ লেখা কেবল প্রবল ঈর্ষ্যার কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও স্বয়ং কামশাস্ত্রশিক্ষার জন্য অমরক রাজার মৃতদেহে প্রবেশ করেন এবং তাঁহার বনিতার সহিত রতিসুখ সম্ভোগ করেন, যথা— মাধবীয় শঙ্করদিগ্বিজয়েঃ—"অধরদংশং বাহ্বাবাহ্বং মহোৎপলতাড়নং রতিবিনিময়ং" ইত্যাদি কত আদিরসের কথা লিখিত হইয়াছে।

পাঠক! এই ত মায়াবাদ আচার্য্যের ভাষ্য। এইরূপ অপসিদ্ধান্ত সকল আছে বলিয়াই ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে।

মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।

কে বলিতে পারেন যে স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তির দাস জীবগণ উর্দ্ধ লিখিত ভাষ্য শ্রবণ করিয়া পরাঙ্গনাবিলাসী হইবেন না? পরাঙ্গনাবিলাস সর্ব্বনাশের কারণ নয় কি? এই পয়ারটী দেখিয়াই বুঝি, অচ্যুতানন্দ সরস্বতী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলন এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিথ্যা কুৎসা করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উচিত ছিল প্রথম নিজ গৃহে পর্য্যবেক্ষণ করা; তাহা হইলেই তিনি

"আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি"

বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন।

সরস্বতী মহাশয় সন্ন্যাসী, শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতে হইলে সন্ন্যাসি সম্প্রদায়কে প্রশংসা না করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না। কাজেই আমার বন্ধু সন্ন্যাসি সম্প্রদায়ের ও মায়াবাদ সিদ্ধান্তের অতুলনীয় প্রশংসা করিয়াছেন ও উক্ত সম্প্রদায়কে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় তুলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মায়াবাদ সিদ্ধান্ত যে বেদবিরুদ্ধ ও বৌদ্ধ দর্শনের রূপান্তর মাত্র, তাহা যথাক্রমে প্রতিপন্ন করা যাইবে। তদনুগত সন্ন্যাস ধর্ম্মের সামাজিক স্থিতি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সামাজিক স্থিতি।

আমি একজন বৈষ্ণব; আমি যদি সন্ন্যাস ধর্ম্মের বর্ত্তমান স্থিতিকে নিজে লিখি, তাহা হইলে পাঠকগণ অনুমান করিতে পারেন যে, ইহা পক্ষপাতির কথা। কিন্তু আমি

তাহা না করিয়া বঙ্গদেশীয়জনৈক সুলেখকের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে এই বিষয় উপহার দিতেছি ঃ—

"উল্লিখিত দশ প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে অনেকেই কেবল আপন আপন শ্রেণীর নাম মাত্র ধারণ করেন। ধর্ম্মোচিত সাধন ও নিয়মানুষ্ঠান কিছুই করেন না। তাঁহারা নিতান্ত মূর্খ, কেবল তীর্থভ্রমণ ও বিজয়া ধূমপান করিয়া জীবন ক্ষেপন করেন। বেদান্তানুগত তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন ইহাদের আদি ধর্ম্ম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু পরে ইহারা তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

(অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য়ভাগ, ৩১ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি।)

মায়াবাদ সিদ্ধান্তে পরবনিতাবিনোদন যেমন শ্রৌত সিদ্ধান্ত বলিয়া উদ্ঘোষিত করা হইয়াছে, মদ্য, মাংস সেবনের সেরূপ স্পষ্ট বিধান নাই, কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্রে গোপনে তাহারও ব্যবস্থা দেখা যায়।

দণ্ডীরা শুদ্ধাচারী হইলেও তন্ত্রে ইহাদের গুপ্তভাবে মদ্য মাংসাদির ব্যবহার ব্যবস্থা দেখা যায়। তদ্‌যথা—

"পঞ্চতত্ত্বং সদাসেব্যং গুপ্তভাবে জিতেন্দ্রিয়।"

(প্রাণতোষিণী, দণ্ডী প্রকরণ।)

"তুমি জিতেন্দ্রিয়, গোপনে মদ্য মাংসাদি পঞ্চতত্ত্বগ্রহণ করিবে।

ফলতঃ শাক্তদের যেমন "পশ্বাচারী" ও "বীরাচারী" নামে দুই সম্প্রদায় আছে, ইহাদেরও সেইরূপ দুই দল আছে শুনিতে পাই। কোন কোন দণ্ডী অতি সঙ্গোপনে মদ্য মাংসাদি ব্যবহার করেন, অপর কেহ কেহ করেন না।"

(ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ৪৫ পৃষ্ঠা, ১ম পংক্তি।)

সন্ন্যাস ধর্ম্ম যেমন অন্তরঙ্গ সিদ্ধান্তে বৌদ্ধ ধর্ম্মের রূপান্তর, ব্যবহারে তেমনই শৈব ধর্ম্মের রূপান্তর, তদ্বিষয়ে নিম্নে কয়েকটী পংক্তি পাঠ করুন—

"জিজ্ঞাসা করিলে দশনামী অনেকে আপনাদিগকে নির্গুণ উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তাহাদের বিভূতি প্রভৃতি শৈব চিহ্ন ধারণ, শিবালয়ে অবস্থান, নিজ গুরু শঙ্কর স্বামীকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস, অধিকাংশেরই প্রথমে শিবমন্ত্র গ্রহণ, মহিম্নস্তব নামে প্রসিদ্ধ শিবস্তোত্র পাঠ মাত্রে অনেকানেক অশিক্ষিত

সন্ন্যাসীর উপাসনা কার্য্যের পর্য্যাপ্তি, ইত্যাকারের বিবিধ বিষয় তাঁহাদের শিবানুরাগ ও শিবপক্ষীয়তা বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, মহাদেবই সন্ন্যাসীদের দেবতা।" "যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ"।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ২৯ পৃষ্ঠা।

সন্ন্যাস ধর্ম্ম যেমন বাহ্যাড়ম্বরে শৈব ভাবময়, অন্তরে তেমনই শাক্ত ভাবময়।

গুরু যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া শিষ্যকে দণ্ড কমণ্ডলু ও গেরুয়া বস্ত্রের কৌপীন প্রদান করেন ঐ দণ্ডের একস্থান জজ্ঞোপবীত জড়িত একটু গেরুয়া বস্ত্রাবৃত থাকে। ঐ দণ্ড গাছটী দণ্ডীদের পরম পদার্থ। তাঁহারা উহার উপরিভাগে মহাকালীর পূজা করেন ও তথায় মহামায়া বিদ্যমান আছেন, এইরূপ ভাবনা করিয়া থাকেন :—যথা, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগে—

"অদ্যাবধি মহামায়াং দণ্ডোপরি বিভাবয়।
কুরু পূজাং মহাকাল্যা দণ্ডোপরি হৃদা ততঃ ॥
সাক্ষান্নারায়ণ ত্বংহি ধর্ম্মাধর্ম্ম পরোভব।
তব মাতা পিতা স্বামী সর্ব্বং দণ্ডান্তিকে স্থিতম্ ॥

নির্ব্বাণ তন্ত্র।

এতদ্ভিন্ন অনেক সন্ন্যাসী স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করিয়া থাকেন। তাহাও উক্ত গ্রন্থ হইতে সপ্রমাণ করা যাইতেছে, তদ্‌যথা :—

"ইহারা দণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ থাকিলেও স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসার করে ও কৃষিকর্ম্মাদি বিষয় কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহারা পূর্ব্ব লিখিত দশ নামের অন্তর্গত তীর্থ আশ্রমাদি উপাধি ধারণ করে ও মধ্যে মধ্যে দণ্ডকমণ্ডলু গেরুয়াবস্ত্র প্রভৃতি ধারণ করিয়া তীর্থভ্রমণ ও ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বিশেষতঃ কাশী জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোকের বসতি আছে। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের বিবাহাদি চলিয়া থাকে। অপরাপর গৃহস্থ লোকের যেমন স্বগোত্রে বিবাহ করিতে নাই, ইহাদেরও সেইরূপ নিয় মঠের দণ্ডগৃহে পাণিগ্রহণ করা বিধেয় নয়। সারদা মঠের অন্তর্গত তীর্থ ও আশ্রম, শৃঙ্গ গিরি-মঠের ভারতী ও সরস্বতী গৃহে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু আপন

মঠের কোন দণ্ডী কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। দণ্ডী অথচ গৃহী এ কথাটী আপততঃ স্বুবর্ণময় পাষাণ পাত্রের মত অসঙ্গত ও কৌতুকাবহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

সন্ন্যাসী মহোদয়গণের দণ্ডাগ্রভাবে যেরূপ মহামায়া অবস্থান করেন, তদ্রূপ অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীতে মহাবিদ্যা অবস্থিত থাকেন। এইমহাবিদ্যা কে? তাহার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিতে পাওয়া যাইবে :—

"কুলাচারপরায়ণ দণ্ডী ও পরমহংসেরা যেরূপ চক্র করিয়া সুরা পানাদি করেন, তাহার নাম মহাবিদ্যা; কিন্তু সকল দণ্ডী ও পরমহংস এরূপ আচরণ করেন না।"

(ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।)

বৈষ্ণব সম্প্রদায় যেরূপ বেদসিদ্ধ, মায়াবাদ সম্প্রদায় সেরূপ বেদপ্রতিপাদিত নয় তাহার প্রমান এই যে মহাবাদিগণের এই জাতি ও গোত্রাদি বৈদিক গ্রন্থ সকলে দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও শাণ্ডিল্যাদি গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মায়াবাদ সম্প্রদায়ে যে সমস্ত জাতি, বর্ণ, গোত্রাদি ব্যবহৃত হয় তাহা একেবারেঅবৈদিক ইহাও নিম্নস্থ পংক্তি সমূহে সপ্রমান হইতেছে :—

"ইঁহাদের সকলেরই এক জাতি, একধর্ম্ম, এক পরিবার। জাতির নাম— বিহঙ্গম, ধর্ম্মের নাম—রুদ্র, পরিবারের নাম—অনন্ত। "

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।

শ্রীবৈষ্ণবগণের চারিটী সম্প্রদায়, তাহার প্রমাণ পদ্মপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা-বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনাঃ।"

শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্ম সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায় ও সনকাদি সম্প্রদায়, এই চারি সম্প্রদায় অনাদি ও নিত্যসিদ্ধ, কারণ ইহারা মানবকল্পিত নয়,—শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা নিত্য শক্তি। ব্রহ্মা শ্রীভগবদবতার, সৃষ্টিকর্ত্তা জগদ্ধাতা পিতামহ শব্দবাচ্য রুদ্র শ্রীভগবদভিন্নতত্ত্ব নিত্যমুক্ত শুদ্ধবুদ্ধ স্বরূপ, সকলের জ্ঞানোপদেষ্টা। সনকাদি চতুর্ব্যূহ শ্রীভগবদবতার কুমার ব্রতধারী আনন্দময় সর্ব্ব জগতের অভিবন্দ্য।

এই চারিটী শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীভগবান হইতে সাক্ষাৎ সমুদ্ভুত ও শাস্ত্রদ্ধি, ইহাতে মানব বুদ্ধিকল্পনার অনুমাত্র প্রবেশ নাই। কিন্তু মায়াবাদসিদ্ধান্তের চারিটী সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রীভগবান ও শাস্ত্রের সম্বন্ধ গন্ধ নাই। সেই চারিটী কল্পিত নামে অভিহিত, তদযথা ঃ—

১।	শৃঙ্গেরী মঠ	...	ভুবার সম্প্রদায়।
২।	জ্যোষী মঠ	...	আনন্দবার সম্প্রদায়।
৩।	সারদা মঠ	...	কীটবার সম্প্রদায়।
৪।	গোবর্দ্ধন মঠ	...	ভোগবার সম্প্রদায়।

মায়াবাদাশ্রিত সন্ন্যাসিগণ এই চারি সম্প্রদায় ছাড়া হইতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনন৷ কোন একটী আশ্রয় লইতে হইবে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাহারা বেদ ও বেদান্তের দোহাই দিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে অবৈদিক বলিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা একবার নয়ন উন্মিলন করিয়া দেখেন না যে, তাঁহারা যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই সকল সম্প্রদায়ের নাম—না শ্রুতি, না স্মৃতি, না পুরানে,—বিদ্যমান আছে। এই নামসকল শ্রবণ করিলেই বোধগম্য হয় যে, এই সকল কল্পিত। এই চারি সম্প্রদায়ের নামের সঙ্গে ব্রহ্মেরও সম্বন্ধ নাই বিশেষতঃ কোন প্রকারে কষ্টকল্পনা করিয়া যদিও ভুবার এবং আনন্দবার সম্প্রদায়ের নামকে সার্থক বলিতে পারা যায়, কিন্তু এই কীটবার ও ভোগবার যে কি বস্তু, তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া লউন।

শ্রীগৌরাঙ্গের ফুল-সাজ।

(নদীয়া নাগরী-উক্তি)

সখি !

(আজি) ফুল-সাজে সাজাইব গোরা মন চোরা।
(তাই) এনেছি কুসুম ডালি মনোসাধে মোরা॥

গলে দে মালতী মালা,
হাতে দে ফুলের বালা,
কাণে দে কদম্ব ফুল মাথে কৃষ্ণ চূড়া।
সাজা লো ফুলের সাজে নদীয়ার গোরা॥
অশোকের কলি গাঁথি করেছি নুপুর।
তাহাতে বান্ধিয়া দিছি চম্পক ঝুমুর॥
কটি তটে গাঁদা হার,
বাহুতে বকুল তাড়,
পদ্ম পুষ্প পদতলে দাও লো প্রচুর।
সর্ব্ব-অঙ্গ কর তার পুষ্পে ভরপুর॥
সাজাইয়া সিংহাসনে পুষ্প থরে থরে।
বসা লো তাহার মাঝে শচী-দুলালেরে॥
গোলাপ টগর চাঁপা,
তুলি লই হ'তে খোঁপা,
ছুড়িয়া মার লো সখি! গোরা-দেহ পরে।
নদীয়া নাগরে ভজ কুসুমের শরে॥
শত দল পদ্ম দিয়ে সাজা লো চরণ।
যেথানে যা, সাজে দে লো ফুল আভরণ।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া,
ফুল ডালি সাজাইয়া,
গোরার চরণে দে লো করিয়া যতন।
পরাণের ধন গোরা পরম রতন॥
(লেখকের ভক্তি)
(ওগো তোরা) ফুল সাজে গৌর হরি সাজায়েছ ভালা।
(আহা!) কিবা অপরূপ রূপ নয়ন উজলা॥
ওগো নদীয়া নাগরী,
চরণে মিনতি করি,

গোরা বামে বসাইয়া সনাতন বালা।
জুড়াও গো অভাগীর হৃদি-দুখ-জ্বালা॥
যুগলে বসাও আনি গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া।
ভুবন-ভুলান রূপ মন-মোহনিয়া॥
এ যুগল-রূপ হেরি,
বল সবে হরি হরি,
(মোর) চির জীবনের সাধ দাও মিটাইয়া।
(তোদের) চরণ ধরিয়া কাঁদে এ হরিদাসিয়া॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।
ভুপাল।

প্রেমময়ী-চিন্তা।

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপী বল্লভ গোসাঞি লিখিত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সুতরাং ভগবৎ পরায়ণ * ব্যক্তিগণই বুদ্ধিমান ও চতুর, আর যাহাদের ভগবানে বিশ্বাস নাই, ভগবৎ ভক্তি শূন্য তাহারাই গর্দ্দভ তুল্য পশু, সুতরাং তুমি উহাদিগকে গর্দ্দভ বলিতে পার। প্রবাদ আছে—গর্দ্দভ সকল ভার বহন করিতে পারে কিন্তু ভাতের কাঠি বহন করিতে পারেনা। তখন নাকি, শুইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর জীবগণও সংসারের সকল বোঝাই বহিতে সক্ষম কিন্তু ঐ ভাতের কাঠির বেলায় শুইয়া পড়ে। সন্ধ্যাবন্দনা, গুরু পূজা, ও হরিনাম করিতে হইলে তাহাদের কতই যেন আলস্য বোধ হয়। হরি কথা শুনিতে যাইয়া অথবা নামের মালা জপিবার সময় তাহাদের চক্ষে শত বৎসরের নিদ্রা আসিয়া ভর করে। তাহারা ঢুলিতে থাকে। গর্দ্দভের এই বিশেষ গুণটী

* হরি ও কৃষ্ণ শব্দার্থ=সকল সম্প্রদায়ীগণ নিজ নিজ "ইষ্টদেব" অর্থে গ্রহণ করিবেন।

ইহাদের শরীরে বর্ত্তমান, সুতরাং তোমার গর্দ্দভ দর্শন অসম্ভব নহে। ঐ যে তুমি যাহাকে মলিন বস্ত্রের ভার বহণ করিতে দেখিতেছ, সে, হিংসা, নিন্দা কুটী নাটী প্রভৃতি অসৎ বৃত্তি রূপ মলিন বস্ত্রের বোঝা বহিতেছে. উহার নিকট সদ্‌গুণাবলি রূপ শুভ্র বস্ত্রের একান্ত অভাব। আর যাহাকে প্রভুর কষাঘাতে ব্যথিত হইয়া, নবীন দূর্ব্বা ক্ষেত্রের দিকে ছুটিতে ও অবিলম্বে প্রভুর শুষ্ক দূর্ব্বার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, আবার বন্ধন রজ্জু গ্রহণ করিতে দেখিলে, সে জীবটী মায়ার দাস। স্ত্রী, পুত্র ও পরিবার বর্গের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদের দাসত্ব করিতেছে। তাহাদের সেবাই জীবনের সার ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং স্ত্রী পুত্রগণই তাহার প্রভু। প্রখরা স্ত্রী ও অবাধ্য পুত্রগণের তাড়ণ ভর্ৎসনে বেচারীর মনে মধ্যে মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হয় তখন সে প্রাণ জুড়াইবার জন্য একটু একটু হরিনাম করে অথবা যে স্থানে হরি কথা হয় তথায় গমন করে, এই স্থানটীর নামই নবীন দূর্ব্বাক্ষেত্র। কিন্তু পরক্ষণেই প্রেয়সীর প্রণয় বচন,—পুত্রও পরিবারবর্গের প্রিয় সম্ভাষণ রূপ শুষ্ক তৃণের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পুনরায় বন্ধন রজ্জু গ্রহণ করে। আর ঐ যে গর্দ্দভটী বৃদ্ধ পালকের হস্তচ্যুত হইয়া গর্দ্দভীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে এবং তাহার পদাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও পশ্চাদ্ধাবণে ক্ষান্ত হইতেছে না ওটী স্ত্রৈণ পুরুষ স্ত্রী-সর্ব্বস্য জীব। বৃদ্ধ পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। স্ত্রীর মনঃতুষ্টি সাধনের জন্য কত প্রকার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পদাঘাত হইতে বঞ্চিত হইতেছে না। স্ত্রী সেবাই উহার ধর্ম্ম, ভাই! আত্মন যে প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করে না গোবিন্দ সেবার মর্ম্ম সে কি রূপে বুঝিবে? প্রেমময় শ্রী গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও মাতাকে ভুলিতে পারেন নাই, প্রতি বৎসর মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য প্রাণ সম জগদানন্দকে নদীয়ায় পাঠাইতেন এবং পাঠাইবার সময় কত দৈন্য জানাইয়া বলিয়া দিতেন ঃ—

"নদীয়া চলহ পণ্ডিত মাতাকে কহিও নমস্কার।
মোর নামে পাদপদ্ম ধরিও তাঁহার॥
কহিও তাঁহারে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ॥

যেদিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সেদিন আসিয়ে অবশ্য করিয়ে ভোজন॥

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া কৈল নিজ ধর্ম্ম নাশ॥

এই অপরাধ তুমি না লৈহ আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার॥

নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ তোমা নারিব ছাড়িতে॥

চিন্তার এই সকল বাক্য শুনিয়া এবং অদ্ভুত ঘটনা সকল দর্শন করিয়া আমি কান্দিতে কান্দিতে বলিলাম—"চিন্তে! আমি এই সমস্ত পশু হইতেও অধম। তুমি আমার তুল্য পশ্বাধমকে সাবধান করিয়া দিয়া বড়ই উপকার করিলে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে শীঘ্র আমাকে বিশুদ্ধ ও শীতল বায়ুতে লইয়া চল। নচেৎ আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিবে। চিন্তা তাহাই করিল। অবিলম্বে আমরা নানা পুষ্প বিকষিত ভ্রমর গুঞ্জিত, ও মন্দ মলয় সেবিত এক উদ্যানে উপস্থিত হইয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম। শরীর শীতল হইল। প্রাণ জুড়াইল। এমন সময় চিন্তা আমার নিকট ঘনাইয়া আসিয়া কাণে কাণে বলিল—একটু আনন্দ করিবে? যদি কর তবে অতি সুবর্ণা পরমাসুন্দরী দুইটী নর্ত্তকী এখানে আছে, তাঁহাদিগকে আনিয়া আনন্দ করা যায়। আমার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। আমি শঙ্কিত হইয়া বলিলাম—"চিন্তে বল কি? নটী নাচাইয়া আনন্দ করিব? চিন্তা হাসিয়া বলিল "দোষ কি? আমি তখন বলিলাম, বাঃ! বেশ কথা! তুমি এতক্ষণ ধরিয়া কত বিচিত্র ঘটনা দেখাইয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিলে, আর এখন নটী নাচাইতে বলিতেছ! চিন্তা গম্ভীর ভাবে বলিল এ সাধারণ নটী নহে। যদি তুমি ইহাদের নাচাইতে পার, তবে নটবরেরও মন ভুলাইতে পারিবে। আর নাচাইতে হইলে এইরূপ নটীই নাচাইতে হয়। আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলাম এদুটী নর্ত্তকী কে? চিন্তা আমার হৃদয় পটে বড় বড় বর্ণে অঙ্কিত করিয়া দিল—"কৃষ্ণ"! আমি দেখিলাম বর্ণ দু'টী সু-ই বটে। যে বর্ণ গুলি

ভগবানের বিকাশক তাহা সুবর্ণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমি সেই সুবর্ণা নর্ত্তকী দ্বয়ের রূপে মুগ্ধ হইয়া চিন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ নর্ত্তকী নাচাইব কোথায়? চিন্তা বলিল—কেন? রসনায়। জিহ্বার তুল্য উৎকৃষ্ট আধার আর কোথায় পাইবে? বিশেষতঃ নর্ত্তকী দুইটী রসিকা। সরস স্থান না পাইলে ইহারা সুরসে নাচিতে চাহেনা। আমি বলিলাম তবে আইস নাচাই। হঠাৎ আমার জিহ্বা কম্পিত করিয়া নটী দুইটী নাচিয়া উঠিল এবং ঘন ঘন নৃত্য করিতে লাগিল। আমি তাহাদের নিত্য দর্শনে পুলকিত হইলাম, আমার নয়ন প্রান্তে অশ্রু দেখা দিল এবং ক্রমে তাহাদের হাব ভাবে মুগ্ধ হইয়া আমি আত্ম হারা হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চিন্তা আমাকে জাগাইয়া দিল। জাগিয়া দেখি নর্ত্তকীদ্বয় আসর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি ক্ষুন্ন হইলাম। চিন্তা বলিল আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, চল এই উদ্যান হইতে অমৃত ফলের একটী বীজ লইয়া যাই। আমি বলিলাম কি রূপ বীজ? চিন্তা দেখাইল—"কৃষ্ণ"। আমি দেখিলাম বীজই বটে, তবে সাধারণ বীজ নহে, বীজস্বরূপের বীজ। বীজের মধ্যে যেমন দুইটী অংশ থাকে এই কৃষ্ণ বীজেও তদ্রূপ "কৃ" ও "ষ্ণ" এই দুইটী অংশ রহিয়াছে। আমি বলিলাম চিন্তে! রোপণ করিব কোথায়? বিশেষতঃ রোপণ করিতে হইলে গর্ত্তের প্রয়োজন, তাহা পরিশ্রম সাপেক্ষ, সুতরাং আমার তুল্য দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে এ বীজ রোপণ করা অসম্ভব। চিন্তা বলিল, এ বীজ রোপণ করিতে কোনরূপ পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না। কর্ণ বিবর রূপ গর্ত্ত রহিয়াছে উচ্চৈস্বরে নাম করিলেই কর্ণে প্রবেশ করিবে সুতরাং তুমি অনায়াসেই রোপণ করিতে পার। আর যদি ইহাতেও কষ্ট বোধ হয় তবে ভক্তোদ্যানে গমন করিও। ভক্তগণ এই বীজের মালী। এই বীজ রোপণের নিয়ম তাঁহারা সুন্দর রূপে পরিজ্ঞাত আছেন। তুমি তথায় যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই তাঁহারা তোমার কর্ণ বিবরে এই নাম রূপ বীজ রোপণ করিয়া দিবেন। আমি বলিলাম এই অনুর্ব্বর ভূমিতে রোপিত হইলে বীজ বাচিবে কি রূপে? চিন্তা বলিল, ইহাতে শ্রবণ ও কীর্ত্তন রূপ জল সিঞ্চন করিতে হইবে। তাহাতে বৃক্ষটী ক্রমে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া, অচিরে প্রেমরূপ ফলে সুশোভিত হইবে। তখন তুমি সেই ফলটী লইয়া উত্তম করিয়া বিনাইয়া প্রণয় থালায় রাখিবে, এবং তোমার প্রেমাস্পদকে হৃদয় সিংহাসনে

বসাইয়া বলিবে, হে প্রেমস্বরূপ! আমার নতন গাছে এই প্রেমফলটী ধরিয়াছে, তুমি প্রেম ভাল বাস, তাই তোমার জন্ত বড় যত্ন করিয়া আনিয়াছি, এই ধর, গ্রহণ কর, তিনি তোমার প্রেমামৃত ফলের স্বাদ লইয়া তোমার জন্য প্রসাদ রাখিয়া যাইবেন তখন তুমি মনে করিবে—"এতদিনে ভগবৎ প্রসাদ লাভ করিয়াছি"। আমি বলিলাম চিন্তে! এমন ভাগ্য কি আমার হইবে? চিন্তা বলিল তাঁহার জন্য লৌল্য অর্থাৎ তীব লালসা ও তাঁহার চরণে ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ থাকিলেই ঈদৃশ সৌভাগ্যের উদয় হয়। অদ্য রাত্রি অনেক হইয়াছে, আমি চলিলাম., এই বলিয়া চিন্তা অন্তর্দ্ধান হইল। আমি তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইলাম, জাগিয়া দেখি রাত্রি ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন মাথার উপর মেঘ কড়্ কড়্ শব্দ করিতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুত ঝলসিতেছে আমি ত ড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে ছুটিলাম' নানা দুশ্চিন্তা মনে উদয় হইতে লাগিল। সুবিধা বুঝিয়া মন, নানা অভাবের অভিযোগ আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রথমেই স্মরণ হইল "গৃহে তণ্ডুল নাস্তি"। এই সকল কারণে আমার সরস প্রাণ আবার নীরস হইয়া গেল। আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম—

হায়, হায়" কোথায় আমার প্রেমময়ী চিন্তা" ;

শ্রীগুরু-তত্ত্ব।

-:০:—

আদিত্য মণ্ডলে গুরু অনাদি কেবল।
জ্ঞান গুরু ধ্যান গুরু গুরুই সম্বল॥
হিমাংশু মণ্ডলে গুরু অমৃত সাগর।
সহস্র কমল দলে গুরু রূপ ধর॥
ক্ষিতি তত্ত্বে গুরু ক্ষিতি মূলাধারে স্থান
অপ্ তত্ত্বে গুরু অপ্ যথা সাধিষ্ঠান॥
তেজ তত্ত্বে গুরু তেজ কালের স্বরূপ।
স্থান মনিপুরে হের সে অপূর্ব্বরূপ॥

অনাহতে গুরু মম মরুত সঞ্চার।
গুরু গুরু গুরু ধ্বনি শুনি অনিবার॥

ব্যোম তত্ত্বে গুরু ব্যোম বিশুদ্ধ মাঝার।
ষোল কলা পূর্ণতার বুঝে সাধ্যকার॥

দ্বিদলে অভিন্ন মূর্ত্তি যথা শিবালয়।
সেথা প্রবেশিলে জীবের ঘুচয়ে সংশয়॥

চন্দ্র সূর্য্যের মিলন স্থান যেই সহস্রারে।
কোটী আদিত্য প্রভা তার নয়নেতে ধরে॥

এক ব্রহ্ম নাস্তি দুই গুরু যে আমার।
কে আছে বৃহদ্ বস্তু গুরু বিনা আর॥

গুরু মন্ত্র গুরু তন্ত্র সিদ্ধি বা সাধন।
গুরু বিনা সার কিবা ধর শ্রীচরণ॥

জপ গুরু যোগ গুরু গুরু প্রাণায়াম।
তরিবারে চাহ যদি চল গুরু ধাম॥

অষ্ট সিদ্ধি দাতা গুরু জননী জনক।
এ ভব সংসারে সার গুরুই একক॥

জীব অন্ধ হাতে ধ'রে কে লইতে পারে।
বন্ধুরূপী গুরু যদি নাহি কৃপা করে॥

অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জীব জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে।
তৃতীয় নয়ন কেবা দিবে হে খুলিয়ে॥

মহা শক্তি সঞ্চারিয়া দেহের মাঝারে।
অখণ্ড মণ্ডলে কেবা দেখাইতে পারে॥

ক্ষমি সব অপরাধ টানি কোল পানে।
কে আর করিবে রক্ষা ভয় ভীত জনে॥

ত্যজ অভিমান ভাই চল ব্রহ্ম পথে।
সম্মুখে পশ্চাতে গুরু হেরিবে সাক্ষাতে॥

অলস অবস হয়ে কাটাওনা কাল।
অসতর্ক হ'লে ভাই ঘেরিবে জঞ্জাল॥
আছে সঙ্গে ছয় জন পাপ পথে টানে।
অবিশ্বাস, সন্দেহ, ত্যজ সযতনে॥
নিশ্বাসে নিশ্বাসে কর গুরুরে স্মরণ।
যদি লভিবারে সাধ থাকে সে চরণ॥

শ্রীসচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্মময়ী।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ

শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভুর

মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।

বড়ডাঙ্গা মহোৎসবোপলক্ষে রচিত।

(১)

নরহরি আহা মরি কি মধুর নাম।
সুখ শান্তি, দয়া প্রীতি ভক্তি প্রেম ধাম।
নররূপে নরহরি, ভক্তবেশে অবতরি
জগ মাঝে গৌর প্রেম করিলে প্রচার।
নীরবে নিষ্ঠার সহ করিয়া আচার॥

(২)

সুপবিত্র লীলাক্ষেত্র এই ধরা ধামে।
মাঝে মাঝে লীলাময় ভূভার হরণে
যবে যথা জগৎস্বামী, সর্ব্ব জীব শুভকামী
পারিষদ সহ আসি হয়েন উদয়।
তবে তথা তুমি তাঁর প্রধান সহায়॥

(৩)

[illegible] বৃন্দাবন মাঝে গোলক বিহারী
রাধাসনে বৃন্দাবনে শ্রীরাস বিহারী
তবে তুমি মধুমতি, শ্রীরাধার প্রাণ সখী
দূতি সখি দাসী আদি আবশ্যক মতে।
তুষিয়াছ গোপীনাথে কে পারে বর্ণিতে॥

(৪)

পুন যবে গোলক বিহারী নবদ্বীপে
সপার্ষদে অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে।
তবে তুমি নরহরি প্রেম ধনে অধিকারী
অনর্পিত গৌর প্রেম করি বিতরণ।
কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধ সবাকার মন॥

(৫)

নরহরি মধুমতি নামের মাহাত্ম্য
সগৌরবে প্রকাশিতে স্বয়ং শচীসুত
সপার্ষদে আচম্বিতে, খণ্ডে আসি মধু পিতে
মধু পুকুরেরজল প্রভাবে তোমার।
মধুবলি পিয়ে দেয় আনন্দে সাঁতার॥

(৬)

শ্রীগৌরাঙ্গে মন প্রাণ করি সমর্পণ।
শিখায়েছ জীবগণে আত্ম-সমর্পণ।
গৌর তব প্রেম ডোরে, বাঁধা আছে অকাতরে
ভক্তাধীন ভকতের গৌরব বর্দ্ধনে।
নরহরি শ্রীচৈতন্য হইল আখ্যানে॥

(৭)

গৌর ভক্ত শিরোমণি হৃদয় রতন
তুমি মাত্র চিনে ছিলে শ্রীশচীনন্দন

অন্তে আন পরসঙ্গ,　　　তব শুধু শ্রীগৌরাঙ্গ
অদ্যাপি তোমার যত খণ্ডবাসী গণ।
গৌর বিনা "কৃষ্ণ" 'হরি" বলেনা কখন॥

(৮)

কি তাঁদের গৌর ভক্তি সরলতা ময়
আবাল বৃদ্ধ বনিতা গৌর গৌর কয়
কি মধুর গৌর বলা　　　শুনিয়ে মন উথলা
গৌরাঙ্গের চির প্রিয় খণ্ড বাসীগণ।
চির প্রেম পাশে বদ্ধ শ্রীশচীনন্দন॥

(৯)

সুধন্য শ্রীখণ্ড গ্রাম অবনী মাঝারে।
নরহরি অবতীর্ণ যে শ্রীখণ্ড পুরে
গৌরাঙ্গের ক্রীড়াভূমি,　　　ভক্তি প্রেম রত্ন খনি,
দীন আমি বর্ণিবারে মহিমা তাহার।
কত দিনে লুণ্ঠিত হইব অনিবার॥

(১০)

মার্গশীর্ষে কৃষ্ণ পক্ষ একাদশী দিনে
শ্রীবিগ্রহ সমক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনে।
বসি যোগাসনে তুমি,　　　ওহে সর্ব্বশুভকামী
অকস্মাৎ অদর্শন হ'লে নরহরি।
ভক্তগণ শোকাচ্ছন্ন সেইদিন স্মরি॥

(১১)

অদ্যাপিও শ্রীখণ্ডে সেই একাদশী দিনে
মহা মহোৎসবে মত্ত গৌর ভক্তগণে।
শ্রীগৌরাঙ্গ গুণগানে　　　সুমধুর সংকীর্ত্তনে
প্রেমিক বৈষ্ণবগণ ভাবে নিমগন
অবিরল ধারে করে অশ্রু বরিষণ

(১২)

হে প্রেমিক শিরোমণি প্রভু নরহরি
তোমার মহিমা আমি কি বর্ণিতে পারি
তোমার মহিমারাশি, জানে শুধু খণ্ডবাসী
অথবা তাহারা যানে অনুগ্রহ করি।
জানাইয়া দাও যারে মহিমা তোমারি॥

(১৩)

তবাগ্রজ মুকুন্দ প্রেমিক চূড়ামণি
সভামধ্যে দেখি শিখি পুচ্ছের আড়ানি
প্রেমে গর গর চিত, হইলেন মুরছিত
নিরন্তর কৃষ্ণ চিন্তা যাঁহার অন্তরে।
অল্পে উদ্দীপন তাঁর সবে কৃষ্ণ স্ফুরে॥

(১৪)

তব প্রিয় ভ্রাত পুত্র শ্রীরঘুনন্দন
গৌরাঙ্গের প্রিয়তম মানস নন্দন
তাঁর প্রেম ভক্তি জোরে, গোপী নাথ নিজকরে
বিগ্রহ হইয়া নাড়ু করেন ভক্ষণ।
নাড়ু করে মনোহরে হেরে সর্ব্বজনে

(১৫)

মহা মহা কবি যথা রূপ সনাতন
কবি কর্ণপুর আদি করি অগণন
তোমার মহিমা রাশি, বর্ণিয়াছে রাশি রাশি
ক্ষুদ্র কীটাধম মম বাসনা বর্ণনে।
ক্ষমি অপরাধ স্থান দেহ শ্রীচরণে॥

(১৬)

দয়ার সাগর প্রভু অনাথশরণ।
দয়াময় দীনবন্ধু দারিদ্র ভঞ্জন।
নরহরি শ্রীচৈতন্য হেরি যেন হই ধন্য
স্বধর্ম্মে সুমতি যেন রহে সর্ব্বক্ষণে॥
অন্তে পদ প্রান্তে রেখো শ্রীরাধারমণে॥

দীন—শ্রীরাধারমণ দাস গুপ্ত।

শ্রীল বংশীবদন ঠাকুর।

পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস গোস্বামী লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:o:—

বংশীবদন প্রভুর আজ্ঞায় নবদ্বীপে বাস করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহ ত্যাগ বৃত্তান্ত সকলি জানিতেন। তাঁহার স্বরচিত পদে প্রভুর সন্ন্যাস কাহিনী অতি করুণ ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয় ও বিগলিত হয়।

প্রভুর প্রস্থান কথা শ্রীবংশীবদন।
নিজ কৃত পদে এই করিলা লিখন॥

সেই মধুর করুণ রসাত্মক পদটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শয়ন মন্দিরে, গৌরাঙ্গ সুন্দর, উঠিলা রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস, ঘুচাব এ সব বেশে॥
এ হেন ভাবিয়া, মন্দির ত্যজিয়া, আইলা জাহ্নবী তীরে।
দুই কর যুড়ি, নমস্কার করি, পরশ করিলা নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি, কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা, গমন, শ্রীশচীনন্দন, চড়ি নিজ মনোরথে॥
প্রভুর গমন, করিলে শ্রবণ, পাষাণ গলিয়া যায়।
পশু পাখী কত কাঁদে অবিরত, বংশী করে হায় হায়॥

বংশীবদন শচী বিষ্ণু প্রিয়ার দুঃখে বড় কাতর হইলেন প্রভু তাঁহার উপর জননী ও ঘরণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছেন, একথা মনে করিয়া তাঁহার দুঃখ সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে শচী বিষ্ণু প্রিয়ার রোদন দেখিয়া বংশীবদন ধুলায় পড়িয়া আছাড়িয়া আছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শাশুড়ী বধূর তথা, দেখিয়া রোদন।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যান শ্রীবদন॥

বংশী শিক্ষা গ্রন্থকার শ্রীল প্রেমদাস লিখিয়া গিয়াছেন :—

এ কথা নহে মোর স্ববুদ্ধি রচিত।
প্রভুর নিজের পদে হইনু বিদিত॥

সে মধুর পদটী এই :—

আর না হেরিব, প্রসর কপালে, অলকা তিলকা সাজ।
আর না হেরিব, সোনার কমলে, নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিব, শ্রীবাস মন্দিরে, ভকত চাতক লঞা।
আর না নাচিব, আপনার ঘরে, আর না দেখিব চাঞা॥
আর কি দুভাই, নিমাই নিতাই, নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই করিয়া, ফুকারি সদাই, নিমাই কোথাও নাই॥
নির্দ্দয় কেশব, ভারতী আসিয়া, মাথায় পড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর, না হেরি কেমনে, রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধুর, রোদন শুনিতে, বংশী গড়াগড়ি যায়॥

বংশীবদন ঠাকুরের পদাবলী অতীব মধুর। তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় তাঁহার পদাবলীতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত পদাবলী একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

"বংশী বদনের পদ নিকুঞ্জ বিহার।
বৈষ্ণব গণের হয় কণ্ঠ মণি হার॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যখন সন্ন্যাসের পাঁচ বৎসর পরে জননী জন্মভূমি দেখিতে কুলিয়া নগরে আসিলেন, বংশীবদন তখন প্রভুর পাদ মূলে পড়িয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভুর বিহনে শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার যে কি দশা হইয়াছে, তাহা সকলি তাঁহাকে কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন। আরও বলিলেন যে তিনি আর নদীয়ায় থাকিতে পারিতেছেন না।

"ওহে প্রভু আর নাহি রব নদীয়ায়।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বংশীবদনকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া প্রবোধ বাক্যে তুষ্ট করিলেন এবং তাঁহাকে সংসার আশ্রমে থাকিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করিতে পুনরায় আদেশ করিলেন।

ক্রমশঃ।

১২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। মাঘ, ১৩২০।

ভক্তি।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

ভক্তির্ভগবত সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

"ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল" কর্ত্তৃক পরিদর্শিত।

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভক্তি কার্য্যালয়,
ভাগবতাশ্রম, কোঁড়ার বাগান, হাওড়া
হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হাওড়া
ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টীং ওয়ার্কস্
হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা। প্রতি খণ্ড ৵০ দুই আনা।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
প্রার্থনা	শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৪৫
বংশীবদন	শ্রীহরিদাস গোস্বামী।	১৪৭
কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ	শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫২
কমলপীঠে শ্রীযুগল বিগ্রহ	শ্রীকালীহর ভক্তিসাগর	১৫৮
ভক্তিপ্রবন্ধ	শ্রীজানকীনাথ ভাগবতভূষণ	১৬৪
খুনী-মামলা	শ্রীভূপতিচরণ বসু	১৭২

মাত্র তিন মাসের জন্য,

ভক্তির গ্রাহকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ।

আগামী ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে যিনি ১৲ টাকা জমা দিয়া ভক্তির বর্ত্তমান ১২শ বর্ষের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তিনি বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত ভক্তিতো পাইবেনই অধিকন্তু নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী বিশেষ সুলভ মূল্যে পাইবেন। মনে রাখিবেন মাত্র তিন মাসের জন্য।

পুস্তকের নাম।	সাধারণ মূল্য।	গ্রাহকের পক্ষে।
প্রীতি (ধর্ম্মভাবোদ্দীপক গীতি কাব্য)	।৴০	।০
অমিয়া বিন্দু	॥০	।৴০
শ্রীচৈতন্য চরিত	৶০	৵০
অবধুত নিত্যানন্দ	৶০	৴১০
হরিবোল (গীতপঞ্চবিংশতি উপহার সহ)	১৲	॥০
বৈষ্ণবদর্পণ (১ম ও ২য় ভাগ একত্রে)	১৲	৸০
দম্পতীদর্পণ	।৴০	।০
৩য় বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষের ভক্তি একত্রে পৃথক ভাবে বান্ধান	৯৲	৭৲
প্রতি বর্ষ	১৲	৸৴০
দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি	৵০	৴০

প্রত্যেক পুস্তকের ডাক মাশুল পৃথক একত্রে সমস্ত গুলি লইলে ডাঃ মাঃ অর্দ্ধেক লাগে। অধিক সংখ্যক বিক্রয় কারিকে কমিশনও দেওয়া হয়।

ঠিকানা—

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভাগবতাশ্রম, ভক্তি কার্য্যলয়, কোঁড়ার বাগান,

হাওড়া।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি ।

ভক্তি ।

১২শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাঘ । সন ১৩২০ সাল ।

প্রার্থনা ।

ঃ০ঃ —

অখিল ভুবন বন্ধো। প্রেমসিন্ধো জনেহস্মিন্
সকল কপট পূর্ণে জ্ঞানহীনে প্রপন্নে।
তব চরণ সরোজে দেহি দাস্যং প্রভো ত্বং
পতিত তারণ নাম প্রাদুরাসীদ্ যতস্তে ॥

হে অখিল-ভুবন-পতি প্রেমময় শ্রীগৌরহরি ! তুমি নিজগুণে দয়া করিয়া আমার হৃদয়ের কুৎসিৎ কপট ভাব সকল দূর করিয়া দিয়া তোমার সেবক রূপে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। আমি তোমার ঐ রাতুল চরণ সরোজের সেবাধিকার পাইয়া তোমার পতিত-উদ্ধারণ নামের জয় ঘোষণা করি। দয়াময় ! আমি নিতান্তই ভাব, ভক্তি হীন তুমি নিজগুণে আমাকে দয়া কর।

প্রভো ! তুমি মঙ্গলময়, জীবগণ যাহাতে সতত সুখশান্তি লাভ করিয়া প্রাণের যথার্থ বেদনা ভুলিতে পারে, তাহার জন্য তুমি নানা প্রকারে কৃপা করিতেছ। কিন্তু মোহান্ধ জীব তোমার এই অনন্ত লীলাময় ভাব না বুঝিয়া, তোমাকে ভালবাসিতে বা সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভর করিতে না পারিয়াই দিবানিশি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। দয়াময় ! তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাব যে একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে তাহারতো আর কোনই অভাব থাকেনা সেতো আনন্দ ভরে তখন জোর করিয়া বলিতে থাকে—

"নাথ তুমি একজন হৃদয়ের ধন দীনবন্ধু দয়াল হরি।
(তাই) আমি মনপ্রাণ সব তোমায় দিয়ে হইলাম তোমারি॥"

প্রভো! তোমার জগত, তোমার, জীব তোমার সংসার, তুমিই শ্রষ্টা, তুমিই রক্ষা কর্তা। জাগতীক প্রপঞ্চে অভিভূত হইয়া মূর্খ মায়াক্লীষ্ট জীব বুঝিতে না পারিয়াই যাহা করণীয় নয় তাহা করে, যাহা ভাবিবার নয় তাহা ভাবে এবং যাহা পাইবার নয় তাহা পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। তুমি দয়াময়, তোমায় দয়ার তো সঙ্কোচ নাই। জীবের দুঃখে কাতর হইয়া তুমি যে কত রকম ভাবে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছ সামান্য চিন্তা দ্বারাই তোমার সেই অতুলনীয় অসীম দয়ার পরিচয় পাইতে পারি, কিন্তু কেমন দুর্দ্দৈব—কেমন মোহ যে, তোমায় সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাব, তোমার কৌশল কিছুই বুঝি না বা বুঝিতে চেষ্টাও করি না। অভিমানে মত্ত হইয়া তুমি যে জীবনের জীবন একমাত্র প্রাণ-বল্লভ তাহা বুঝি না, তাই পদে পদে বিপন্ন হইয়া হাহুতাশ করিতে থাকি, নিজ নিজ কর্তৃত্বে যখন যেটী অতি সহজ ভাবিয়া করিতে যাই তখনই সেটী অতিশয় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, আর যেটী কষ্ট সাধ্য বলিয়া হতাশ প্রাণে ত্যাগ করি তোমায় কৃপা শক্তি নানাভাবে নানা মূর্ত্তিতে আসিয়া সেটী অতিশয় সহজ করিয়া আমাদের উপর যে তোমার অসীম ভালবাসা তাহার পরিচয় দেয়। প্রতিমুহূর্ত্তে এমন কত শত ঘটনা যে ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্বা নাই। হায়! হায়! তথাপিও তোমাতে অকপট বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না।

দয়াময়! জীবনে যাহা হইবার নয় বলিয়া ধারণা ছিল ক্রমে তাহাও হইয়া গেল কেবল গেল না আমার দুর্জ্জয় অভিমান, অভিমানে উন্নত গ্রীব হইয়া রহিলাম, তোমার অভয় পদে একবারও মস্তক নত করিলাম না। দিনে দিনে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিও শেষ হইতে চলিল কিন্তু এমন দুর্ল্লভ জীবনের কর্ত্তব্য তো কিছুই করিলাম না, কেবল পশুর মত আহার বিহার লইয়াই মত্ত রহিলাম। প্রেমময়! আর কতকাল এমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথায় কাটিবে। ভাবনেত্র প্রদান করিয়া তোমার জগত ভরা ভাব দেখাইয়া বুঝাইয়া ভাবে মত্ত করিয়া রাখ; আর আমি অভাবের যাতনা সহিতে পারি না। তোমার ভাবে, তোমার প্রেমে বিভোর হইয়া তোমার মঙ্গলময় নামের সুমধুর ধ্বনিতে সকল অভাব, সকল অমঙ্গল দূর করিব, দয়াময়! দয়া কর।

"ওহে দীনবন্ধু　　　করুণার সিন্ধু
দীন জনে তার তার হে॥
পতিত পাবন　　　পতিত এ জন
কৃপা কর কৃপা কর হে॥

বারে বারে কত আনিবে সংসারে,
বারে বারে কত কাঁদাবে আমারে,
ক্লান্ত দেহ মন　　　শোকে নিমগন
ত্রিতাপেতাপিত অন্তর হে॥

ওহে গিরিধারী! দুঃখ ভার ধর
সহিবারে নাথ! পারিনাকো আর
(ভবে) আসা যাওয় মোরা　　　নিবারণ কর
(আর) সহিতে না পারি বিরহ হে॥"

শ্রীদীনেশচন্দ্র শর্ম্মা।

বংশীবদন।

(পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস গোস্বামী লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

——:০:——

মন্দ বুদ্ধি দেখি প্রভু গৌরাঙ্গ আমারে।
অনুমতি করিলেন রহিতে সংসারে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ছাড়িয়া পুনরায় নীলাচলে যাইলেন। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিলেন। জননীকে দর্শন করিতেই তিনি আসিয়াছিলেন। বংশীবদনের একান্ত অনুরোধে প্রভু শ্রীমতীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেও দর্শন দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বংশীবদন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শচীদেবীর দ্বারে দণ্ডায়মান করাইয়াছিলেন এবং এই সময়েই প্রভু নিজ

কাষ্ঠ পাদুকা শ্রীমতীকে দান করিয়াছিলেন এবং নিজ দারু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া নবদ্বীপে স্থাপনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। পরে বংশীবদন ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এই দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে স্বপ্নাদেশও দিয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিব। প্রভুর শ্রীমতীকে কাষ্ঠ পাদুকা দান বিষয়ে শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব দীপিকা গ্রন্থে প্রমাণ আছে যথা :—

মৎ পাদুকে গৃহিত্বাথ গৃহিণী চাহিতে গৃহং।
স্বর্ণাম্বিকে ইমে পূজ্যে সদা শুদ্ধে শুচিস্মিতে ॥
প্রতিষ্ঠাপ্য চ মে মূর্ত্তিং সদা পূজ্যাত্বয়ানঘে।
মন্মুদং লপ্স্যসে ভদ্রে কুলৈঃ সার্দ্ধং মুদাবহে ॥

বংশীবদন ঈশানের সহিত মিলিত হইয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবা করিতে লাগিলেন। প্রভুর আজ্ঞা তিনি কিরূপে অবহেলা করিবেন? প্রভুর বিরহে বংশীবদন জীবন্মৃত হইয়া আছেন। সংসারে থাকেন মাত্র। তিনি গৃহী হইয়াও উদাসীন। তাঁহার মন প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে পড়িয়া আছে. দেহখানি মাত্র নবদ্বীপে আছে। সকলেই নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করেন বংশীবদন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবা ফেলিয়া কি করিয়া যাইবেন? প্রভুর আজ্ঞা বলবান।

"আজ্ঞা বলবান এই বেদের বিধান"

এইরূপে বংশীবদনের জীবনের প্রথম অংশ অতিবাহিত হইল। বংশীবদনের পুত্র শ্রীচৈতন্য পিতার ন্যায় পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছু জানিতেন না, তাঁহার অন্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা সদাসর্ব্বদা স্ফূরিত হইত।

শ্রীবংশী বদনানন্দ পুত্র শ্রীচৈতন্য।
পরম উদার তিঁহ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ॥
চৈতন্য গোসাঞি বিনা নাহি জানে আর।
সদাই চৈতন্য লীলা অন্তরে যাঁহার ॥

বংশীবদন পুত্র বধূ লইয়া সুখে সংসার করেন। তাঁহার পত্নী মূর্ত্তিমতী ভক্তি। তিনি শচী দেবীর নিকট সর্ব্বদা থাকেন। তাঁহার সেবা করিয়া কৃতার্থ

হয়। বংশীবদনের দুই পুত্র। এক জনের নাম চৈতন্য, অপরের নাম নিতাই। চৈতন্য জ্যেষ্ঠ, নিতাই কনিষ্ঠ, উভয়েই পরম গৌর-ভক্ত চূড়ামণি।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অপ্রকট সংবাদে বংশীবদন জীবন্মৃত হইলেন। উন্মত্তের ন্যায় তিনি সর্ব্বদাই ক্রন্দন করিতেন। অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া বিষম শোক সাগরে ডুবিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মত বংশীবদন ও আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি "হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ বলিয়া" রোদন করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া আর বংশী গৌরাঙ্গ বিহনে।
উন্মত্তের ন্যায় কান্দে সদা সর্ব্বক্ষণে॥
দুই জনে অন্ন জল করিয়া বর্জ্জন।
হা নাথ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে অনুক্ষণ॥

বংশীবদনের প্রতি প্রভুর আমার অসীম কৃপা! শ্রীগৌরাঙ্গের দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের ভাগ্যের কথা কি বলিব? প্রভু একদিন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং তাঁহার প্রিয় ভক্ত বংশীবদন উভয়কেই স্বপ্নাদেশ দিলেন।

তবে প্রভু স্বপ্নযোগে কন দুই জনে।
মিছা কেন কাঁদ সদা আমার বিহনে॥
আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যে নিম্বতলায় মাতা দিলা মোরে স্তন॥
সেই নিম্ব বৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।
সেবন করহ তার আনন্দিত হৈয়া॥
সেই দারু মূর্ত্তি মধ্যে মোর হবে স্থিতি।
এ লাগি সেবনে তার পাইবে পিরীতি॥

প্রভুর এই অপূর্ব্ব স্বপ্নাদেশ শ্রবণ করিয়া বংশীবদন ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। রাত্রিতে এক সময়েই উভয়ে এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। প্রাতে উঠিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত বংশীবদন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট প্রকাশ করিলে জানিতে পারিলেন যে, এই স্বপ্নাদেশ তিনিও একই সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রভুর এ স্বপ্ন কথা শ্রবণ করিয়া।
দুই ঘরে দুই জনে উঠেন কান্দিয়া॥

রজনী প্রভাত হৈলে ডাকিয়া কামার।
সেই নিম্ব বৃক্ষ কাটে চটের কুমার॥

প্রাতে দেবীর আদেশে বংশীবদন একজন ভাস্কর ডাকাইয়া শচী মাতার আঙ্গিনার সেই নিম্ব বৃক্ষটী কাটাইলেন। তাহাকে বলিলেন "এই নিম্ব কাঠে প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি গঠন করিয়া দাও।" ভাস্কর কাঁদিয়া বলিল "প্রভু এ শক্তি আমার নাই, আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না"। বংশীবদন তখন তাহাকে শক্তি সঞ্চার করিলেন এবং এক পক্ষের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া লইলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তির পদ্মাসনে লৌহ শালাকা দ্বারা বংশীবদন নিজনাম লিখিয়া দিলেন।

বংশী আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির পদ্মাসনে।
লৌহ অস্ত্রে নিজনাম করিলা লিখনে॥

শ্রীমূর্ত্তিকে ভাস্কর যখন বস্ত্র সেবা করিয়া সাজাইয়া বংশীবদন ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট উপস্থিত করিল, তখন তাঁহারা উভয়েই প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তবে বস্ত্র সেবা আদি সারিয়া ভাস্কর।
তাঁহারে দেখায় ডাকি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
গৌরাঙ্গ দেখিয়া বংশী ভাবে মনে মন।
সেইত পরাণ নাথে পাইনু দরশন॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া চাএল গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
দরশন করি দেবী ভাবেন অন্তরে॥
এইত পরাণ নাথে দেখিতে পাইনু।
যাঁর লাগি বিরহেতে দহিয়া মরিনু॥

অতঃপর শুভদিন নির্দ্ধারণ করিয়া ঠাকুর বংশীবদন নদীয়া ধামে প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি সকল বৈষ্ণব সমাজে নিমন্ত্রণ পত্র দিলেন সেই শুভদিনে সকল বৈষ্ণবগণ এবং প্রভুর ভক্তবৃন্দ নদীয়া

ধামে একত্রিত হইলেন। বংশী বদনের উদ্যোগে প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দিনে এক মহা মহোৎসব হইল। দেবগণ প্রচ্ছন্নভাবে আসিয়া সেই উৎসবে যোগ দান করিলেন। নদীয়ায় মহাসংকীর্ত্তন-যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

নিরূপিত দিনে সবে কৈলা আগমন।
শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা তবে করেন বদন॥

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কৈল আয়োজন যত।
শ্রীঅনন্ত দেব নারে বর্ণিবারে তত॥

প্রচ্ছন্ন ভাবেতে আসি যত দেবগণ।
প্রতিষ্ঠার কালে গোরা করেন দর্শন॥

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আজ্ঞায় বংশীবদন শ্রীমূর্ত্তির সেবার জন্য দেবীর ভ্রাতা যাদবমিশ্র-বংশধরকে নিয়োজিত করিলেন। বংশীবদন প্রতিদিন প্রভুর শ্রীমন্দিরে যাইয়া তুলসী ও গঙ্গাজল অর্পণ করেন।

তবে প্রভু শ্রীযাদব মিশ্রের নন্দনে।
নিয়োজিত করিলেন প্রভুর সেবনে॥

ভগবান যাদব নন্দন মহাশয়।
প্রভুর সেবার লাগি সকল ছাড়য়॥

প্রতিদিন পূজা কালে শ্রীবংশীবদন।
প্রভুর চরণে করে তুলসী অর্পণ॥

ক্রমশঃ

কুরুক্ষেত্রে

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ।

[শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

—:o:—

চিত্র মানস-চক্ষে,—ওহে মনোময়
জ্ঞান ময়, প্রাণময়, পরম কারণ,—
করি দরশন আজি! অহো ভাগ্যোদয়!
দেখি নাই হেন দৃশ্য জীবনে কখন!
মরি, মরি,—ওরে মন, অন্তর্মুখী হ'য়ে
খুলি নেত্র ভাবময়ে দেখ্ একবার,—
ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র-পবিত্র-হৃদয়ে
রথে কৃষ্ণার্জ্জুন-চিত্র কিবা চমৎকার!
কি বিশাল রণক্ষেত্র—বারিধি অকূল!
উত্তাল তরঙ্গ সম রথ সংখ্যাতীত
লইয়া সারথী-রথী সাহসে অতুল
ভ্রমে সে-সাগর-বক্ষঃ করিয়া কম্পিত।
ভীম প্রভঞ্জনে ভিন্ন দ্রুমবল্লী সম,
বিপক্ষ-কৃপাণ-ছিন্ন বীর-অঙ্গ-রাজি
তাড়িত তরঙ্গে সেই ভাসে অগণন;
ধায় নক্ররূপ লক্ষ রণদক্ষ বাজী।
মাতঙ্গ মকর-রূপ কর আস্ফালিয়া
ছুটিছে মথিয়া সিন্ধু গরজি গভীর।
সরোষ-ভ্রূকুটি-নেত্রে দন্ত বিকাশিয়া
মাতঙ্গে তুরঙ্গে পশে রণরঙ্গে বীর।
বিদ্যুৎ বিকাশ যথা, জ্বালিয়া অনল,
বাড়বাগ্নি-শিখা সম, সন্ সন্ স্বরে

অসংখ্য শায়ক পুঞ্জ ধাইছে কেবল
বীর-শরাসন হ'তে শত্রুনাশ তরে।
মহাকাল-কৈবর্ত্তের মৃত্যু-মহাজালে
হইয়া আবদ্ধ, মরি, মৎস্য-রূপ শত,
সমর-সাগর-নীরে নিহত অকালে
ভাসিছে শোণিত সিক্ত বীরসিংহ কত।
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ—অশনি-গর্জ্জন,
'তিষ্ঠ—তিষ্ঠ' 'রক্ষ—রক্ষ'—'হও অগ্রসর'
'ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও' 'নিকট নিধন'—
বিবিধ বিচিত্র শব্দ উঠে নিরন্তর।
সিন্ধু গরজন সম মিশ্রিত সে-ধ্বনি
বহিছে পবন সদা বিদারি অম্বর;
কা'র সাধ্য পাতে কর্ণ?—বিবর্ণ ধরণী
কাঁপিছে আতঙ্কে মহা!—অতি ভয়ঙ্কর!
রণ সিন্ধুমাঝে হেন মহানাদকারী,—
প্রলয়-পয়োধি নীরে যেমতি কেশব,—
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ অতুল-কাণ্ডারী
করিছে চালিত অশ্ব তুলি শঙ্খ-রব।

ওই দেখ,—বৃন্দাবন-বিপিন-সঞ্চারী
যমুনা-পুলিন-কেলিকুঞ্জবন-প্রিয়
গোপীজন মনোহর সেই বংশীধারী
শোভে অভিনব-রূপে কিবা রমণীয়!
সেই চূড়া, পীত ধড়া সেই সুমোহন—
আদরের বেশভূষা যশোদা মাতার,
করিয়া সে-শ্যাম-অঙ্গ-শোভা-সম্পাদন
নাহি হরে মন আর ব্রজবালিকার।
মুরলী মধুর-তানে ভুবন মোহন

কেশব-কমল মুখ-মধু বরষিয়া,
থাকিয়া শ্রীকরে সুখে, হায় রে তেমন,
নাহি করে সুধাসিক্ত আর ভক্ত-হিয়া!
শ্রীপদ-কমলে শিব-ব্রহ্মা-আকিঞ্চন
মধুর নূপুর সেই নাহি বাজে আর,
মোহিত যে-রবে ভক্ত-প্রেমিকের মন
ভৃঙ্গরূপে সে-কমলে ধায় অনিবার!
নাহি আর সাথে তাঁর স্নেহের বলাই
শ্রীদাম সুদাম আদি; বৎস-গাভী-গণ—
ধবলী শ্যামলী আর, আনন্দে সদাই
ঘেরিয়া তাঁহারে আর না চরে তেমন!
সুকোমল করপুটে ল'য়ে ক্ষীর-ননী,
পীযুষ-কলস কেহ আবরি অঞ্চলে,
অধরে ধরিয়া চারু সুধা সঞ্জীবনী,
মদ-মকরন্দ পদ্ম-নয়ন যুগলে,
নাহি আসে তাঁর পাশে আর গোপীগণ;
আনন্দে পরম ল'য়ে সেই প্রাণধনে
প্রেম-সিন্ধু-নীরে নাহি করে সন্তরণ;
নব নব প্রেম-উৎস নাহি বনে বনে!

অবতরি লীলাময় ভব-নাট্যালয়ে
করে আজি অভিনব লীলা অভিনয়।
ভুলি পূর্ব্বস্মৃতি, ভক্ত, প্রফুল্ল-হৃদয়ে
কর দরশন ওই মহা রঙ্গালয়!
রণ-মদ-মত্ত বীর-বৃন্দ অগণিত
রঞ্জিত নর-শোণিতে রাক্ষসের মত
চারিদিকে আজি তাঁর ক্ষেত্র-কালোচিত
হের কি বীভৎস-রস অভিনয়ে রত!

'সংহার সংহার' মূল মন্ত্র সবাকার;
মহা হিংসা পিশাচীর হৃদয় তুষিতে
অত্যাচার প্রতিকার করিবারে আর
কৌরব-পাণ্ডব মত্ত সমর ভুমিতে।
না ফেলিতে, ওই দেখ, চক্ষের পলক
খণ্ড নরমুণ্ড কত চুম্বিছে ভুতল!
ছিন্ন অঙ্গে বহি রক্ত ঝলক্ ঝলক্
রক্তসিন্ধু সম শোভে মহারণস্থল।
কৌরব-বাহিনী পতি, বিক্রমে অতুল
কালান্তক যম সম, শান্তনু তনয়
করিছে প্রচণ্ড বেগে সংগ্রাম তুমুল
কাঁপিতেছে মুহুর্মুহুঃ পাণ্ডব-হৃদয়।
ভীম ঝটিকায় ভগ্ন মহীরুহ প্রায়,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৈন্য পাণ্ডবের শত
ভীষ্মের শায়কে তীক্ষ্ণ পড়িছে ধরায়;
শরজালে দিঙ্মণ্ডল হয়েছে আবৃত।
সভয়ে পাণ্ডব-চমূ ত্যজি রণস্থল,
না পারি সহিতে আর ভীষ্মের বিক্রম,
পলাইছে প্রাণ ল'য়ে; উচ্চ কোলাহল
উঠিতেছে আর্ত্তনাদ ভেদিয়া গগন।
জয়ধ্বনি ঘন ঘন, আনন্দ উচ্ছ্বাস
উঠিছে কৌরব-কণ্ঠে; তুলি সিংহনাদ
গর্জ্জিছে কৌরবরাজ হেরি শত্রুনাশ;
ম্রিয়মান ধর্ম্মরাজ গণিয়া প্রমাদ।

"কি কর—কি কর, পার্থ?—এখনো কি স্থির,
রণ পয়োধির মত্ত লহরী বিকাশ
হেরিছ প্রশান্ত-মনে? না হ'য়ে অধীর,

সহিছ সমক্ষে হেন স্বপক্ষ বিনাশ?"
কহিলা কেশব, রথ রাখি,—"ধনঞ্জয়!
এই তো সময় শুভ উপস্থিত তব;
কি ভাব' এখনো হ'য়ে মোহিত-হৃদয়?
ভুলেছ কি সত্য?—আছ কি হেতু নীরব?
"ছি ছি, বীর!—বীর-ধর্ম্ম এই কি তোমার?
নিশ্চল এখনো তুমি আছ কোন্ প্রাণে?—
উঠিয়াছে সৈন্য তব শুন হাহাকার!
নিহত অসংখ্য বীর ভীষ্মের সংগ্রামে!
"সিংহ ভয়ে ভীত হের ফেরুপাল সম,
সসৈন্যে সহায় তব ভূপতি সকল
ত্যজি রণস্থল বেগে করে' পলায়ন
নিরখি সম্মুখে বীর ভীষ্মে মহাবল!"
মৃত সঞ্জীবন মন্ত্রে শবদেহে যেন
সহসা জীবনী শক্তি হইল সঞ্চার;
চাহি কৃষ্ণে এতক্ষণে তুলিয়া বদন
কহিলা অর্জ্জুন—"সহ্য নাহি হয় আর!
"অবিলম্বে রথ মম করিয়া চালন,
কুরু পিতামহ বীর ভীষ্মের সকাশে
করহ গমন কৃষ্ণ!—করি মহারণ
করিব প্রেরণ তাঁরে আজি কালগ্রাসে।"

সারথি-ইঙ্গিত মাত্র অমনি তখন
ছুটিল স্যন্দন-বর পবন-গমনে।
মরি, মরি, কিবা শোভা!—মদন মোহন
চালিছে কেমন রথ, রশ্মি-আকর্ষণে
অধে, উর্দ্ধে, চারিপাশে বঙ্কিম নয়ন
খেলিছে কেমন আহা! সূক্ষ্ম পীতবাস

উড়িছে বাতাসে কিবা পতাকার সম !
চঞ্চল কুন্তলদামে কি শোভা বিকাশ !
স্বেদ-বিন্দু কি সুন্দর মুকুতার পাঁতি
সাজায়েছে চন্দ্রাননে ললাটে নির্ম্মল !
নয়ন-চকোর কোটি কি আনন্দে মাতি
করে পান সেই চাঁদে পীযূষ শীতল !
পিপাসিত নিত্য প্রাণ যাঁহার কারণ,
চাতক শান্তনু-সুত, এবে শুভক্ষণে,
শ্যাম-নব ঘনে করি দরশন
সৌভাগ্য-আকাশে স্বীয়, ভাবে মনে মনে।
"এস—এস নন্দলাল !—কত কাল আর
করিবে ছলনা হেন দূরে দূরে থাকি ?
আসিছে সময় দ্রুত নিকটে আমার ;
এসহে নিকটে কৃষ্ণ, বক্ষে তোমা রাখি !
"পাতি মায়াফাঁদ, ওহে শ্যামচাঁদ, আর
রাখিবে আবদ্ধ কত ? প্রারব্ধ করম
কর অবসান প্রভু অচিরে আমার ;
নিরখি তোমারে মুদি যুগল নয়ন।
"আর কেন ?—লীলাময়, খেলিলে তো কত
এ ক্রীড়া-পুত্তলী ভীষ্মে বিদেশে আনিয়া ;
ঘুরাইলে ফিরাইলে কত ইচ্ছামত ;—
আর কেন এ খেলায় রাখিছ বাঁধিয়া ?
"ভেঙ্গে দাও খেলাঘর ;—খুলে দাও পথ ;
দাও হে পাথেয় পাদপদ্ম-পূত-রজ ;
ফিরে যাই নিজ দেশে, যথা অবিরত
পাইহে সেবিতে তব শ্রীপদসরোজ !"
বহিল বিমল ধারা ভীষ্মের নয়নে,
উত্তরী-বসনে বীর মুছিয়া ত্বরায় ;

হেরিলা সে-অশ্রু হরি কেবল ভুবনে,
লইলা অঞ্চল পাতি যতনে তাহায়।

ক্রমশঃ।

কমলপীঠে শ্রীযুগলবিগ্রহ।

(শ্রীযুক্ত কালীহর ভক্তিসাগর লিখিত।)

—:o:—

অই যে বিকচ শতদল!—উহার কর্ণিকা কোটর হইতে একটি মধুময় রসোৎস উৎক্ষিপ্ত হইয়া বিচিত্র রামধনুর আকারে পুনঃ সেই মূলোৎসে প্রবিষ্ট হইয়া উৎসধারার পোষণ করিতেছে (আত্মারাম)। এই ধারা-রচিত ধারামণ্ডলের নীলার্দ্ধ রস, পীতার্দ্ধ প্রেম। "রসো বৈ সঃ" রস কজ্জল-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা চরণ দুখানি বামে একটু সরান। কারণ সূক্ষ্ম কমল চক্র হইতে এ দ্রবঘন মধুনির্য্যাস উত্থিত হইয়াছেন। নিতম্বদেশ স্থূল বলিয়া একটু দক্ষিণ দিকে বক্র এবং সমুকুট মস্তক বামে হেলান। লাবণ্যামৃতময় শ্যামবপু ত্রিভঙ্গ কেন?— শ্যাম রসভরে ডগমগ হইয়াই লোলিত ও ললিত ভঙ্গিম হইয়াছেন যেন রসভারাক্রান্ত তনু আর তিনি বহন করিতে পারিতেছেন না। তাই রাধাঙ্গে কিঞ্চিৎ ভর দিয়া মস্তকের চূড়াকলস হেলাইয়া ঢালিয়া ঢালিয়া ভার কমাইতেছেন। শ্রীরাধার কারুণ্য-তারুণ্য-লাবণ্য তিন সিন্ধুস্নান সম্পাদিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রসসুধা-কৌমুদী-স্নাত প্রেমাহ্লাদ-সিন্ধু উথলিয়া রসোৎসের পুষ্টিসাধন করিতেছেন। অথবা কমলপীঠস্থ মধুসমুদ্র হইতে উদ্‌গত মধুস্তম্ভ মাঝে দ্বিধাকৃত হইয়াছেন। পাদমূলে একবন্ধন ও শিরোভাগে চূড়া-বেণীর অপর বন্ধন বিদ্যমান রহিয়াছে।

"কৃষ্ণচন্দ্র" বলিতে ভাবুক কভু চিত্তে স্থান দেমনা যে কৃষ্ণ চন্দ্রতুল্য অর্থাৎ এক চন্দ্র সম। এও কি হয়? কোটিচন্দ্র ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া চন্দ্র গড়িলে

সেই নব চন্দ্র কুলমণি কৃষ্ণের উপমান গণ্য হইতে পারে। কৃষ্ণ কালো, তাঁহাকে চন্দ্রের উপমেয় করিতে এত প্রয়াস কেন, নেশা কেন, ভাবিয়া দেখি :— চন্দ্রের দীপ্তি আছে, তৎকিরণে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হয় কিন্তু গুহার অন্ধকার ঘুচেনা। কৃষ্ণ কিরণে হৃদাকাশ আলোকিত হয় ; অন্ধকারের এককালে বিনাশ হয়। চন্দ্র স্নিগ্ধ সুশীতল। "কৃষ্ণকরপদতল কোটিচন্দ্রসুশীতল।"— কৃষ্ণাঙ্গের শীতলস্পর্শলাভে গোপললনা গণের লালসা-কুচস্ফোটক জ্বালা আমূল নির্ব্বাপিত হইয়াছে ; চন্দ্রের সুধাসম্পদ আছে, কৃষ্ণ সুধাধারায় কৃষ্ণের আধা প্রেমসিন্ধু রাধা প্রকটিত হইয়াছেন এবং চন্দ্র তৎপদনখ লেহিয়া সুধা সঞ্চয় করিতেছেন। চন্দ্রকিরণ ওষধি সমূহের সঞ্জীবন সুধা। কৃষ্ণকরস্পর্শে বৃন্দাবনের তরুলতা সকল অকালে অসময়েও মুকুলিত মুঞ্জরিত ও কুসুমিত হইয়াছে নব কলিসকল বিকসিত হইয়াছে, এ বেশী কি ? চন্দ্র আনন্দকর, সে আনন্দ কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির কণার কণাও নয়।

দেখুন, সুধা-রসেন্দু-কৃষ্ণোদয়ে প্রেমসিন্ধু-প্রবাহ কত না উদ্বেলিত ! অই যেন উছলিয়া ইন্দুকেও গ্রাস করিতেছে ! আবার দেখুন, রসেন্দুটিও যেন পক্কফল-সদৃশ রসভরে টুপকরিয়া প্রেমসিন্ধুনীরে খসিয়া পড়িল। দেখুন, দেখুন, আবার দেখুন,—চাঁদ সাগর হইতে উদিত হইল !— ক্ষীরোদ সিন্ধুর মন্থন ফল এই কি ?

কৃষ্ণচন্দ্রের ললাটোর্দ্ধে চূড়ার কলসী তোমার ইড়াপিঙ্গলার সঙ্গমে সঙ্কেত করিতেছে। ঐ সঙ্কেত তীর্থস্থলে ভাব জমাট বাঁধিতেছে। উহার রসোজ্জ্বল উচ্ছ্বাস পুচ্ছাকারে বহিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় ছাইতেছে। অনুরাগের লীলাবৈভব বিভোরানন্দের বিলি হইতেছে! বলিহারি যাই। ঐ ধারা—উলটি রাধা !— বিপরীত রতি ! সবার মূল সে কমল !— ভগবৎকৃপাকিরণে যাহার সে কমলপীঠ বিকসিত হইয়াছে, তাহার সর্ব্বাভীষ্ট করায়ত্ত হইয়াছে। অরুণকমলে অরুণ পদকমলচতুষ্টয় অরুণের উপর অরুণাস্তরণ হইয়াছেন। তদুপরে পদকমল বিশ্রাম। পুনশ্চ কমলদলাগ্রে সারি সারি বিংশতি শশিসভা-শোভা ! মরিরে শোভা, কিবা প্রভা ! অরুণও কমলের এই দাম্পত্যপ্রেম দূরে থাকিয়া নয়,— এযে প্রেমালিঙ্গন সরস !

মণি মহামূল্য দীপ্তিমান্ হইলেও কঠিন ; মরকত মণিও কঠিন। উহাও

প্রস্তরবৈত্যে কিছু নয়?—কিন্তু এই মরকত মণিস্তম্ভ—ইহা মরকত মৃণালস্তম্ভ ইহা নবনীত-নীলমণিস্তম্ভ! বৃন্দাবন কুঞ্জগুহার এই নীলমণি গলিত রসমাণিক! শ্যামের সুকোমল তনুরুচি কচি পল্লব-সন্নিভ,—তবু মণি কেন?—কোটিভানু রেণুদলের সমন্বয়ে সুগঠিত এ মণি!—মণিদ্যুতি ছড়ায়; শ্যামতনুদ্যুতিতে সর্ব্ব মলিন হয়, লজ্জা পায়। এমন কান্তদ্যুতিময় শ্যামকে মণি কুলের রাজা বলিয়া গণি। সুতরাং শ্যাম মণিরাজ নীলমণি!—মণি বলিবার অন্যহেতু দেখ,—ভানুকিরণ লৌহবিকীর্ণ বলিয়া উগ্রজ্বালাময়—দগ্ধ করে। শ্যামাঙ্গ কোটিভানু জিনি বিভাসিত হইয়াও দগ্ধ করে না, তপ্ত নয়; ইহা মণি ধর্ম্ম বিশেষতঃ নীল-কান্তির স্বভাবশৈত্য লোকবিশ্রুত বটে। গোকুলানন্দ শ্যাম কেমন মণি,—মণি-হিমভানু। প্রাকৃত ভানুর সপ্তরশ্মিধারায় অবস্নাত হইয়া মানসে কমল প্রফুল্ল হয়, আবার তদ্বিরহে স্তিমিত ও ম্লানমুদিত হয়। কিন্তু বৃকভানু-নন্দিনীর বল্লভ কানুভানুর উদয়ে সমগ্র জীবের প্রাণপদ্ম, বিশেষতঃ গোপবধূগণের অপ্রাকৃত বিলাস-রতি-কমল সম্যক বিকসিত হয়, অথচ মলিন মুদিত না হইয়া বরং এসব প্রেমপরাগরাগরঞ্জিত পদ্মরাজী সমধিক উল্লাসিত হইয়া ভাবসরসীর মান সলিলে ঝাঁপিয়া পড়ে। সামান্য প্রাকৃত ভানুর ধর্ম্ম কৃষ্ণ ভানুতে নাই। এ ভানুর দেশে দিবানিশি দুটি বর্ণ ভেদ নাই। এ রাজ্যের প্রস্ফুট কমল ফুটন্তই থাকে নিমীলিত হয়না। তাই শ্যামকে ভানু বলিয়াও বলিনা,—মণি বলি।

আবার মণি বলি কেন?—উহা গুহা নিহিত মহাসম্পদ!—কিম্বা প্রেমাম্বু-ধির সেচা নিধি। উহা কোমলমণি, কমলমণি! কমলবৎ স্নিগ্ধমণি! মণি স্পর্শ অতিশয়শীতল বটে, গোকুলভানুকে মণি বলিব না কেন, উহার স্পর্শে মদনও হিম হইয়া যায়। মদন-সন্তাপ-সমান তাপ আর আছে কি?—যাহাকে তোমরা ত্রিতাপ বল, সেই তাপত্রয়ের বীজাঙ্কুর মদন (ওরফে) কাম,—কামনা বটে। এনীলমণি যে পরশমণি,—স্পর্শে কামমূলা সর্ব্বজ্বালা এককালে শীতল হয়—এ পরম স্পর্শে সুখশৈত্য সিন্ধুতে ডুবাইয়া দেয়। কৃষ্ণ—পরশমণি, উহার স্পর্শে লৌহ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। জীবজড়ত্ব অমৃতত্বে পরিণত হয়।—সে মণি নয়, কে মণি? যে এক মাণিক সাত রাজার ধন এমন কত চাঁদামাণিক সে নীলমণির পদনখে লোটাইতেছে।

এ সুনীল মণি যে সে নগণ্য মণি নয়,—এ বজ্রকঠোর মণি নয়! এ নব নীরদ মণি —এ টলটল জলদস্তুময় মণি। যেন মণিটি পাকিয়া তুলতুলে হইয়াছে রসে টলটল, ঢলঢল, ঝলমল!—এ কাচামাণিক নয়, পাকামাণিক, রসমাণিক! হীরামণি দ্বারা কাচ কাটা যায়। হীরা মাণিক তাই কঠিন। কৃষ্ণমাণিক যেন কোমল-প্রসূন-তাড়নেও চঞ্চল হয়—এত পকরসাল তুলতুলে। ফুলহার কমল-তরুণ বক্ষে অৰ্দ্ধনিমগ্ন হইয়া যেন চিত্রিত কুসুম-মণ্ডলসদৃশ প্রতীয়মান হয়। ব্রজের কালোমাণিক এমনি কোমল যেন কালিন্দী জলে ধৌত হইতে হইতেই কালিন্দীর জল কালো হইয়া গিয়াছে, মাণিকের রসে কষায়িত (রসায়িত) হইয়াছে। মণি-মঞ্জীর পদযুগলের কমনীয়তা গুণে মণিময় মণ্ডলরেখা মাত্র পদে অঙ্কিত করিয়া নাগের মত লুকাইত থাকে।

শ্যামকে নীলকান্ত মণি বলিয়া ততটা শীতল হইতে পারি নাই, শ্যামকে স্পর্শমনি বলিয়াও ততটা বিভাবিত হইতে পারি নাই। প্রাণের রসনা আরো কিছুর জন্য যেন লিহি লিহি লালায়িত। এ পিপাসার জাগরণে এ অতৃপ্ত পিপাসার উন্মুক্ত অধরে, স্বাদুরসের যাহা চূড়ান্ত তাহাই ধরিয়া না দিলে নিস্তার নাই।—শ্যাম তবে কোন্ মণি?—জহরীর জহুরায় যাহা ফুটিয়া উঠে।—কুবেরের শক্তি কি যে এ মণির পরিচয় করে; কুবের মাত্র ভাণ্ডারী। সাপের মণি যাঁর কপালে নেত্র গড়াইয়াছে, চন্দ্র যাঁর সে নেত্রের মণিস্বরূপ এবং ছার মণি রত্নরাজী যাঁর ঘরের ছাঁইচে গড়াগড়ি যায়, দৃক্‌পাত নাই,—সেই ভূতনাথ শঙ্কর চাঁদনয়নে কৃষ্ণ চাঁদমণির দেশের খবর রাখেন। যোগেশ্বরের আজ্ঞায়, দেবী যোগ-মায়ার কৃপায়, যাঁহাদের চাঁদ চক্ষু ফুটিয়াছে, তাঁহারা বলেন গোকুলের শ্যামচাঁদ চন্দ্রকান্ত মণি!—চন্দ্র—সুধানিধি, কান্ত—গোপীজনবল্লভ, সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ; পুনশ্চ মণি—ভূষণের উজ্জ্বল ভূষণ!—অথবা চন্দ্রকান্ত সমাজে মণি স্বরূপ অর্থাৎ কৃষ্ণ অপ্রাকৃত চন্দ্রকান্ত! কৃষ্ণ চন্দ্র কান্ত মণি বটে। ইহার সর্ব্বচমৎকারী তাৎপর্য্যান্তর শুনুন,—যাহা শুনিতে প্রাণে হিল্লোল খেলে, শুনিব এই কৌতুহলে চিত্ত পুলকিত হয়—যাহা কহিব ভাবিতে প্রাণমন রসবিভোর হইয়া অবশতা প্রাপ্ত হয়, যে সমাচার রসের নিদান, প্রেমনিদান,—যে সমাচার উজ্জ্বল রসের তরঙ্গে অনিল বহায়,—যে সমাচার—জগতের শুভ সমাচার—অপূর্ব্বতর হইয়াও কলিতে প্রচারিত হইয়াছেন—সেই

সমাচার! তমালে কনক বল্লরীর বাঁধনী চাহিনা কি? নীরদে বিদ্যুল্লতার ঝিকিমিকি স্পন্দন চাহিনা কি? জলে কমল ফোটে, শেষে জলে কমলে লোটালোটি রসাস্বাদ হয়, বিজলীকে, জান? উনি রসগম্ভীর মেঘের বুকের আনন্দচ্ছটা, আনন্দ ধারা। তাই কৃষ্ণ চকান্ত!

চন্দ্র আনন্দকর। চন্দ্রকান্ত-মনি বক্ষ হইতে আনন্দ স্বরূপ বিগলিত সলিল দল নিঃসারিত হয়, ইহা অশ্রুতপূর্ব্ব নয়। কৃষ্ণ চন্দ্রকান্তমণি। উহার হৃদয়ের পরমগোপ্য ক্ষরিত আনন্দ রসধারা উৎসারিত হইয়া নীরদাঙ্কোৎসারিণী চপলার মত প্রেমতরঙ্গিণী রাধামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। "দেহভেদং গতৌ তৌ"—"তদ্দ্বয়ং" ইত্যাদি। তাই বলি ভাই শ্যাম মোদের চন্দ্রকান্তমণি। চন্দ্র কান্ত-মণি! কৃষ্ণচন্দ্র কালো হইলেও উহার আনন্দ জ্যোৎস্না বা তনুদ্যুতি কৌমুদী গৌরী বটে—শ্যামতনুর প্রেমকিরণ হিল্লোল এই শ্রীরাধা। ইনি গৌরী।

"কেলে সোণা নাম রাখেন রাধাবিনোদিনী।"

শ্রীমতী কৃষ্ণকে কেলে সোণা বলেন, অর্থাৎ কালবর্ণ স্বর্ণখানি। অবাক্ হনু দিদি! চন্দ্রও কাল, স্বর্ণ বা সুবর্ণও কালো;—জগৎ ছাড়া কথা! নীলবর্ণ অতি স্নিগ্ধ নয়নানন্দী; সুতরাং সু-বর্ণ (সুন্দরবর্ণ) বলিয়া অভিহিত হইতে দোষস্পর্শ হয়না। দ্বিতীয় অর্থে হেমবর্ণ কৃষ্ণ;—অতি অদ্ভুত কথা বটে! সোণা কি কভু কালো হয়?—উহার রঙ্ ঠিক্ কাচাহরিদ্রার মত অথচ অতি প্রোজ্জ্বল। তবে শ্রীমতী কি বিদ্রুপ করিয়া ওরূপ বলেন, অথবা কৃষ্ণ সনে পরিহাস করেন? এ দুইয়ের কোনটিই নয়। জটিলা কুটিলা বলেন "ও কাল ছোঁড়াটা" তাহাদের ভাব—"কাল অঙ্গরে কুৎসিত ও নীরস অর্থাৎ অন্তর্ব্বাহিঃ কালো।" রাধাতো শ্যামকে সে পোড়াচক্ষে দেখেন না, প্রেমের চক্ষে। "কাল" কথা রাধার মর্ম্মে লাগিত বোধ হয়। তিনি কালকে সোণা জানেন। কারণ কৃষ্ণ অনন্ত গুণ স্বর্ণ খনি। হউক্ কাল উহার তনু বাহিয়া সোণার হিল্লোল খেলে। যাহারা শ্যাম প্রেম চিনেছ, তাঁহারা শ্যামঙ্গের হেমদীপ্তি-ঝলক প্রত্যক্ষ করেছে। বর্ণদীপ্তির ঘন পরিণাম কালো। ইহা এক নিগূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব। বাজার হইতে মেজেণ্টার আনিয়া রঙ্ প্রস্তুত করুন, মেজেণ্টারের রঙ্ প্রায় কালো কিন্তু জলসংযোগে তরল করিলে লালবর্ণ ধারণ করে। চিন্তামণি স্বর্ণ প্রসব করেন, ইহা শাস্ত্রে গীত।

মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।

সূর্য্য যেমন কিরণ প্রসব করেন, অথচ সূর্য্য ও তৎকিরণ অভিন্ন বস্তু, নীলমণি শ্যামও রাধাদ্যুতি সোণা বিকিরণ করিতেছেন। তাই সে সোহাগবিহ্বলা শ্রীরাধা কহেন "কেলে সোণা।" আদরিণীর মনের ভাব "শ্যাম হে তুমি কালো আমি সোণা-তোমার আহ্লাদিনী সোণা, তুমি আমি অভিন্ন,—সত্য সত্যই তুমি কেলেসোণা। তুমি মরকত মনি, আমি সে মণির হেমদীপ্তি। এই হইল রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধ—যাহা শুদ্ধ মধুমধুর মাধুরীমধুর—সুধামধুর—মধুসুধার ও কপালের তিলক রসমধুর।

দেখুন দেখুন, শ্যামচাঁদের বিদ্রুমদীপ্তিধর অধরের সুধাধারা সুভগা মুরলী গিলিয়া গিলিয়া ওর পায়না, গীতচ্ছলে মেঘদণ্ডগুণ্ড বর্ষণ করিয়াও ইয়ত্তা পায়না। উহা শ্যামল সুন্দরের গণ্ডমণিদর্পণ দ্বয়ে ধারারেখা অঙ্কিত করিয়াছে, স্মিত মাধুরী ধারা ঢালিয়া আবার তৎপুষ্টি সাধন করিতেছে এবং সুধাকিরণে রাধাসোণাকে কষায়িত করিয়া দিতেছে। গললগ্ন সুধাঙ্কীর গুলির সৌরভে লুব্ধ হইয়া চকোরিগণ চাঁদ মুখ বেষ্টন করিয়াছে। তাহাতে বোধ হইতেছে যেন কৌমুদীস্নাত মেঘদল চাঁদের ধার দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। রাধার সুধাঙ্কিত গলিত হেমমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার নেত্রে অমৃত বারি ক্ষরিত হইতেছে এবং অঞ্জন রঞ্জিত সেই বারি শ্রীরাধার নীল শাড়ীতে টপ্ টপ্ বিন্দু বিন্দু পড়িয়া নীল শাটীর নীলত্বের সরসত্ব সম্পাদন করিতেছে। রাধার স্বর্ণবর্ণরূপ-প্রেমাগুণ কেবল কৃষ্ণের বদনে ধরেছে, অতঃপর সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিবে। সম্প্রতি উনি পীতবাস, কালে পীত কলেবরও হইবেন। কেলেসোণা যে সোণা, সে সন্দেহ ঘুচিয়া যাইবে। রাধাঙ্গের লাবণ্য মুক্তাম্বু মধ্যে শ্যাম বিম্বিত, আবার শ্যামাঙ্গের লাবণ্য রত্ন দর্পণে রাধা বিম্বেতা হইয়া মুঞ্জরিতা সখী লতারচিত রতিবিলাস মন্দিরের মিলন সুখ সম্ভোগ করিতেছেন! বলিহারি রূপ !! বলিহারি বাহার !!!

ভক্তিপ্রবন্ধ।

[পণ্ডিত শ্রীল জানকীনাথ ভাগবতভূষণ লিখিত।]

—:০:—

মত্বা গুরুং জগন্নাথং জগন্নাথসুতং তথা।
সজ্জনানুগ্রহেণৈব প্রবন্ধো লিখ্যতে ময়া॥

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে নানা প্রবৃত্তির লোক বাস করিতেছে, তন্মধ্যে অনেকেরই মত এই যে কলিযুগ অতি মন্দ। এই যুগে প্রায় সকল জীবই পাপাসক্ত একথা সত্য কিন্তু কলিযুগের যে একটি অসাধারণ গুণ আছে তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই অপূর্ব্বগুণ দেখিয়াই মহারাজ পরীক্ষিত কলিকে বিনাশ করেন নাই ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যথা;—

নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্।
কুশলান্যাশু সিদ্ধন্তি নেতরাণি কৃতানি চ॥

অর্থাৎ মহারাজ পরীক্ষিত দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া দেখিলেন যে, নৃপলিঙ্গধারি কলি বৃষরূপী ধর্ম্মের তিন পদ ভগ্ন করিয়া গোরূপা পৃথিবীর প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা কলি পীড়নে পীড়িত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। এমন সময় তাহাদের প্রতি মহারাজ পরীক্ষিতের দৃষ্টি পতিত হইল এই অন্যায় আচরণ অবলোকন করিয়া তিনি ক্রোধে আরক্ত নেত্র হইলেন এবং শীঘ্র তথায় যাইয়া রাজচিহ্নধারী ম্লেচ্ছাচারী কলিকে ধারণ করিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে পর কলি শরণাগত হইলে ভ্রমরের ন্যায় সারগ্রাহী মহারাজ বিচার করিয়া দেখিলেন যে কলি দোষের খনি হইলেও একটি ইহার মহৎগুণ আছে যে, পুণ্য ফল সঙ্কল্প মাত্রই সিদ্ধ হইবে আর পাপ কার্য্য আচরণ না করিলে তাহার ফল ভোগ করিতে হয় না। এই বিবেচনায় তিনি কলিকে বিনাশ করিলেন না। একাদশস্কন্ধেও করভাজন যোগীন্দ্র জনক ঋষিকে কলি মাহাত্ম্য বর্ণন স্থলে বলিয়াছেন যথা;—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥
কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥

অর্থাৎ সারগ্রাহী গুণজ্ঞ আর্য্যগণ কলির খুব সম্মান করেন, কেননা সত্য যুগে ধ্যান ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বাপরে সেবা দ্বারা বহু কালে বহু প্রয়াশে যে ফল লাভ হয় কলিযুগে একমাত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল লাভ হয়। আর কলি-কালে প্রায় সকল মনুষ্যই নারায়ণ পরায়ণ হইবেন। এই সকল কারণে সত্যাদিযুগের মনুষ্যগণও কলিযুগে জন্ম গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করেন। আজ সেই কলিযুগ উপস্থিত ভগবদিচ্ছায় বহু লোকই হরি ভজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে শ্রীহরিসভা স্থাপন করিয়া উচ্চ সংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণব শাস্ত্র ব্যাখ্যা হইতেছেন। বহু লোককেই হরি ভক্তিতে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া আমার হৃদয় আগ্রহে পরিপূর্ণ হইল হৃদয়স্থ কোন পরম পুরুষ যেন আমাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, এই সময় অতিবাহিত হইতেছে সকলই হরিভক্ত হইতেছে অতএব তুমিই বা কেন এসময়ে উদাসীন হইয়া থাকিবে একটু ভক্তির আলোচনা করিয়া ভক্ত বৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন কর এবং নিজেও উন্নত হইবার চেষ্টা কর। এইরূপ যাঁহার প্রেরণায় আমি এই দুঃসাধ্য বিষয়ে লেখনী পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তিনিই আমার একমাত্র সম্বল। পাঠকগণ! আপনারা হরিভক্ত তাই আপনাদিগের নিকট করযোড়ে আমার এই প্রার্থনা যে, যে বিষয়ে ব্রহ্মা নারদঋষি পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়াছেন। আমি অজ্ঞ বালক হইয়া সেই বিষয়ে লুব্ধ হইয়াছি, কতদূর কৃত কার্য্য হইব বলিতে পারিনা! তবে অজ্ঞতা যাহা কিছু দেখিবেন তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

ভক্তি শব্দের উচ্চারণ মাত্রেই প্রথমত এই অর্থ প্রতীত হয় যে,—

ভজনং ভক্তিরিতি, ভজসেবায়ামিত্যস্মদ্ধাতো ভাবোক্তি প্রত্যয়েন সিদ্ধোঽয়ং ভক্তি শব্দঃ।

অর্থাৎ ভজ ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে ক্তি প্রত্যয় করিয়া ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ভজ ধাতুর অর্থ সেবা সুতরাং ভক্তি শব্দের অর্থও সেবা। আমরা অনেকেই সেবা করিয়া থাকি অর্থাৎ স্ত্রী সেবা পুত্র সেবা ধন সেবা গৃহ সেবা

করিয়া থাকি কিন্তু আমাদিগকে কেহইত ভক্ত বলেনা। বরং অভক্ত বলিয়াই সাধুগণ উপেক্ষা করেন। তাহার কারণ এই যে যথার্থ সেব্যে ঐ সেবা বা ভক্তি শব্দ প্রযুক্ত না হইলে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে না। স্ত্রী পুত্রের সেবা ও ভগবৎসেবা এক প্রকার হইলেও সেবা ও ভক্তি শব্দের পর্য্যবসান ভগবানেই হইবে। লোকেও উহা প্রসিদ্ধি আছে যে স্ত্রী পুত্র সেবাকে কেহই ভক্তি বলেনা। প্রহ্লাদ মহাশয় ইহা বলিয়াছেন যথা—

যাপ্রীতি রবিবেকানাং বিষয়েষ্বন-পায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃসামে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

অর্থাৎ প্রহ্লাদ মহাশয় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, হে প্রভো! অবিবেকী ব্যক্তিদিগের বিষয়ের প্রতি যেমন গাঢ় প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায় তোমার পাদ পদ্ম স্মরণ করিতে করিতে আমারও যেন তোমাতে সেই প্রকার প্রীতি হয়।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ভক্তি শব্দের অর্থ ভগবদ্ভজন; স্ত্রী পুত্র ভজনকে ভক্তি বলেনা। যদি কেহ এমন মনে করেন যে, ভজনং ভক্তি এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সকল প্রকার ভজনকেই ভক্তি বলিতে পারা যায় তাহা নহে কারণ এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারগণ ভক্তি শব্দের পারিভাষিক লক্ষণ করিয়াছেন। যথা ভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ।—

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনুকূল অনুশীলনকেই (সামান্যত) ভক্তি কহে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বলিতে যে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইবে তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ শব্দ উপলক্ষক হইয়া গুরু ও দেবতান্তরকেও বুঝাইতেছে। সেই অনুশীলন জ্ঞান ও কর্ম্মের আবরণ এবং ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর স্পৃহা শূন্য হইলে তাহাকে উত্তমাভক্তি বলা যায়। এস্থলে জ্ঞান শব্দে ভজনীয়স্বরূপে অনুসন্ধান ভিন্ন অভেদ ব্রহ্ম জ্ঞান এবং কর্ম্ম শব্দে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনোপযোগী সেবনাদি ভিন্ন স্মৃত্যুক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম জানিতে হইবে। নারদ পঞ্চরাত্রেও ঐ প্রকার ভক্তির প্রকৃত লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন যথাঃ—

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

নারদ ভক্তি সূত্রেও উক্ত হইয়াছে যথা ;—

সা কস্মৈচিৎ পরম প্রেমরূপা।

অর্থাৎ সেই ভক্তি সর্ব্ববিলক্ষণ পরমেশ্বরে পরম প্রীতি রূপা ইত্যাদি ভক্তির লক্ষণ প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন। ভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য যাহা কিছু আছে তাহা পশ্চাৎ লিখিব এক্ষণে ভক্তির মাহাত্ম্য বিষয় প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

হরিভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে যথা ;—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।

সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা

অর্থাৎ ভক্তি ক্লেশবিনাশিনী শুভদায়িনী মোক্ষলঘুকারিনী অত্যন্ত দুর্লভা নিবিড়ানন্দস্বরূপা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী হন। ভক্তি যে ক্লেশাদিবিনাশ ও শুভফল প্রভৃতি দান করেন ইহা প্রমাণের সহিত প্রতিপাদন না করিলে সাধারণ লোকের বোধগম্য হওয়া দুরূহ বিবেচনায় প্রমাণের সহিত ঐ সকল প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভক্তির ক্লেশবিনাশিত্ব বুঝাইতে হইলে অগ্রে ক্লেশ কাহাকে বলে তাহা বলা নিতান্ত আবশ্যক। সে বিষয়ে লিখি যথা ঃ—

ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তত্রিধা।

ক্লেশ তিন প্রকার, পাপ, পাপের বীজ, ও অবিদ্যা। পাপ আবার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ ভেদে দুই প্রকার যথা ঃ—

অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধঞ্চেতি তদ্বিধা।

তাহার মধ্যে অপ্রারব্ধহরত্ব একাদশস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যথা ঃ—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।

তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন হে উদ্ধব! যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠপুঞ্জকে ভস্মীভূত করে সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি পাপ সমূহকে বিনাশ করে। প্রারব্ধ পাপ হরত্ব তৃতীয়স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যথা ঃ—

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎ প্রহ্বণা যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।

শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

দেবহুতি কহিলেন, প্রভো! কুক্কুর ভোজী চণ্ডালও কোন সময়ে তোমার

নাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণও বন্দন করিয়া সবনযাগের উপযুক্ত হইতেছে আর যাহারা তোমায় দর্শন করিতেছে তাহাদের যে কত ভাগ্য তাহা আমি বর্ণন করিতে পারি না। প্রারব্ধ পাপের লক্ষণ যথা ঃ—

দুর্জ্জাতিরেব সবনা যোগ্যত্বে কারণং মতং।

দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেবতৎ ॥

সবনযাগের, অনধিকারে দুর্জ্জাতিই কারণ, যে পাপ হইতে দুর্জ্জাতিতে জন্ম হয় তাহাকেই প্রারব্ধ পাপ কহে। ভক্তি পাপের বীজকে হরণ করেন ইহা ষষ্ঠস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যথা—

তৈ স্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান-ব্রতাদিভিঃ।

নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ তপোদান ব্রতও চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা পাপ সকল নষ্ট হয় বটে কিন্তু পাপোৎপাদক হৃদয় পবিত্র হয় না একমাত্র হরিপাদপদ্ম সেবাই পাপ বীজরূপ হৃদয়কে পবিত্র করেন।

অবিদ্যাহরত্ব চতুর্থস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যথা।—

যৎ পাদ-পঙ্কজ পলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিত মুৎ গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।

তদ্বন্নরিক্ত মতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ স্রোতোগণা স্তমরণং ভজ বাসুদেবং ॥

ব্রহ্মার পুত্র কুমার পৃথু মহারাজকে কহিলেন। মহারাজ! সাধুগণ যেমন ভগবৎ পাদপদ্মাঙ্গুলির কান্তি ধ্যানরূপ ভক্তি দ্বারা কর্ম্মবদ্ধ অহঙ্কাররূপ হৃদয় গ্রন্থিকে ছিন্ন করেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিয়াও সেরূপ ছিন্ন করিতে পারে না। অতএব একমাত্র আশ্রয়নীয় ভগবৎ পাদপদ্ম ভজন কর। ভক্তি শুভদায়িনী যথা।

শুভানি প্রীণনং সর্ব্ব জগতামনুরক্ততা।

সদ্গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ ॥

সর্ব্ব জগতের প্রীতিও অনুরক্ততা সদ্গুণ আর সুখ প্রভৃতিকে শুভ কহে। ভক্তি এই সকল প্রকার শুভই প্রদান করিয়া থাকেন জগৎ প্রীণন ও অনুরক্ততা যথা পদ্ম পুরাণে।

যে নার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।

রজ্যন্তি জন্তব স্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি ॥

যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করে সে জগতের তৃপ্তি সাধক হয় এবং তাহার প্রতি স্থাবর জঙ্গমও অনুরক্ত হয়।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যাকিঞ্চনা সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে নিষ্কিঞ্চনা ভগবদ্ভক্তি বাস করেন তাহার হৃদয় পবিত্র হয়, সেই পবিত্র হৃদয়ে বৈরাগ্যাদি সদ্গুণ ও অন্যান্য দেবগণের সহিত ভগবান্ বাস করেন। আর যে ব্যক্তি হরি-ভজন করে না তাহার হৃদয়ে কোনও সদ্গুণ বাস করেনা বরং তাহার চিত্ত ইচ্ছানুসারে বাহ্য অসৎ বিষয়ে ধাবিত হয়। যাবতীয় সুখ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত বৈষয়িক সুখ, ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় সুখ ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সুখ এই তিন প্রকার সুখই ভক্তি প্রদান করেন। অনিমা লঘিমা প্রভৃতি পরমাশ্চর্য্য সিদ্ধি সকল ও সম্পূর্ণ বিষয় ভোগ মুক্তিও নিত্য পরমানন্দ গোবিন্দ ভক্তি হইতে হয়। হরি ভক্তি সুধোদয়ে এবিষয়ের একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যথা—

ভূয়োপি যাচে দেবেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে।
যামোক্ষান্ত চতুর্ব্বর্গ ফলদা শুভদালতা॥

হে দেবেশ! আমি বারংবার আপনার নিকট যাচঞা করিতেছি আপনার পাদপদ্মে আমার এমন দৃঢ়া ভক্তি হউক যে ভক্তিলতা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদায়িনীও শুভদায়িনী।

মনাগেব প্ররুঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥

যাহার অন্তঃকরণে অল্পমাত্রও ভগবদ্রতি (ভক্তি) আরূঢ়া হন তাহার চতুর্ব্বর্গ তৃণের ন্যায় হইয়া যায়। মহারাজ্ঞী গমন করিলে চেড়ীগণ যেমন তাহার পশ্চাৎ গামিনী হয় সেইরূপ মুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধিগণও অদ্ভুত হরি ভক্তি মহাদেবীর অনুগামিনী হয়।

বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনেক সাধন দ্বারা বহুকালেও লাভ করিতে পারা যায় না এবং হরিও শীঘ্র প্রদান করেন না এই দুই কারণ বশতই ভক্তিকে সুদুর্ল্ভা কহে। তাহার মধ্যে আদ্যা যথা তন্ত্রে ঃ—

জ্ঞানতঃ সুলভামুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন-সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

জ্ঞান দ্বারা মুক্তি সুলভা যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা বিষয় ভোগ অনায়াসেই লাভ হইয়া থাকে কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টা হরি ভক্তি সহস্র সহস্র সাধন করিয়াও লাভ করিতে পারা যায় না।

রাজন্ পতির্গুরু রলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ক চ কিঙ্করো বঃ।

অস্ত্বেব মঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! যে ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদিগের ও যাদবদিগের প্রতিপালক উপদেষ্টা দৈব প্রিয় কুল প্রবর্ত্তক এবং কখন কখন আপনাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া কিঙ্করের কার্য্যও করিতেছেন, সেই ভগবান্ ভক্তদিগকে মুক্তি অনায়াসে প্রদান করেন, কিন্তু ভক্তি সহসা প্রদান করেন না। ব্রহ্মানন্দ পরার্দ্ধগুণ হইলেও ভক্তি-সুখ-সমুদ্রের পরমাণু তুলনাকে ধারণ করিতেও সমর্থ হয় না।

কৃত্বা হরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গ সমন্বিতং।
ভক্তির্বশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী মতা॥

ভক্তি প্রিয় বর্গের সহিত হরিকে প্রেম ভাগী করিয়া বশীভূত করেন বলিয়াই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী বলা যায়। একাদশস্কন্ধেও ইহা উক্ত হইয়াছে যথা :—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব!
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি মমোর্জ্জিতা॥

ভগবান্ কহিলেন, উদ্ধব! মদ্বিষয়িনী দৃঢ়া ভক্তি যেমন আমায় সাধন করে, যোগ সাংখ্য ধর্ম্ম স্বাধ্যায় তপও দান সেরূপ সাধন করিতে পারে না। সেই ভক্তি সাধন, ভাব ও প্রেম ভেদে প্রথমত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার মধ্যে সাধন ভক্তির লক্ষণ, যথা—

ইন্দ্রিয় প্রেরণা দ্বারা সাধ্যা এবং ভাব ভক্তিকে যে সিদ্ধ করে তাহাকেই সাধন ভক্তি কহে। নিত্য সিদ্ধ ভাবের হৃদয়ে প্রকটতাকেই সাধ্যতা কহে।

বৈধী ও রাগানুগাভেদে সেই সাধন ভক্তি আবার দুই ভাগে বিভক্তা। অনুরাগ পূর্ব্বক যাহাতে প্রবৃত্তি না হইয়া কেবল শাস্ত্র শাসন বলে প্রবৃত্তি হয় তাহাকেই বৈধী ভক্তি বলে। সেই সাধন ভক্তির যে ষষ্টি অঙ্গ ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে সে সকল বলিতে হইলে প্রবন্ধ বাহুল্য হয় এ নিমিত্ত সংক্ষেপে প্রহ্লাদ মহাশয় কথিত নবধা ভক্তি লিখিতেছি। যথা :—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীত মুত্তমং।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহাশয়কে ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস প্রহ্লাদ! এতদিন গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া অধ্যয়নের সার কি নিশ্চয় করিয়াছ আমার নিকট বল। প্রহ্লাদ মহাশয় পিতার বচন শ্রবণ করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, পিতঃ! বিষ্ণুর নাম গুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও দেহগেহ সম্পূর্ণ বিষ্ণুতে সমর্পণ এই নবধা ভক্তি যে পুরুষ আচরণ করে সেই তত্ত্বদর্শী এবং তাহার অধ্যয়নই উত্তম অধ্যয়ন। এই নবধা ভক্তির এক অঙ্গ বা সকলাঙ্গে নিষ্ঠা হইলেই ভগবৎ পাদপদ্ম পাওয়া যায়। ব্রজবাসিও যাদবদিগের যে কৃষ্ণ বিষয়ক স্বাভাবিক অনুরাগ তাহাকেই রাগাত্মিকা কহে, তাহার অনুগত ভক্তিকেই রাগানুগা কহে। বিশুদ্ধ সত্বস্বরূপ এবং প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ সমতাকে ভজন করেন ও রুচি উৎপন্ন করিয়া চিত্তকে যিনি কোমল করেন তাহাকেই ভবভক্তি কহে। অর্থাৎ, প্রেমভক্তির প্রথমাবস্থাই ভাব ভক্তি। যিনি চিত্তকে সম্যক কোমল করিয়া ভগবানে অতিশয় মমতা স্থাপন করেন তাহাকে প্রেম ভক্তি কহে। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত ভাব গাঢ় হইলেই পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রেমভক্তি কহেন। প্রেমভক্তির উপরেও প্রণয় স্নেহরাগ প্রভৃতি অনেক ভক্তি আছে কিন্তু সে সকল প্রায় সাধকদিগেতে দৃষ্ট হয় না এবং প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে ও ঐ সকল বর্ণনা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। আমরা সকলেই কাল সর্পের বদন মধ্যে প্রবিষ্ট, একমাত্র ভক্তি ভিন্ন কালভয় নিবারণের আর অন্য উপায় নাই। তাই বলি পাঠকবৃন্দ! আসুন, সকলেই আমরা

হরি-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তি বলে কালকে দমন করিয়া পরম সুখ-ধামে পরমানন্দ স্বরূপ ভগবানের সেবা লাভ করিবার চেষ্টা করি।

খুনী-মামলা।

(শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ বসু লিখিত।)

—:০:—

ফরিয়াদী-ভগবান সরকার। আসামী জীবন পাটোয়ার।

জীবন একজন সংসারী লোক। সংসারের উপর সচরাচর লোকের যেরূপ মায়া মমতা ও টান থাকে, জীবনেরও ঠিক সেই রূপ ছিল। কিন্তু সংসার অপেক্ষাও অধিক মায়া মমতা তাহার নিজের দেহের প্রতি ছিল। নিজের দেহটী রক্ষা হইলে তবে সকল রক্ষা হইবে, এই ধারণাটীতে জীবনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই জীবন সর্ব্বদা নিজের দেহটী ফিট্ ফাট্ রাখিত। অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিধান করিত, মস্তকের কেশগুলি শুভ্রবর্ণ হইলেও সুগন্ধী তৈলে চাকচিক্য ও টেড়ীতে সুশোভিত করিত। ঘড়ী ও চেন সর্ব্বদাই বক্ষস্থলে শোভা পাইত। সুন্দর ছড়ী গাছটী প্রায়ই হাতে থাকিত। পায়ে চকচকে বার্ণিস করা জুতা মচ্ মচ্ শব্দ করিতে করিতে জীবনকে গমনাগমনে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করিত। দেহটী হৃষ্ট পুষ্ট রাখিবার জন্য আহারাদির ব্যবস্থা, সংসারের অপরাপর পরিজন বর্গের মতন যা তা ছিল না। নিজের ব্যবস্থা খুব ভাল রকমই ছিল। আর শয্যার সাজ সজ্জা দুগ্ধ-ফেন-নিভ না হউক, কোন অংশে মন্দ বা অসুখকর ছিল না। নিজ দেহ ও ইন্দ্রিয়ারামের জন্য এই কএকটি বিষয়েই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। লক্ষ লক্ষ বাধা, বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও এগুলির কোনটীকে জীবন কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিত না।

জীবনকে এক দিনের জন্যও অর্থ হীন হইতে হয় নাই। কারণ পাটোয়ারের ন্যায় জীবনের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ও বক্র ছিল। সেই প্যাঁচোয়া বুদ্ধি খেলাইয়া,

জীবন ছলে, বলেও কলে কৌশলে, লোকের প্রোথিত অর্থ বাহির করিয়া লইত। পরস্ত্রী দেখিলেই জীবনের মন চঞ্চল হইয়া উঠিত। যতক্ষণ না তাহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিত, ততক্ষণ জীবনের চঞ্চল মন কিছুতেই স্থির হইত না। কিন্তু জীবনের বাহাদুরী ছিল এই যে, জীবন কখন কাহারও ধন সম্পত্তি চুরি করিয়া বা বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিত না। যাহার ধন সম্পত্তি তাহার হাত দিয়াই, পাটোয়ারী বুদ্ধির কৌশলে ফাকী দিয়া বাহির করিয়া লইত।

জীবনের মুখে মিষ্টতার ভেয়ান করা, কপট মিত্রতা সংস্থাপনের অতি অপূর্ব্ব সন্দেশ; আর অন্তরে, ঘনীভূত করা, শত্রুতা সাধনের, ভীষণ হলাহল। এই কালকূট সদৃশ হলাহলের সঙ্গে ঐ অপূর্ব্ব সন্দেশের এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, লোভে ভুলিয়া যিনি একবার গলাধঃকরণ করিতেন, তিনি তদ্দণ্ডেই জ্ঞান থাকিতেও অজ্ঞানের ন্যায় হইয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইতেন। অর্থাৎ জীবনের মিষ্ট বাকপটুতা শ্রবণ করিবা মাত্রই লোককে যেন ভেল্কী লাগিয়া যাইত, আর ভেল্কীতে ভুলিয়া লোক স্বহস্তে জীবনের হস্তে সর্ব্বস্ব তুলিয়া দিত ও অবশেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইত। জাল জুয়াচুরিতেও জীবন বিলক্ষণ পটু ছিল। জীবনের কৃত জাল ফেরাপিতে পড়িয়াও অনেককে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, জীবন যাহা কিছু ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিল, সকলই কেবল কুটিলতা কপটতাদি অসদুপায় অবলম্বন করিয়া। জীবনের সংসারে লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধু, কন্যা, জামাতা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, ভগিনী, ভাগিনেয় দাস, দাসী ইত্যাদি করিয়া সর্ব্বরকমে প্রায় ৪০।৪৫ জন হইবেক। ইহাদের সকলের ভরণ পোষণ সকল সময় জীবনকে করিতে হইত না বটে। যাহা হউক, অবস্থার পরিবর্ত্তনে জীবন ক্রমশ বৃদ্ধ হইয়া পড়িল। এই বৃদ্ধ অবস্থায় জীবন এক দিন তাহার সুসজ্জিত প্রমোদ প্রাসাদে পৌত্র পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহিত্রী দিগকে লইয়া ক্রীড়া কৌতুকাদি করিতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ কএকজন রাজ দূত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা হাতে লইয়া জীবনের প্রমোদ প্রাসাদে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করিল এবং ক্রীড়া কৌতুক পরায়ণ জীবনকে ভীষণ পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিল। দুই তিন দিন অবিশ্রান্ত বল প্রয়োগের পর জীবনকে পরাস্ত করত গন্ধবহ বায়ু যেরূপ পুষ্প হইতে গন্ধকে অবলীলা ক্রমে বহন করিয়া লইয়া

যায়, রাজদূতগণও সেইরূপ অদৃশ্য ভাবে ও অবলীলাক্রমে জীবনকে লইয়া রাজ দরবারে উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ মস্তকোপরি কুলীশ পাত সম এই দুর্ঘটনা দেখিয়া আত্ম সুখাভিলাষী ও আত্ম সুখাভিলাষিনী জীবনের পরিজন বর্গ স্ব স্ব সুখের ভাবী বিঘ্ন ভাবিয়া সুখদাতা জীবনের জন্য মস্তকে ও বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কেবল রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল। পরন্তু জীবনের উদ্ধারার্থ কেহই কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারিল না। ক্ষণকাল পরেই কতিপয় প্রতিবাসী ও অন্যান্য কএকটী আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে জীবনের আগার খানি পোড়াইয়া দেওয়া হইল।

রাজাদেশে কিছু দিন হাজতে থাকিবার পর জীবনের বিচার আরম্ভ হইল।

বিচার আরম্ভ হইবার দিন বিচার পতি অপরাধীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে জীবনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, "তুমি আত্মারাম বিশ্বাসকে হত্যা করিয়াছ বলিয়া, তোমার নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত ইহার বিচার করিবার নিমিত্তই তোমাকে আসামী রূপে এই বিচারালয়ে হাজির করা হইয়াছে।" তুমি দোষী কি নির্দ্দোষী ?

জীবন। হুজুর! আমি এই হত্যার কিছু মাত্রই অবগত নহি। সুতরাং নির্দ্দোষী।

বিচার পতি। নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করাইবার সাক্ষী তোমার আছে ?

জীবন।—হুজুর! অতি অল্প সংখ্যক সাক্ষীই আছে। বেশী কেহ এখানে উপস্থিত নাই।

বিচার পতি। কতজন সাক্ষী উপস্থিত এবং সাক্ষীগণের নাম কি বল।

জীবন। হুজুর! আমার সাত জন মাত্র সাক্ষী উপস্থিত আছে। তাহাদের নাম:—১। লোচন চৌকিদার। ২। শোণা মণ্ডল। ৩। বাসানন্দ। ৪। রসিক পাত্র। ৫। গুরু সেবক কর। ৬। চরণ ভূয়ে। ৭: চিত্তরঞ্জন গুপ্ত। হুজুর! শয়নে, ভোজনে, গমনে, উপবেশনে, সর্ব্বত্রই ইহারা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। আমি যে হত্যা অপরাধে অপরাধী নয়, তাহার প্রমাণ ইহাদের জবানবন্দিতেই প্রকাশ হইবেক। অধিক আর কি বলিব।

বিচারপতি সরকার তরফের উকীল চিত্ত-প্রকাশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আসামী পক্ষের সাক্ষীগণের জবান বন্দি লওয়া হউক।" চিত্তপ্রকাশ বাবু অতি আনন্দের সহিত বিচারপতিকে অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন ও আসামী পক্ষের প্রথম সাক্ষী লোচন চৌকিদারকে হাজির করিবার নিমিত্ত বিচারালয়ের জনৈক চাপরাশীকে আদেশ করিলেন। চাপরাশী আদেশ পাইবা মাত্রই, প্রথম সাক্ষী লোচন চৌকিদারকে লইয়া বিচারালয় মধ্যে উপস্থিত হইল এবং সাক্ষীকে যথারীতি সত্যপাঠ পড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড় করাইয়া দিল।

সরকারী উকীল। তোমার নাম কি?

প্রথম সাক্ষী। আজ্ঞে, আমার নাম লোচন চৌকিদার।

সরকারী উকীল। তুমি কি কাজ করিতে?

লোচন চৌকিদার। আজ্ঞে আমি পাহারা দিতাম।

সরকারী উকীল। ঘুমাইয়া না জাগিয়া?

লোচন চৌকিদার। আজ্ঞে জাগিয়া।

সরকারী উকীল। তবে খুন হইল কেমন করিয়া?

লোচন চৌকিদার। খুন কেমন করিয়া হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।

সরকারী উকীল। তা যদি বলিতে পার না, তবে জীবনের সঙ্গে থাকিয়া করিতে কি?

লোচন চৌকিদার। আমাকে যা দেখিতে বলিত আমি তাই দেখিতাম।

সরকারী উকীল। আচ্ছা তুমি এত দিন জীবনের সঙ্গে থাকিয়া কি দেখিয়াছ বল?

লোচন চৌকিদার। সার কিছুই দেখি নাই, সকলই অসার দেখিয়াছি।

সরকারী উকীল। সারই বা কাহাকে বল আর অসারই বা কাহাকে বল?

লোচন চৌকিদার। আজ্ঞে, সৎবস্তুই সার, আর তা ছাড়া সকলই অসার।

সরকারী উকীল। সৎবস্তু কাহাকে বলা যায়?

লোচন চৌকিদার। আজ্ঞে সৎবস্তু বলিতে এক মাত্র পরাৎপর ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবানকে বুঝায়। এই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান ভিন্ন সকলই অবস্তু।

সরকারী উকীল। তাহা হইলে সেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবানকে তুমি দেখ নাই ?

লোচন চৌকিদার। আজ্ঞে না।

সরকারী উকীল। তবে তুমি জাগিয়া পাহারা দিয়াছ কেমন করিয়া বলিলে ? সার বস্তু যখন দেখিলে না, তখন তুমি যে জাগিয়া পাহারা দিয়াছিলে তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব ?

লোচন চৌকিদার। হুজুর! আমি মিথ্যা কিছুই বলিতেছিনা। পাহারা প্রকৃতই জাগিয়া দিয়াছি ; তবে হত্যা, কখন —কোথায়—কি প্রকারে হইয়াছে, তাহার খবর কিছুই জানি না।

সরকারী উকীল। তুমি অন্ধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, ভালমন্দ খবর কিছুই দেখিতে পাও নাই। যাও আর তোমার কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। যাহা আবশ্যক তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রথম সাক্ষীকে বিদায় দিয়া, দ্বিতীয় সাক্ষী শোণা মণ্ডলকে হাজির করিবার নিমিত্ত চাপরাশীকে আদেশ করা হইল। যথা সময়ে চাপরাশী দ্বিতীয় সাক্ষীকে আনিয়া রীতিমত সত্যপাঠ পড়াইল ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড় করাইয়া দিল।

সরকারী উকীল। তোমার নাম কি ?

দ্বিতীয় সাক্ষী। আজ্ঞে, আমার নাম শোণা মণ্ডল।

সরকারী উকীল। তুমি কি কাজ করিতে ?

শোণা মণ্ডল। আমি জীবনের সঙ্গে থাকিয়া, যেখানে যা কিছু কথা বার্ত্তা জীবন কহিত ও শুনিত তা সকলই শুনিতাম।

সরকারী উকীল। আচ্ছা খুনের কথা কিছু শুনিয়াছ বল ?

শোণা মণ্ডল। অ্যাঁ! খুন! খুন কি !! কৈ আমি সেথা কিছুই শুনি নাই।

ক্রমশঃ।

১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। ফাল্গুন, ১৩২০।

ভক্তি।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

ভক্তির্ভগবত সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

"ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল" কর্ত্তৃক পরিদর্শিত।

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভক্তি কার্য্যালয়,
ভাগবতাশ্রম, কোঁড়ার বাগান, হাওড়া
হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হাওড়া
ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টীং ওয়ার্কস্
হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা। প্রতি খণ্ড ৵০ দুই আনা।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
প্রার্থনা	শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৭৭
অপ্রাকৃত নবীন মদন	শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু।	১৯৭
যদি ভুলে যাই নাম	শ্রীমহেচন্দ্র শর্ম্মা	১৮৫
শ্রীল বংশীবদন	শ্রীহরিদাস গোস্বামী	১৮৫
শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম্ম-গৌরব!	শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ	১৯৩
প্রপন্নের প্রার্থনা	শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য	১৯৯
সম্পাদকীয়		২০২
কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ।	শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়	২০৪

ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে আবার তিন মাসের জন্য,

ভক্তির গ্রাহকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ।

আগামী ৩০শে বৈশাখের মধ্যে যিনি ১৲ টাকা জমা দিয়া ভক্তির বর্ত্তমান ১২শ বর্ষের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তিনি বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত ভক্তিতো পাইবেনই অধিকন্তু নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী বিশেষ সুলভ মূল্যে পাইবেন। মনে রাখিবেন বিশেষ আগ্রহে মাত্র তিন মাসের জন্য।

পুস্তকের নাম।	সাধারণ মূল্য।	গ্রাহকের পক্ষে।
প্রীতি (ধর্ম্মভাবোদ্দীপক গীতি কাব্য)	।৴০	।০
অমিয়া বিন্দু	॥০	।৶০
শ্রীচৈতন্য চরিত্র	৶০	৴০
অবধুত নিত্যানন্দ	৶০	৵১০
হরিবোল (গীতপঞ্চবিংশতি উপহার সহ)	১৲	॥০
বৈষ্ণবদর্পণ (১ম ও ২য় ভাগ একত্রে)	১৲	৸০
দম্পতীদর্পণ	।৴০	।০
৩য় বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষের ভক্তি একত্রে পৃথক ভাবে বাঁধান	৯৲	৭৲
প্রতি বর্ষ	১৲	৸৴০
শ্রীনবন্ধু বেদান্তরত্ন মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি	৶০	৵০

প্রত্যেক পুস্তকের ডাক মাশুল পৃথক একত্রে সমস্ত গুলি লইলে ডাঃ মাঃ অর্দ্ধেক লাগে। অধিক সংখ্যক বিক্রয় কারিকে কমিশনও দেওয়া হয়।

ঠিকানা—

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভাগবতাশ্রম, ভক্তি কার্য্যালয়, কৌড়ার বাগান, হাওড়া।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি

ভক্তি।

১২শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ফাল্গুন। সন ১৩২০ সাল।

প্রার্থনা।

—:০:—

ভক্তি হীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখ শোকাতুরং প্রভো!
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন॥

হে দয়াময় প্রভো! আমি নিতান্তই ভক্তিহীন, তাই দুঃখে ও শোকে অতিশয় কাতর হইয়া আশ্রয়হীন অবস্থায় তোমার সর্ব্ব-সন্তাপহারী অভয় পদ-যুগলে আশ্রয় লইলাম, হে অনাথবন্ধো! হে মধুসূদন! আমায় কৃপা কর।

বিপদবারণ! মনে বড়ই সাধ হয় যে, সর্ব্বদা তোমাকে ডাকি, সর্ব্বদা তোমার ভাবে থাকি, কিন্তু অনন্ত লীলাময়! তোমার যে কি লীলা— কি চক্র তাহা বুঝিতে পারিনা, জল বিম্বের ন্যায় আমার মনের আশা মনেই লয় হইয়া যায়, কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। কত রকম প্রতিকূল অবস্থা যে অলক্ষিত ভাবে আমার হৃদয়ে লুক্কাইত আছে তাহার অন্ত নাই। সাজিয়া গুজিয়া তোমাকে ভাবিব, তোমাকে ডাকিব, প্রাণ ভরিয়া একটু তোমার নামগুণ কীর্ত্তন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব বলিয়া যেমনই উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, অমনিই কোথা হইতে যে নানারূপ ভাবনা চিন্তা আসিয়া তাহাতে বিক্ষেপ জন্মায় তাহা বুঝিতে পারিনা। তাহাদের এমনই আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি যে, একবার কোনও প্রকারে হৃদয়ে প্রবেশ করিলে কর্ম্মক্ষম আমার ইন্দ্রিয় সকল সমস্ত কার্য্য ভুলিয়া একেবারে তাহাদের দাস হইয়া পড়ে, তখন বহু যত্নেও সেই চঞ্চল ইন্দ্রিয় গুলিকে ঠিক ভাবে পরিচালনা করিতে পারি না।

নানা প্রকারে ভুগিয়া ভুগিয়া ও সাধু গুরু বৈষ্ণবের অযাচিত অপরিসীম দয়া বলে আমার এইটুকু বিশ্বাস হইয়াছে যে, তোমার কৃপা শক্তি ভিন্ন, আমার ভজন, সাধন, স্মরণ, মনন কিছুই হইবার উপায় নাই। তাই আজ ব্যথিত হৃদয়ে কাতর ভাবে প্রার্থনা যে, নদীর বেগ যেমন শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কি জন সমাজে কি নির্জ্জন বন পথে তরতর বেগে তাহার প্রাণ স্বরূপ সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহার যেমন কাহারও নিন্দা বা স্তুতিতে সেই বেগ সম্বরণ হয় না, কেহ তাহাকে দেখুক বা না দেখুক সে যেমন দিবারাত্র গ্রাহ্য না করিয়া মাস, ঋতু, পক্ষাদির অপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বদাই উত্তরোত্তর প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, হে কৃষ্ণ! আমার হৃদয়ের বেগও সেইরূপ ভাবে যাহাতে নিরন্তর তোমার দিকে চালাইতে পারি তদনুরূপ শক্তিদাও। সাংসারিক নানাবিধ বিঘ্ন বাধাতেও যেন সাধন প্রবৃত্তি নিবৃত্তা না হয়। তোমার কৃপাশক্তি না পাইলে এই দুর্ব্বল হৃদয়ের বেগ নিরন্তর তোমাতে কিছুতেই রাখিতে পারিব না। বড়ই বিপদে পতিত, নাথ! একবার কৃপা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ যে, ভুগিয়া ভুগিয়া অসার ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া,— তোমার সাধনের দেহ, তোমাকে লাভ করিয়া ধন্য হইবার দেহ আজ কতদূর জঘন্য হইয়াছে, আজ কাতর প্রাণে দীনহীন তোমার শরণাগত আমাকে দয়া করিয়া শক্তি দাও।

আর একটী প্রার্থনা নাথ! যেন শক্তি দিয়া অপক্কাবস্থাতেই অমনি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিওনা? একেইতো এইসকল বিঘ্ন বিক্ষেপের জ্বালায় অস্থির ইহার উপর যদি তুমি আবার পরীক্ষা করিতে আরম্ভ কর অর্থাৎ বিঘ্নের উপর বিঘ্ন, বিক্ষেপের উপর বিক্ষেপ দিয়া ভাব পরীক্ষা করিতে চাও, তবে আর নিস্তার নাই। আমাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই উচ্চ মনুষ্য শ্রেণী হইতে ঘৃণীত কৃমি কীটে গিয়া পড়িতে হইবে। আমি ছাত্র, তুমি গুরুমহাশয়, যদি নিতান্তই পরীক্ষার ইচ্ছা হয় তবে আগে ভালরূপে শিক্ষা দাও, শিক্ষা পরিপক্ক হইলে তারপর যথেচ্ছা পরীক্ষা করিও, অপক্কাবস্থায় পরীক্ষা করিয়া হতাশ ও অমঙ্গল রূপ বিষময় ফল ফলাইওনা। এক্ষণে আমাকে এমন ভাবে শিক্ষা দাও যাহা-দ্বারা তোমার ভাবের, তোমার মহিমার, তোমার অচিন্ত শক্তিময় প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয়ে বদ্ধমূল সংস্কার জন্মাইতে পারি, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় সকল কার্য্যের নিয়ন্তা এই ভাবটী দৃঢ় ভাবে ধারণা হইবার পরে তোমার

যত ইচ্ছা হয় পরীক্ষা করিও। এক্ষণে আর বিপদের উপর বিপদ দিয়া স্বভাবতই যে চঞ্চল চিত্ত তাহাকে আরও চঞ্চল করিওনা। ইহাই আমার তোমার নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা।

ভাবের প্রতিরোধক বিক্ষেপ সকল দূর করিয়া তোমার প্রতি একান্ত নির্ভরতা দাও, দুর্নিবার সংসার চক্রের ঘোর পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়াও যেন মনকে তোমার অভয় পদ মূলেই নিযুক্ত রাখিতে পারি। অন্তর্য্যামিন্! অন্তরের যথার্থ বেদনা জানিয়া দীনহীনকে দয়া কর।

"দয়াকর হে দীনবন্ধু এ অধম দীনজনে।
কৃপাকরি দাওহে দেখা এ আতুর অধমে॥
(বৃথা) গেল নাথ জনমতো, তোমার দেখা পেলামনাতো
দাওহে আমায় ভাব নেত্র
দেখি তোমায় হৃদাসনে॥
(আমার) হৃদাকাশে সচ্চিদানন্দ উদয় হ'য়ে দাও আনন্দ
(তোমায়) দেখি বাড়িবে আনন্দ
পূজিব নাথ সযতনে॥"

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অপ্রাকৃত নবীন মদন।

[শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু লিখিত।]

—:০:—

কৃষ্ণভক্তি রসভাবিতামতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র মূল্যমপি লৌল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

দুর্লভ মানব জীবনের সর্ব্ব গুহ্যতম রহস্য উদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে পরম মঙ্গলালয় লোকপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর যখন সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ সিদ্ধ ভক্ত

রায় রামানন্দকে কৌশলে জীবের সাধ্য সাধন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে ছিলেন, তখন সেই গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে উল্লিখিত পরম গুহ্য বিদ্যাটী প্রকটিত হইল। পুরুষার্থ সঞ্চয়ই মানব জীবনের একমাত্র প্রয়োজন। নিরীহ উদ্ভ্রান্ত জীব অসত্যকে সত্য বুঝিয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় লাভার্থে কর্ম্ম কাণ্ডে এবং জ্ঞান কাণ্ডে যাইয়া মজিতেছে, ফল যেমন বন্ধন তেমনই থাকিতেছে তবে হয়তো লৌহ শৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে সুবর্ণ শৃঙ্খল জুটিতেছে। "ভুক্তি মুক্তি" স্পৃহা অশান্ত জীবকুলকে আরও অশান্তি প্রদান করিতেছে—ঐই দেখ—

কেহ সুখে কেহ দুঃখে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তি গন্ধ নাই যাতে যায় ভব রোগ॥

তাই প্রথমে আগ্ড়োম্ বাগ্ড়োম্ বলিয়া রায় রামানন্দ এতক্ষণে আসল কথাটি বলিতেছেন; অবিদ্যা মোহাচ্ছন্ন জীব শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ না বুঝিয়া আরও বিপন্ন হইতেছে

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমো ধর্ম্ম॥

সুতরাং প্রকৃত পুরুষার্থ কর্ম্মকাণ্ডে বা জ্ঞানকাণ্ডে নাই। চরম পুরুষার্থ হইল প্রেম।

কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ তার নহে একবিন্দু॥

সেই সচ্চিদানন্দধাম, পুরুষার্থ-শিরোমণি, প্রেমচিন্তামণি পাইতে হইলে বিষয়াসক্ত দুষ্ট মনটীকে কৃষ্ণ-ভক্তি-রসের ভাবনা দিয়া উহাকে একেবারে রসগোল্লার ন্যায় কৃষ্ণ-ভক্তি-রস ভাবিত করিতে হইবে, যেমন

কাম কিঙ্কর যখন প্রাকৃত কামে মোহিত হয় তখন তাহার দেহ, মন, বুদ্ধি একেবারে কাম রসে ভাবিত হইয়া তাহাকে পশু করিয়া ফেলে তাহার উত্তমা বুদ্ধির বিকৃতি সঙ্ঘটন হয় সংযম প্রয়াসী মন অসংযত হইয়া ক্ষেপিয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে দেহ বিকল হইয়া পড়ে তাই বেদকর্ত্তা সর্ব্বলোকগুরু ব্রহ্মাকে কামান্ধ ষণ্ডের ন্যায় কন্যার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রধাবিত দেখিতে পাই, ইন্দ্র চন্দ্রের ত কথাই নাই মহাযোগীন্দ্র সর্ব্বত্যাগী শম্ভুকেও মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে আত্মহারা পাগল হইতে দেখি বাস্তবিক রস ভাবিত চিত্ত হইলে তখন জীবের আত্ম সংযমের শক্তি আদৌ থাকে না তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় অবাধ্য হইয়া পড়ে, জীব সর্ব্বদা তদ্ভাবে ভাবিতমতির গোলাম হইয়া পড়ে। সহস্র বর্ষ তপস্যার ফল নিমিষে বিনষ্ট হয়। এইত গেল কামরসের কথা ইহাইত আমাদিগকে মজাইতেছে, প্রাকৃত কামান্ধ হইয়া আমরা অবস্তুকে বস্তু করিয়াছি, অকর্ম্মকে সুকর্ম্ম করিয়াছি কাঁচকে কোহিনুর করিয়া গরবে চক্ষু লাল করিয়া আছি দেবতার সুপবিত্র রতন সিংহাসনে মায়ার মোহিনী মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কায় মন প্রাণ তাহারই আরাধনায় মজিয়া আছে। আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াই ভক্ত প্রবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছেন—

কামে মোর হত চিত, নাহি মানে নিজ হিত
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।

এইত গেল কামরস ভাবিত চিত্তের চিত্র। ভগবৎ কৃপা হইলে এই চিত্র উল্‌টিয়া যাইতে বেশী বিলম্ব হয় না। চিন্তামণি স্পর্শ মাত্রেই লৌহ কাঞ্চন হইয়া যায়। কৃষ্ণ কৃপায় কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত রস আসিয়া জীবের প্রাকৃত-রস-দুষ্ট চিত্তেন্দ্রিয় কায়কে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, কামের স্থান প্রেম আসিয়া দখল করিয়া লয়। মায়াদেবীর সেই অতি পুরাতন ভৃত্যটী তখন প্রেমরস ভাবিত হইয়া দিব্য শক্তি সম্পন্ন হয়, চৌরাশীতিলক্ষ জীবনের অতি প্রিয় ভোগ্য বস্তুগুলিকে দূরে—অতি দূরে পরিহার করে, মায়ারচিত সুদৃঢ় সুবর্ণ শৃঙ্খলগুলি হাসিতে হাসিতে টুক্ টুক্ করিয়া কাটিয়া ফেলে, তাহার সেই প্রেমোজ্জ্বল দিব্য মূর্ত্তির নিকট পাপ প্রলোভন আর টিকিতে পারেনা যেন দেহ ধর্ম্ম, লোক ধর্ম্ম, বেদ ধর্ম্ম ইহকাল পরকাল একে একে সরিয়া পড়ে। রসো বৈ সঃ তাহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন

তাই সেই ভাগ্যবান পূর্ণমাত্রায় কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিত হইয়াছেন। এই রস ভাবিত মতির সর্কোত্তম চিত্রটী মানস নেত্রের সম্মুখে রাখিয়া রসাচার্য্য শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী এহ রস বিকারে বিভিন্ন পর্য্যায়ের বিভিন্ন অবস্থা কিরূপ নিপুণতার সহিত অঙ্কন করিয়াছেন দেখুন, কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী শ্রীমতী রাধা-রাণীর চিত্রে ইহার দশটী দশা যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে জীবে সে সব ভাব বিকাশের পূর্ণাভিব্যক্তি অসম্ভব।

লালসোদ্বেগ জাগর্য্যাস্তানবং জড়িমাত্রতু।
বৈয়গ্রং ব্যাধি রুণ্যাদো মোহোমৃত্যুর্দ্দশাদশ॥

(১) লালসা (২) উদ্বেগ (৩, জাগরণ (৪) কৃশতা (৫) জড়িমা হিতাহিত জ্ঞান রাহিত্য ও শ্রবণাদির জড়তা (৬) বেয়গ্র অর্থাৎ দুর্ব্বার ক্ষোভে চিত্ত চাপল্য (৭) ব্যাধি অর্থাৎ ইষ্ট বস্তু অপ্রাপ্তি হেতু শরীরের পাণ্ডুবর্ণতাও উষ্ণতা (৮) উন্মত্ততা (৯) মোহ (১০) মৃত্যুর উদ্যম। এইদশবিধ লক্ষণ কৃষ্ণ-রস-ভাবিতা মতিতে লক্ষিত হয়।

গৃহকর্ম্মানুরতা কুলবধুর শ্রুতিমূলে মুরলী বাজিয়া উঠিল কর্ণরন্ধ্র দিয়া সে মধুর মুরলীরব-মাধুরী মরমে পশিয়া একটা উলট্ পালট্ বাধাইয়াদিল প্রবল লালসায় শ্রীমতী উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন—

অপরূপ তুয়া মুরলীর ধ্বনী।
লালসা বাড়ল শবদ শুনি॥

লালসা বাড়িয়া বংশীধারীকে দেখাইবার ফন্দী করিল সরলার মন "কোন্ বনে মুরলী বাজে চলো দেখে আসিগে" বলিতে লাগিল, গুরুগরজন লাজ ভয় ইত্যাদি বাদীর সহিত সংগ্রাম চলিতে লাগিল শেষে বালিকা স্থির করিল "না হয় ত্যাজি লাজে যাই যে বনে মুরলী বাজে" তখন অবোধিনী ফাঁদে পড়িয়া গেল সেই শ্রীযমুনা কুলে নীপতরুমূলে নীরদ বরণ কি দেখিয়া উদ্বেগে ধনী অস্থির হইয়া পড়িল, মনপ্রাণ আকুল হইয়া পড়িল।

কিরূপে এরূপ দেখিয়া কেহ।
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ॥

উদ্বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে দেহধর্ম্ম বিদূরিত হইতে লাগিল জাগরণ ও কৃশতা আসিয়া উপস্থিত হইল।

জাগিয়া জাগিয়া হইল ক্ষীণ।
অসিত চাঁদের উদয় দিন॥

ক্রমেই সেই রোগের শ্রীবৃদ্ধি—

জড়িত হৃদয় করিয়া ভেদ।
অতি বেয়াকুল কো সহে খেদ॥

জড়িমা ও বেয়গ্র আসিয়া সবলার দেহ মনকে একেবারে গ্রাস করিল, ব্যাধির নিবৃত্তি জন্য সহচরিবৃন্দ কতনা শুশ্রুষা করিতেছে সময় ক্রমে তাহা হিতে বিপরীত হইতেছে পদ্মপত্রের সংস্পর্শে দেহ শীতল না হইয়া আরো উষ্ণ-তর হইতেছে, শৈত্য করিতে উন্মত্ততা দেখাদিল বিষ্ণুতৈলের নাম শুনিতে মোহ আসিল অবশেষে হেম বরণীর কনক কান্তি সাদা হইলেন। নিশ্বাস বায়ুর রোধ হইল এই ত বুঝি সেই দশম দশা—মৃত্যুর্দ্দশা।

পাণ্ডুর বরণ বেয়াধি বাধা।
মুরছি নিশ্বাস তেজস রাধা॥
অব যদি তুহুঁ মিলন তায়।
গোকুল মঙ্গল সবহি গায়॥

কবি বলিতেছেন এই কৃষ্ণভক্তি রসভাবিতাকে বাঁচাইবার অন্য ঔষধ নাই ঔষধ কেবল ঐ শ্যাম নাম—

জ্ঞানদাস কহে শুন হে শ্যাম।
জীবন ঔষধ তুঁহারি নাম॥

ইহাকেই বলে কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতা মতি। কিন্তু ইহা মিলিবে কিরূপে রাম রায় বলিতেছেন এই অমূল্য নিধির অন্য কোন মূল্য নাই ইহার একমাত্র মূল্য হইতেছে লৌল্য অর্থাৎ প্রবল লালসা এই লালসাটী কোথায় মিলিবে? কোটী জন্মের সঞ্চিত পুণ্যেও সেই দুর্লভ বস্তু মিলেনা। দিগ্‌দিগন্ত প্রসারিণী খর স্রোতা পদ্মানদীর মুলানুসাধন চেষ্টায় আমরা যদি উজানগতিতে যাইতে থাকি তবে যেমন দেখিব গোমুখীর অফুরান্ত উৎসই ঐ বিশাল জলরাশীর মূল আকর তদ্রূপ এই কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর মূল খুজিলে আমরা দেখিতে পাই মূলে রসো বৈ সঃ শ্রীনন্দদুলাল—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম গায়িত্রী কামবীজে যায় উপাসন ॥

অপ্রাকৃত ধামের এই অপ্রাকৃত কামদেব আমাদের সর্ব্ব-প্রকার অপ্রাকৃত কামনার অধীশ্বর তিনিই রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ। তাঁহার রূপ অনন্ত গুণ অনন্ত মাধুর্য্য ও অনন্ত।

তাঁহার পরিচয় ভাষায় বর্ণনা কে করিবে? তবে ভজননিষ্ঠ লীলারসে নিমগ্ন কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা বলিয়াছেন তাহাই আপনাদিগকে উপহার দিতেছি—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃত জগৎপীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥

কৃষ্ণরূপ শব্দ স্পর্শ সৌরভ্য অধর রস
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভিত পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন
চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিগে ধায় ॥
সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয় গণ মহালম্পট দস্যুগণ
সবে করে হরে পরধন ॥
এক অশ্ব এককক্ষণে পাঁচ পাঁচদিকে টানে
এক মনকোন্ দিকে যায়।
এক কালে সভে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
এ দুঃখ সহেন না যায় ॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ ইহাঁ সভার কাহা দোষ
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাচে টানে গেল পাঁচের পরাণে
মোর দেহে না রহে জীবন ॥

যদি ভুলে যাই নাম।

—:০:—

সংসারে সংসারী সাজা
বুঝিয়াছি কি যে সাজা
আর না বুঝা'তে হবে গৌর গুণ ধাম!
যা হবার হ'ল শেষ
যে'তে হ'বে দূর দেশ
এখন করিতে দাও একটু বিশ্রাম।
খে'টেছি খাটুনী খুব
তাতেও করি না দুঃখ
নামেই-প্রাণের কত হ'য়েছে আরাম।
কিন্তু প্রভু এক ভয়
আগেই কহিতে হয়
তখনো হইতে পারে এ অদৃষ্ট বাম,
অন্তিম সময়ে যদি ভু'লে যাইনম?

দীন—শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীল বংশীবদন।

[পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস গোস্বামী লিখিত।]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

—:০:—

ইহার কিছু দিন পরে ঠাকুর বংশীবদন তীর্থ পরিভ্রমণ উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। এই সময়ে তিনি নানা স্থানে শ্রীকৃষ্ণের রসরাজ মূর্ত্তির মধুর ভজন তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তীর্থভ্রমণ-ছলে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম জনসাধারণে প্রচার করেন। এই সূত্রে তাঁহার সহিত জগদানন্দ, গোকুল, মোহন, মনোহর, শ্যামদাস প্রভৃতি গৌরভক্তগণের

বিশেষ পরিচয় ও সখ্যতা হয়। এই সকল মহাজনগণ ঠাকুর বংশীবদনের শিষ্য শাখা বলিয়া বিখ্যাত।

সেই কালে নিজ শাখা করেন প্রকাশ।
তাহাদের নাম করি করিয়া নির্য্যাস ॥
শ্রীজগদানন্দ আর গোকুল মোহন।
মনোহর শ্যামদাস আদির গণন ॥ বং, শিঃ।

তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, নানাস্থানে শিষ্য শাখা প্রকাশ করিয়া ঠাকুর বংশীবদন নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অপ্রকট সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বংশী বদন ঠাকুর এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে তাহার দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছিল, এক্ষণে দেবীর অদর্শন জনিত শোকে প্রাচীন দেহ একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল; ভগ্নদেহ আরও ভগ্ন হইয়া পড়িল। দারুণ দুঃখে ঠাকুর বংশীবদন আর প্রাণ ধারণ করিতে পারিলেন না।

এক দিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাহাকে বলিতেছেন "ওহে বংশী তুমি এক্ষণে লীলা সংবরণ কর। তুমি কি পূর্ব্বের কথা সকল ভুলিয়া গিয়াছ?" প্রভুর এই স্বপ্নাদেশে ঠাকুর বংশী বদনের পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। তিনি মনে মনে প্রভুকে কোটী কোটী প্রণাম করিয়া পীড়ার ছল করিয়া দুই পুত্রকে ডাকিয়া তাহাকে গঙ্গা তীরস্থ করিবার আদেশ দিলেন।

এই মতে কিছুদিন অতীত হইল।
এক দিন স্বপ্নে গোরা বংশীরে কহিল ॥
ওহে বংশী এই লীলা কর সম্বরণ।
ভুলিয়া গেছ কি মোর সে সব বচন ॥
স্বপ্নেতে প্রভুর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
জাগিয়া মনেতে ভাবে শ্রীবংশী বদন ॥
এমন দয়াল প্রভু না দেখি ভুবনে।
ভুলিলেও নাহি ভুলে নিজ ভৃত্য জনে ॥
রজনী প্রভাত হৈলে পীড়া করি ছল।
দুই পুত্রে ডাকি বংশী কহেন সকল ॥

বংশী বদনের দুই পুত্র নিতাই ও চৈতন্য পিতার কথা শুনিয়া ও তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। বৈদ্যরাজকে ডাকিয়া আনা হইল। বৈদ্যরাজ ঠাকুর বংশীবদনের অবস্থা দেখিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে আদেশ দিলেন। ঠাকুর বংশী বদনের তখনও দিব্য জ্ঞান। তিনি পুত্রদ্বয়কে ধর্ম্মোপদেশ দিতে দিতে কহিলেন।

বংশী কন ওরে পুত্র নিতাই চৈতন্য।
ত্রিমূর্ত্তির সেবা কর হইয়া অনন্য॥

পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্র করিলে বিচার।
সিদ্ধ হয় কৃষ্ণ মূর্ত্তি চিন্ময় আকার॥

রসরাজ কৃষ্ণ মূর্ত্তি অপ্রাকৃত হয়।
তোমাদের কাছে এই কহিনু নিশ্চয়॥

তাহার পর ঠাকুর বংশী বদন পুত্রদ্বয়কে কহিলেন "অদ্য নিশাসুখে আমি এ দেহ ত্যাগ করিব।"

তবে তিনি কন আমি অদ্য নিশা সুখে।
এ দেহ ছাড়িব দেখি নাহি পাও দুঃখে॥

ঠাকুর বংশী বদনের প্রফুল্ল বদন সর্ব্বাঙ্গে দিব্য জ্যোতি নির্গত হইতেছে। দিব্য জ্ঞানে তিনি নিজ পরিবার বর্গের সমক্ষে এই সকল কথা কহিলেন। এই কথা শুনিয়া সকলেই আকুল হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। ঠাকুর বংশী বদনের পুত্রবধূগণ আসিয়া তাহার চরণ ধারণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ চৈতন্যের স্ত্রী বহু মিনতি করিয়া কান্দিতে লাগিলেন দেখিয়া ঠাকুর বংশী বদনের মন দ্রব হইল। তিনি জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। রোরুদ্যমানা পুত্রবধূটীকে নিকটে ডাকিয়া চুপি চুপি কহিলেন, "মাগো! তুমি কান্দিতেছ কেন? তোমার গর্ভে পুনর্ব্বায় আমি জন্ম গ্রহণ করিব। আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়াই আমি এই অঙ্গীকার করিলাম একথা তুমি কাহাও নিকট প্রকাশ করিও না।"

সেই কালে গোসাঞির পুত্রবধুগণ।
প্রভুর চরণে পড়ি করেন রোদন॥

জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যের পত্নী সাধ্বী সতী।
কান্দিতে লাগিলা বহু করিয়া মিনতি ॥
গোসাঞি কহেন মাগো কেন কাঁদ তুমি।
তোমার গর্ভেতে জন্ম লভিব যে আমি ॥
তুয়া প্রেম-বশ হঞা কৈনু অঙ্গীকার।
মোর এই কথা কাঁহা না কর প্রচার ॥

ভক্তগণ মিলিয়া হরি সংকীর্ত্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সংকীর্ত্তন যজ্ঞে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে আহ্বান করিয়া ঠাকুর বংশী বদনকে গঙ্গাতীরস্থ করা হইল। ঠাকুর বংশী বদন গঙ্গা দর্শন করিয়া গঙ্গাকে নানাবিধ স্তব স্তুতি করিলেন নিজ ইষ্ট মন্ত্র স্মরণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমময় নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ভবলীলা সংবরণ করিলেন।

হা গৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর পতিতপাবন।
হা গদাধরের প্রাণ শ্রীশচীনন্দন ॥

সে দিন গ্রহণ। ভাগীরথী তীরে গ্রহণের সময়ে ঠাকুর বংশীবদন নর-লীলা সংবরণ করিলেন। তিনি নিত্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যধামে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। ভক্তমণ্ডলী সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে যেমন সকলের মনে নিদারুণ সন্তাপ হইয়াছিল, ঠাকুর বংশীবদনের বিরহেও তাহাই হইল। সকলেই তাঁহার শোকে কান্দিয়া আকুল হইলেন। ঠাকুর বংশীবদনের পরিবারবর্গ শোকাকুল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। নদীয়াবাসী সকলেই শোকের সাগরে ভাসিত লাগিল।

গৌরাঙ্গ বিরহে যৈছে সন্তাপ সবার।
বংশীর বিরহে তৈছে এই যে প্রচার ॥

ঠাকুর বংশীবদন পঞ্চনামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীবংশীবদন, বংশী, বংশী দাস, শ্রীবদন, ও বদনানন্দ। বৈষ্ণব সমাজে তিনি এই পঞ্চনামেই পরিচিত ছিলেন।

ঠাকুর বংশীবদন বৈষ্ণব জগতে রসরাজ উপাসনা প্রচার করিয়া শ্রীশ্রীগৌ-রাঙ্গ প্রভুর আদেশ পালন করিয়া গিয়াছেন। রায় রামানন্দ ও রূপ সনাতন প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে প্রভু আমার সাধ্য সাধন সম্বন্ধে শিক্ষা ও উপদেশ

দিয়াছিলেন। কিন্তু বংশী তাঁহার পূর্ব্বাবতারের অতিপ্রিয় মোহন মুরলী। তাঁহার আবির্ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের মনে বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল এবং তাঁহাকে অতি প্রিয় নিজজন মনে করিয়াই রস-তত্ত্ব সম্বন্ধে নিগূঢ় উপদেশ দিয়াছিলেন। ঠাকুর বংশীবদনের আবির্ভাব না হইলে কলির জীব রসরাজ উপদেশ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

কুলিয়া পাহাড় গ্রামে ঠাকুর বংশীবদনের পূর্ব্বপুরুষগণের স্থাপিত শ্রী শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন। ঠাকুর বংশীবদন ও সেই গ্রামে প্রাণবল্লভ নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাঁহার প্রাণবল্লভ কে তাহা আর বোধ হয় খুলিয়া বলিতে হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরূপী প্রিয় অন্তরঙ্গ নিজজন ঠাকুর বংশীবদনের প্রাণ বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

উত্তর কালে শ্রীবংশীবদন ঠাকুর বিল্বগ্রামে যাইয়া বাস করেন। বিল্ব গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ তাঁহার জ্ঞাতি।

ঠাকুর বংশীবদন স্বভাব কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত সুন্দর পদগুলিতে তাহার কবিত্ব শক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার "দীপকোজ্জ্বল" নামে একখানি গ্রন্থও আছে। "দীপান্বিতা" নাম্নী কবিতা গ্রন্থখানি ও ঠাকুর বংশীবদনের রচিত।

ঠাকুর বংশীবদনের বংশাবলী আছে কি না জানিনা তদীয় বংশধরগণের একটী বংশ-স্তম্ভ শ্রীশ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

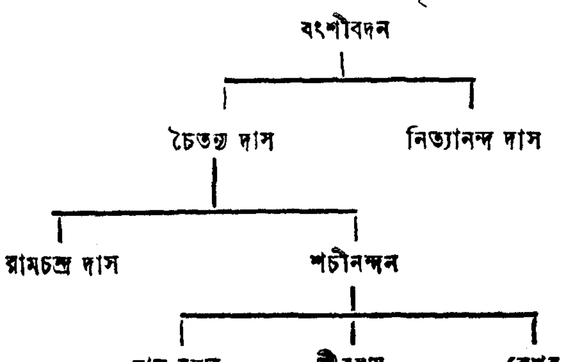

ঠাকুর বংশীবদন নিজ পুত্রবধূর গর্ভে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বা রামাই পণ্ডিত বংশীবদনের পৌত্র। শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে ঠাকুর বংশীবদন দ্বিতীয় কলেবর ধারণ করিয়া পুত্রবধূর গর্ভে রামচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারস সম্ভোগ ও প্রচার করিয়া ছিলেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রিয় শিষ্য বংশীবদন যখন রামচন্দ্র রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন তখন দেবী বালক রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য চৈতন্য গৃহে পদার্পণ করেন। সেখানে দেবীর সহিত শ্রীশ্রীজাহ্নবা ও সীতা দেবীর সাক্ষাৎ হয়। শ্রীশ্রীজাহ্নবা দেবী রামচন্দ্রকে পোষ্য পুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন এবং দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করেন।

ঠাকুর বংশীবদনের রচিত কয়েকটী পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ঠাকুর বংশীবদনের কবিত্ব শক্তির প্রভূত পরিচয় এই সকল সুন্দর পদাবলীতে জ্ঞাত হওয়া যায়। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন তাহা কলির জীবের ভজনাঙ্গ। কৃপাময় পাঠকবৃন্দকে দুই একটী মধুর পদ প্রেমোপহার প্রদত্ত হইল। আশা করি তাঁহারা ইহা আস্বাদন করিয়া সুখী হইবেন।—

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥ ধ্রু।
আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব
মহোৎসবে করে অধিবাস।
আপনে নিতাই ধন, দেই মালা চন্দন,
করে প্রিয় বৈষ্ণব সন্তোষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া, বাজে তা তা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধররে তান,
নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরিবোলে ঘনে ঘন
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।

অজি খোল মঙ্গলি, রাখিয়ে আনন্দ করি,
বংশী বলে দেহ জয় রব॥ ১॥

ভাবাবেশে গোরা চাঁদ বিভোর হইয়া।
ক্ষণে ডাকে ভাইয়া শ্রীদাম বলিয়া॥
ক্ষণে ডাকে সুবলেরে ক্ষণে বসুদাম।
ক্ষণে ডাকে ভাই মোর দাদা বলরাম॥
ধবলী শ্যামলী বলি করয়ে ফুকার।
পূরল পুলকে অঙ্গ বহে প্রেমধার॥
কালিন্দী যমুনা বলি প্রেম জলে ভাসে।
পুরব পড়িলা মনে কহে বংশী দাসে॥ ২॥

শ্রীনন্দ নন্দন, শচীর দুলাল
চলে গোঠে পায় পায়॥
রোহিনী কোঙর, নিত্যানন্দ যায়,
ভাইয়ার অগ্রেতে ধায়॥
শ্রীদাম সাঙ্গাইত অভিরাম স্বামী
গাভী বৎস লৈয়া চলে।
সুবল পণ্ডিত, গৌরী দাস আসি,
ত্বরিতে মিলিল দলে।
নবদ্বীপ আজি, গোকুল হইল,
যেন দ্বাপরের শেষ।
পরিকর সবে লইল পাঁচনি,
ধরিয়া রাখাল বেশ॥
আবা আবা রবে, ছাইল গগন
সুরগণ হেরি হাসে।
তা সবার সহ, গোঠেতে চলিল
পামর এ বংশীদাসে॥ ৩॥

জয়রে জয়রে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র, জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ, সীতানাথ দেহপদ ছায়।ধ্রু।

জয় জয় মোর, আচর্য্য ঠাকুর, অগতি পতিত গতি।
করুণা করিয়া, স্বচরণে রাখ, এ মোর পাপিষ্ঠ মতি॥

তোমার চরণ, ভরসা কেবল, না দেখি আর উপায়।
মোর দুষ্ট মনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগি তুয়া পায়॥

সদা মনোরথ, যে কিছু আমার, সকল জানহ তুমি।
কহে বংশী দাস, পূর সব আশ, কি আর কহিব আমি॥ ৪॥

শ্রীলবংশীবদন ঠাকুর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কলির অধম জীবের মাতৃমূর্ত্তি। পতিত পাবনী কলি-কলুষ-হারিণী শ্রীগৌরাঙ্গ ঘরণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আনুগত্য স্বীকার করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন সুসিদ্ধ হয়। ঠাকুর শ্রীল বংশীবদনের চরণ ধরিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপা প্রার্থী হইলে দেবী সদয় হইয়া কলিহত জীবকে শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনে অধিকার দান করেন। ঠাকুর বংশীবদন শ্রীগৌরাঙ্গের দারু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার সেবা প্রকাশক। তাঁহার জয় গান করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম। প্রভুর পরিকরগণের লীলা গান ও অনুশীলন শুধু আত্মশোধনের জন্য। ঠাকুর বংশীবদনের পবিত্র জীবনী পাঠে কলির জীবের মনে শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ভজন প্রীতির উদয় হইবে, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তত্ত্ব অনুসন্ধানের ইচ্ছা বলবতী হইবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া দাস হ'তে যদি কর মন।
চরণ ধরিয়া কান্দ শ্রীবংশীবদন।
শাশুড়ী বধূর সেবা করি দিবারাতি।
যতনে অর্জ্জিলা যেঁহো শ্রীগৌরাঙ্গ প্রীতি॥
শচী বিষ্ণু প্রিয়া দুঃখে যান গড়াগড়ি।
গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে গুমরি গুমরি॥
যেঁহো প্রভু দারু মূর্ত্তি ধামে প্রতিষ্ঠিলা।
বিষ্ণুপ্রিয়া পদে যাঁর ভকতি অচলা॥

স্বয়ং প্রকাশ যাঁর পৌত্র রামচন্দ্র।
নরোত্তম প্রাণ সখা ভ্রাতা বীরচন্দ্র॥
জাহ্নবার বরপুত্র রামাই পণ্ডিত।
বৈষ্ণব প্রধান সর্ব্ব গুণেতে মণ্ডিত॥
তাঁর পদযুগ ধরি ভজ বিষ্ণুপ্রিয়া।
যুগল ভকতি রসে জুড়াইবে হিয়া॥
বংশীবদন ঠাকুরের চরণ ধরিয়া।
দুঃখী হরিদাস গায় জয় বিষ্ণুপ্রিয়া॥

শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম্ম-গৌরব।

(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষের বক্তৃতা।)

—:০:—

যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরম শাম্যমুপৈতি॥ (মুণ্ডকোপনিষদ্)

এ মন, গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে,
হেন প্রেম পরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে,
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়ে ঘরে ঘরে॥
ভব বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি।

কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে,
বাজাইয়ে করতালি ॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকোলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥
ডাকিয়ে হাকিয়ে, খোল করতালে,
গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়ে শমন, তরাস পাইয়ে,
কপাট হানিল দ্বারে ॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে,
রতি না জন্মিল তোর ॥

বন্ধুগণ! কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আমরা ধর্ম্ম জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী। বৈদিক ধর্ম্মের প্রসূতি ভারত ভূমি ধর্ম্ম জগতের কেন্দ্রস্থল, আর এই ভারত ভূমে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অগণিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত সমূহের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, ধর্ম্মভাবের চরম বিকাশের ফল স্বরূপ শ্রীভগবানে 'প্রেম ভক্তি' রূপ যে অমৃতময় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, উহাই আমাদের সর্ব্ব প্রধান গৌরব।

জগতে অসংখ্য ধর্ম্মমত বর্ত্তমান। এই ভারত ক্ষেত্রেও অনেক ধর্ম্ম মত বর্ত্তমান। তন্মধ্যে কোন কোন মত জীবের দুঃখ চিরকালের নিমিত্ত দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে নির্ব্বাণ মুক্তি কামনা করিয়াছেন। কোন কোন মত পৃথিবীতে ধন, জন, খ্যাতি প্রভৃতি কামনা করিয়া ঐহিক জীবনের অবসানে স্বর্গ সুখ প্রার্থনা করিয়াছেন। এতদপেক্ষা উন্নত কোন মত বা শ্রীভগবানের চরণে দাস্য মাগিয়াছেন। জগতে অধিকাংশ ধর্ম্মমত শ্রীভগবানকে দণ্ডধারী শাসক কিম্বা প্রভুরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন, আর সমুন্নত কোন কোন মত তাঁহাকে দয়াময় বিভুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু হে বন্ধুগণ, আমাদের

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই জগতে প্রচার করিয়াছেন যে, শ্রীভগবান দণ্ডধারী শাসক নহেন, তিনি দয়াময়; তিনি শুধুই দয়াময় নহেন, তিনি দয়াময় আবার তিনি প্রেমময় এবং তিনি জীবের অতি নিজ জন। নিজ জন যিনি হন, তাঁহার সহিত নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়, প্রেমময় যিনি হন, তাঁহাকে ভাল-বাসিতে হয়। তাঁহাকে শুধু দর্শন করাই চরমোন্নতি নহে, তাঁহাকে প্রভুরূপে প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার সহিত ভক্তের পূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলনা। কিন্তু ভক্তের ভালবাসার বলে সেই গোলকের অধিপতি ভক্তের খেলিবার সাথী হন, ভক্তের ভক্তির আধিক্যে সেই অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পতি ভক্তের নিকটে অতি ক্ষুদ্র দুধের গোপালরূপে বাৎসল্যের আবদার করেন, আবার ভক্তের প্রেমের গাঢ়তম আবেশে সেই শ্রীভগবান ভক্তের জীবনবল্লভ স্বামীরূপে মধুর রসের পাত্র হয়েন। শুধু তাঁহাকে দর্শন করা নহে, শুধু তাঁহাকে লাভ করা নহে, শুধু দাস্য ভক্তিতে তাঁহাকে সেবা করা নহে কিন্তু এতদপেক্ষা মধুর, মধুরতর, মধুরতম সম্বন্ধ তাঁহার সহিত স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়, ইহাই মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সার তথ্য।

শ্রীভগবানের সহিত জীবের যতগুলি সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে তাহা ভক্তি শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। জগতে সমুন্নত ধর্ম্ম-মতসমূহে শান্ত ভক্তি এবং দাস্য ভক্তি পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর করা যায়, কিন্তু ইহা অপেক্ষা ও উচ্চ সখ্য প্রেম, তাহা অপেক্ষাও উচ্চ বাৎসল্য প্রেম এবং তাহা অপেক্ষাও উচ্চ মধুর প্রেম। জগতে আর কোন ধর্ম্মমতে দৃষ্টিগোচর হইবেনা, উহা একমাত্র এই মহা-প্রভুর ধর্ম্মেই বর্ত্তমান। উহা একমাত্র এই মহাপ্রভুর ধর্ম্মেরই স্বাভাবিক সম্পদ। উহাই ব্রজের ভাব। ব্রজবাসী জনগণ শ্রীভগবানের আদর্শ ভক্ত। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আদর্শ প্রেম! তাঁহাদের সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমে বশীভূত হইয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অভিলষিত বাসনা পরি-পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই ব্রজবাসী জনগণ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া-ছিলেন, সেই ভাবে তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে। ইহাই ধর্ম্ম জগতে প্রধানতম, উচ্চতম আদর্শ। এই ভালবাসাই মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সার সত্য— শ্রীভগবানকে নিজজন বলিয়া ভালবাসা, ঘনিষ্ঠজন বলিয়া ভালবাসা, জীবন

সর্ব্বস্ব স্বামী বলিয়া ভালবাসা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই ভালবাসা—এই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান গৌরব।

বন্ধুগণ! শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধর্ম্মমত যেমন উচ্চতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেমনি আমার মনে হয় ইহার মতন উদারতা সম্পন্ন ধর্ম্মমতও জগতে আর নাই। তাঁহার মত শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাই বলিয়া কোন ধর্ম্মমতকে অসত্য বলা হয় নাই; কিম্বা কোন ধর্ম্মমতকে তিলমাত্র অবজ্ঞা কিম্বা অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবার আদেশ নাই। তাঁহার মতে জগতে সমুদয় ধর্ম্মমতই সত্য, সমুদয় ধর্ম্মমতই মাননীয়। ঐ সমুদয় ধর্ম্মমত একই শ্রীভগবদ্ধামে উত্থিত হইবার পথে বিভিন্ন স্তর অথবা সিঁড়ি মাত্র। জগতের জীবগণ উচ্চ নীচ বিভিন্ন অধিকার ভেদে বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করিতেছেন এবং উপাসনা ভেদে ভগবদুপলব্ধি ও তাহাদের বিভিন্ন রূপ হইতেছে বটে, সকলেই সেই একই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দাস এবং সকলেই সেই একই ব্রজের পথের পথিক। সেই একই ব্রজের পথের পথিক হইয়া আমরা কেহ বা মথুরায় কেহ বা গয়ায় কেহ বা ত্রিবেণীতে অবস্থান করিতেছি। কেহবা উচ্চস্তরে ব্রজের নিকটে, কেহবা তদপেক্ষা নিম্নস্তরে, কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান করিতেছি এই মাত্র। শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত প্রশ্নোত্তর ছলে শ্রীমহাপ্রভু ধর্ম্ম জগতের যে সমুদয় স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সর্ব্বোত্তম সেই কৃষ্ণ প্রেমে পৌছিবার যে ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জগতের ধর্ম্ম ইতিহাসে দার্শনিক তত্ত্বের ক্রম বিকাশে উহাই চরম সিদ্ধান্ত। সন্দিগ্ধ চিত্ত জিজ্ঞাসুগণ উহা দর্শন করিয়া এবং নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিয়া ধর্ম্মজগতের চরম সার-তত্ত্ব সমূহ অবগত হইবেন এবং সম্প্রদায় গত, ধর্ম্মমত-গত ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি ভেদ বুদ্ধির অসারতা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীমহাপ্রভু কোন ধর্ম্মমতকে অবজ্ঞা করেন নাই, পক্ষান্তরে এই ভারতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে প্রবল বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্বলিত ছিল, প্রতিদ্বন্দী মত সমূহের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সেই বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছেন। বিরুদ্ধমত পোষণকর্ত্তা কাহারো প্রতি অণুমাত্র ব্যক্তি গত বিদ্বেষ বুদ্ধিও কদাপি পোষণ করেন নাই। শ্রীল শঙ্করাচার্য্য ভক্তি বিরুদ্ধ মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন, দীনতার অবতার মহাপ্রভু সেই শঙ্করের মায়াবাদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন,

বটে কিন্তু কদাপি সেই শঙ্করের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। শঙ্কর শিবের অবতার, ভগবদাদেশ প্রতিপালনার্থ তিনি ভক্তি বিরুদ্ধ মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন, শ্রীমহাপ্রভু স্বীয় মুখে ইহাই প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি জগতের শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

"মহতের মর্য্যাদা হয় অঙ্গের ভূষণ।
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে হয় নরকে গমন ॥"

এই মহামান্য বাক্য দ্বারা জগতের সমুদয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি এবং জগতের মাননীয় ধর্ম্মমত সমূহের প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা দর্শন করুন। জগতে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, লোক পূজ্য তিনি যে দেশে থাকুন, যে জাতিতে থাকুন, যে আশ্রমে থাকুন, যে ধর্ম্মমতে থাকুন, যে কোন বিষয়ে তিনি বড় থাকুন, তিনিই আমাদের পূজ্য, তিনিই আমাদের সম্মানার্হ, মহাপ্রভু স্বীয় আচরণ দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই শঙ্কর মতাবলম্বী মহামান্য পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত যখন মহাপ্রভুর বিচার হয়, তখন মহা প্রভুকে দেখুন তিনি কত বিনয়ী, তিনি কত শ্রদ্ধাযুক্ত, সার্ব্বভৌমের নিকট দীনতায় শিষ্যের ন্যায় উপবিষ্ট। আবার যখন সেই মহাপ্রতাপ শালী বৈদান্তিক পণ্ডিত সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের সহিত বিচার হয়, সেই সময়ে দেখুন, দীনতার খনি মহাপ্রভু কিরূপ অমানি মানদ। স্বীয় সম্প্রদায়ের হীনতা ব্যক্ত করিয়া প্রকাশানন্দের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে চাহিতেছেন না, সেই শ্রীমহাপ্রভু এবং মহাপ্রভুর সম্প্রদায় জগতে সমুদয় ধর্ম্ম মতেরপ্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাশীল হইবেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

এই ভারতে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বেদান্তের বিভিন্ন মত সমূহে চির বিরোধ বর্ত্তমান ছিল। সর্ব্ব-সারবিৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু সমুদয় মতের বিরোধ ভঞ্জন করিলেন। অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলেন এবং সমুদয় দার্শনিক মতের সার অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়া সমুদয় মতের গৌরব রক্ষা করিলেন। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদই শ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্মের অথবা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি। বলা বাহুল্য এই মতে সমুদয় বিবাদমান মত সমূহের সামঞ্জস্য বিধান হইল।

ভারতে শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্যাদি বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায় বর্ত্তমান। আপনারা সকলেই জানেন শ্রীমহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়েন, সেই সময়ে সমুদয় প্রধান প্রধান মতের তীর্থ স্থানাদি দর্শন করিয়াছিলেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্য কীর্ত্তন দ্বারা তীর্থবাসীদিগের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন।

বন্ধুগণ! বলিতেছিলাম যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধর্ম্মমত অতিশয় উদার। জগতের সমুদয় ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যেমন উহা অতিশয় উদার—সমুদয় মতের প্রতিই যেমন শ্রদ্ধাশীল, তেমনি আবার জগতের সর্ব্বজীবের প্রতিই উদারতাময়, দয়াময়, স্নেহময় এবং প্রেমময়; সকলকেই প্রেমপাশে বদ্ধ করিতে বাহু যুগল সম্প্রসারণ করিয়া আছেন। তিনি যে নাম সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার। তাঁহার ধর্ম্মমত জগতের সমুদয় জনগণকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল। বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ যবন এবং পার্ব্বত্য অসভ্য ভীল কোল প্রভৃতি জাতি সমূহকেও মানবের উচ্চ অধিকার দিতে ইচ্ছুক। পাপী তাপীর দুর্গতিতে কাতর, দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত, উচ্চাভিলাষী শ্রেষ্ঠ মানবগণের উচ্চাভিলাষ পরিপূরণে সমর্থ। তাঁহার ধর্ম্মমত জগতের অতিক্ষুদ্র উপেক্ষিত জীব হইতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত সমুদয়কে আপনার অমৃতময় শান্তির কোলে টানিয়া নিতে এবং তাহাদের সর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিবার নিমিত্ত কৃত সংকল্প।

বন্ধুগণ! আমাদের প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম পতিতপাবন, তাঁহার একটী নাম পাষণ্ড উদ্ধারণ, তাঁহার একটী নাম কাঙ্গালের ঠাকুর তাঁহার একটী নাম প্রতাপরুদ্র-সন্ত্রতা, তাঁহার একটী নাম সার্ব্বভৌমের উদ্ধার কর্ত্তা, তাঁহার একটী নাম সংকীর্ত্তন পিতা, তাঁহার একটী নাম বিশ্বম্ভর অর্থাৎ নামে প্রেমে বিশ্বপূর্ণ কারী। আমাদের প্রভুর এই সমুদয় নাম হইতেই তাঁহার ধর্ম্মমত যে কত উদার তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। যিনি যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক তিনি যদি সেই ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ না হন, তবে তাঁহার ধর্ম্মমত সংস্থাপন হয় না।

"আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁহার ধর্ম্মের পূর্ণ স্বরূপ। তাঁহার চরিত্র ও লীলা তাঁহার ধর্ম্মের পূর্ণতম ব্যাখ্যা। এই নিমিত্ত তাঁহার চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহার চরিত্রের প্রধান প্রধান গুণ ও কার্য্য সমূহ দর্শন করিলেই আমরা তাঁহার ধর্ম্মমত সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি।

ক্রমশঃ

প্রপন্নের প্রার্থনা।

—— ঃ০ঃ ——

বাবা শচীনন্দন! দয়াময় দীনবন্ধো! দারুণ সংসার-দাবানল দগ্ধ প্রাণ-টাকে জুড়াইবার জন্য এই কাঙ্গাল আজ তোমার চন্দ্র-চূড়-চুম্বিত চরণ পদ্মে আত্ম্য নিবেদন করিতেছে।

তুমি অন্তরের দেবতা অন্তরে থাকিয়া অন্তরের খবর জানিলেও, আশ্রয় শূন্য আর্ত্ত ব্যক্তি মুখ ফুটিয়া কিছু না বলিয়া থাকিতে পারেনা। তাই প্রভো! এ জীবাধম তোমার চরণান্তিকে আত্ম-নিবেদন করিতে উদ্যত।

প্রভুগো! প্রাণের দুঃখ, মনের কথা কহিবার আর স্থান নাই। তুমি যেমন কাঙ্গালের কথা কাণ দিয়া শুন, এই মরজগতে আর কেহই তেমন করিয়া শুনে না। জোর করিয়া শুনাইতে গেলে জঞ্জাল বোধ করে। আর পরের দুঃখের কথা, পরে শুনিবেই বা কেন?

এই দুর্দ্দশা গ্রস্থ দুঃখ জর্জ্জরিত তাপিত জীবনের ইতিহাস শুনিতে কেহ ভাল বাসেনা। কত শত জনের গলায় ধরিয়া,— পায়ে পড়িয়া, আমার বুকের বেদনা গুলি জানাইলাম, কিন্তু কেহহ মন দিয়া শুনিল না। আর অরণ্যে রোদন করিব কত? আমার কান্না কাটি সকলি শূন্যে মিশিয়া যায়।

সংসারে সকলেই সুখের ভাগি। সুখের কথা শুনিতে সকলেই সুখ পায়;— দুঃখের ভাগী মিলেনা,— দুঃখের কথা শুনিতে সকলেই দুঃখ বোধ করে!

তবে দুই একজন হৃদয়বান্ ব্যক্তি,— যাঁহারা পর দুঃখে কাতর;— তাঁহারা বলেন,—"আমাদের কাছে এই জ্বালা পোড়ার কথা বলিলে কি হইবে? আমরা কি জুড়াইয়া দিতে পারিব? যাও তুমি সেই পতিতপাবন দুঃখ বিনাশন শ্রীশ্রীশচীনন্দনের কাছে যাও। তাঁহার ভবারাধ্য চরণ তলে আশ্রয় গ্রহণ কর এবং মনোগত প্রার্থনা জানাও—হৃদয়ের দুঃখ কাহিনী নিবেদন কর। তিনিই তোমার দুঃখ দূর করিয়া দিবেন কেননা তিনি যে দয়ার ঠাকুর, পাপী তাপী কাঙ্গালের বন্ধু। জীবের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের জন্যই তো নদীয়ার

অবতীর্ণ। এই প্রেমময় প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ লোভী, কামী, ধনী মানীর না,— ভোগ-বিলাসোন্মত্ত অহঙ্কারী জনের না,— এই সংসারে যাঁহার কিছুই নাই,— কেহই নাই,—তাঁহার।—অকিঞ্চন শরণাগত জনের। দীন-দুঃখী পতিতের,—নীচের,—মূর্খের।

তাঁহার (শচীনন্দনের) কৃপামৃত লাভে ধন্য হইয়া, এই জড় জগতের অসংখ্য জীব দুঃখ দুর্বিকারের কঠোর শাসন হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন। তাঁহারা আবার অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমরস তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া আনন্দ বদনে হাসিয়া হাসিয়া প্রাণ গৌরাঙ্গের কৃপার জয় ঘোষণা করিতেছেন।

তুমি ভ্রমান্ধ হইয়া স্বার্থপর জগতের নিকট সুখশান্তির আশা করিতেছ কেন?

এখনও সময় থাকিতে এই দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া পরমকারুণিক পরমেশ্বর বাবা শচীনন্দনের চরণে শরণ লও।

আমি এই সকল গুরুগণের সদুপদেশে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া, তোমার চরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি।

প্রভুগো! কাল বশে জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশব হইতে বাল্য-কৈশোরের ভিতর দিয়া যৌবন রাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক সম্প্রতি দুশ্চিন্তা-দগ্ধ প্রৌঢ়ের প্রান্ত সীমায় পদার্পণ করিয়াছি। সম্মুখে দারুণ বার্দ্ধক্যের বিভীষিকা ময়ী বিকট ছায়া। এই দুঃখময় অবসাদাচ্ছন্ন বার্দ্ধক্যের সীমান্ত প্রদেশেই বেতাল-ভৈরবের আনন্দ ধাম ক্রীড়া ক্ষেত্র-শ্মশান। বার্দ্ধক্য পার হইয়াই শ্মশানের প্রজ্জলিত অগ্নি শয্যায় আমাকে শায়িত হইতে হইবে। সম্প্রতি আমি যে স্থানে আসিয়াছি, সে স্থান হইতে সেই ভীষণ বহ্নি-শয্যা দৃষ্টি হইতেছে। নরদেহ লোলুপ চিতা-বহ্নির লোল জিহ্বা কি ব্যাকুল ভাবে লক্ লক্ করিতেছে!! শ্মশানোত্থিত ঈষদ্ নীলিমা রঞ্জিত ধূম পটল নরদেহের পরিণাম চিত্রটী কি সুন্দর আকাশের গায় আঁকিয়া দিতেছে।

আমি প্রৌঢ়ের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া বার্দ্ধক্যের ভিতর দিয়া কেবল চিতা-চিত্রই দর্শন করিতেছি। বোধ হয় আর বেশী দিন বাকী নাই,—অতি সত্বরই আমাকে মায়ার সংসার ছাড়িয়া শ্মশানে পুড়িয়া ছাই হইতে হইবে!!

বর্ত্তমানে যে অগ্নি শয্যাটী সম্মুখে দেখিয়া ভীতি বিহ্বল চিত্তে তোমার অভয় চরণে শরণ লইতে আসিয়াছি, তাহা যদি শৈশবে কি বাল্যে আমার দৃষ্টি গোচর হইত, তবে বোধ হয় অলীক সংসারের কুহক জালে জড়ীভূত হইয়া আমাকে এত লাঞ্ছিত হইতে হইত না। অমৃত ভ্রমে বিষ ভক্ষণ করিয়া এত জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইত না।

তখন প্রমোদানন্দময় যৌবনের বিচিত্র চিত্রপট খানি সম্মুখে থাকায়, শ্মশানানলের ভীষণ দৃশ্যটী নয়নান্তরালে লুক্কায়িত ছিল।

যৌবন রাজ্য অতিক্রম করিয়া যখন প্রৌঢ়ে পাদ বিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তখনই কিছু কিছু তাপ অনুভূত হইতে ছিল। সম্প্রতি প্রৌঢ় পার হইয়া যেই প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্যের সন্ধি স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি,—সেই-ই আতঙ্ক জনক চিতা-চিত্রটী আমার মানস নেত্রের গোচর হইয়া পড়িয়াছে।

প্রভো! শচী নন্দন! এখন যাই কোথা? পাছের দিকে ফিরিয়া যাইবার সাধ্যতো একেবারেই নাই,—সম্মুখে তো শ্মশান!! অগত্যা এই শ্মশানেই যাইতে হইবে। তা'ওতো একা! শ্মশানের সাথী নাই! তবে আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমার প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। কি লইয়া প্রস্তুত হইব, ইহাও ভাবনার বিষয়। ধন-রত্ন জ্ঞানে জীবনটা ভরা যে সকল ছাই মাটি জড় করিয়াছিলাম তাহাতো এখন কাজে লাগেনা বলিয়া ফেলিয়া যাইতে হইবে।

কা'র বাড়ী,—কা'র ঘর, কে আপন, কে পর,—কিছুই না। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

প্রভুগো! তুমি অসময়ের বন্ধু, কাঙ্গালের ধন, বিপন্নের আশ্রয়। এই অসময় তোমাকে ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? এখন তুমি বিনে আর কে আছে? অনাথশরণ! অশরণ-জনগণ-বন্ধো! তোমার কৃপা সিন্ধুর বিন্দু দানে এই দীনজনের শেষের সম্বল করিয়া দাও। এইবার হইতে শ্মশানে পোড়ার কাজ শেষ করিয়া দাও। আর যেন বার বার পুড়িয়া মরিতে না হয়।

বাকী ক'টা দিন এই ভক্তি ভজন হীন দীনাতি দীনকে,—এই পাষণ্ডী মহাপাতকীটীকে,—তোমার চরণাশ্রিত গৌর গোষ্ঠীর চরণ সেবায় নিযুক্ত করিয়া রাখ।

এই করো-নাথ! যাহাতে এই জীবাধম নরকের কীট, পরিণামের সম্বল হরিনাম করিতে করিতে মরিতে পারে আর অল্প দিন বাকী, তুমি দয়া করিয়া সর্ব্বদা আমার মানস মন্দিরে উদয় হইয়া নদীয়ার ভাব জাগাইয়া দিও। প্রাণ গৌর! প্রাণ গৌর!! প্রাণ গৌর!!!

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

সম্পাদকীয় ঃ—

আগামী ৫ই চৈত্র বৃহস্পতি বার হইতে ৭ই চৈ. শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ভক্তি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা নিত্যধামগত পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয়ের শুভ জন্মতিথি-স্মরণোপলক্ষে চতুর্থ বাৎসরিক অধিবেশন হইবে, ভক্তি পত্রিকার গ্রাহক অনুগ্রাহকগণ সবান্ধবে উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করেন ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।

উক্ত উৎসবানন্দে সকলেই অল্প বিস্তর ব্যস্ত থাকিবেন সে কারণ পত্রিকার কার্য্যাদি কয়েক দিন বন্ধ থাকিবে তজ্জন্য আগামী চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাসের পত্রিকা আমরা একত্রে বৈশাখ মাসের প্রথমেই বাহির করিব ইচ্ছা করিয়াছি। বৈশাখ মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে যাহাতে গ্রাহকগণ উক্ত দুইমাসের কাগজ একত্রে পাইতে পারেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করা হইল, চৈত্র মাসের কাগজ যথা সময় না পাইয়া গ্রাহকগণ চিন্তিত হন তজ্জন্য পূর্ব্বে জানান হইল।

ভক্তির কলেবর অতিক্ষুদ্র কাজে কাজেই ইচ্ছা সত্ত্বেও মনের মতন করিয়া প্রবন্ধাদি দ্বারা গ্রাহকগণের মনঃতুষ্টি করিতে পারিতেছি না। বহু প্রবন্ধ আমাদিগের নিকট প্রকাশার্থ মজুত রহিয়াছে, বিশেষরূপে প্রকাশের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একেবারে প্রকাশ করিতে পারিতেছিনা। প্রবন্ধ প্রকাশ হইবে না ইহা মনে করিয়াই বোধ হয় অনেকে আমাদিগকে অনুযোগ করিতেছেন পৃথক ভাবে তাঁহা-দিগকে পত্র না দিয়া এতদ্বারা সকলেই জানাইতেছি যে, সকল প্রবন্ধই ক্রমশঃ প্রকাশ

হইবে। একেবারে প্রকাশ হইতেছেনা দেখিয়া যেন লেখকগণ প্রবন্ধ পাঠান বন্ধ করিয়া আমাদিগের উৎসাহ ভঙ্গ না করেন ইহাই প্রার্থনা।—

একখানি পত্রিকা পরিচালন ব্যাপার যে কতদূর কঠিন ব্যাপার তাহা যিনি ভুক্তভাগী তিনিই বুঝিতেপারেন, তাহার পর যদি পরিচালনোপযোগী ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে যে সে আরও কত কঠিনতর তাহা বলা যায়না, আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাহার উপর আবার অর্থহীন, কাজে কাজেই সময় সময় বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। তজ্জন্য আমি সর্ব্বদাই আপনাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থী। অনেকে বলিতে পারেন যদি পরিচালনে অসমর্থ তবে চালাও কেন? বন্ধ করিয়া দিলেই তো হয়? ইহার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেই একটী অতীতের অতি প্রাণের কথা আমার মনে আসিয়া পড়ে, পূজ্যপাদ গুরুদেব আমাকে একদিন বলিয়া ছিলেন, "বৎস নিস্কাম ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, সময় বৃথা নষ্ট করিওনা মঙ্গল ময়ের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে থাক তিনি নিশ্চই মঙ্গল করিবেন। ভয় বা বৃথা চিন্তা করিয়া নির্ভরতায় কলঙ্ক লেপনা করিওনা তিনি যখন যেমন রাখিবেন তাহাই উত্তম জ্ঞানে গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিবে। * * *

সদিচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান এইটী যেন সর্ব্বদা মনেথাকে।" গুরুদেবের এই কয়েকটী কথা মনে হইলে আমি সব ভুলিয়া যাই তখন মনে হয় হইনা কেন আমি অনুপযুক্ত হইনা কেন আমি অর্থ হীন দুর্ব্বল তাহার নামের বলে যখন মুক কথা বলিতে পারে খঞ্জ গিরি লঙ্ঘনের সামর্থ পায় তখন ইহা কেন হইবেনা? কাজেই তখন সব ভুলিয়া গিয়া আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। কাজে কাজেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় না তাঁহার ইচ্ছায় চলিতেই থাকে। ধন্য লীলাময় তোমার লীলা চাতুর্য্য। আমরা মুর্খ তাই তোমাকে ভুলিয়া থাকি।

তিনি কর্ত্তারূপে সকল সমাধা করিলেও উপলক্ষ্য আমরাই আমাদেরও অধ্যবসায় থাকা প্রয়োজন, বিশেষতঃ পত্রিকার গ্রাহকগণের যদি আরও উৎসাহ পাই তবে আমরা যে ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি করিতে না পারি তাহা নহে। অবশ্য কাহারও নিকট আমরা অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিনা সকলে মিলিয়া যদি একটু বন্ধু বান্ধব গণের

মধ্যে প্রচার করেন ভগবদিচ্ছায় অন্ততঃ প্রত্যেকে যদি ২।১টী করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ ও করিয়া দেন তবে খুবই আশা করাযায় যে আগামী বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই আমরা ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইব। আমি যদিও তাঁহাদের ভালবাসার মতন আভরণ দিয়া ভক্তি দেবীর শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত করিতে পারিতেছিনা তথাপি ভক্তির গ্রাহকগণ আপন আপন মহৎ হৃদয়ের গুণে যথার্থই প্রাণের মত ভক্তিকে ভালবাসে না তাঁহাদের প্রাণের জিনিস যাহাতে জগতের লোকের প্রাণের জিনিস হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করিতে বোধহয় কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। আশা করি আমার এ কাতর রোদনের ফল আগামী বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই কার্য্যে পরিণত হইয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধনে সমর্থ হইবে। এক্ষণে ইচ্ছাময়ের যে কি ইচ্ছা তাহা তিনিই জানেন।

কুরুক্ষেত্রে

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ।

[শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

ভীষ্মের সম্মুখে ক্ষণে অর্জ্জুনের যান
হইল উদয় তবে চমকি সকলে;
মধ্যাহ্ন গগনে সূর্য্য যেন জ্যোতিষ্মান্
হইল বিকাশ ছিন্ন করি ঘন দলে!
হেরি পার্থে প্রতিপক্ষে, চক্ষের নিমেষে,
করি লক্ষ্য তারে, শ্বেত পক্ষ-সুশোভিত
নিশিত শায়ক শত, মহা ক্রোধাবেশে,
লাগিলা হানিতে ভীষ্ম; বিশ্ব চমকিত!
পুঞ্জ পুঞ্জ পুঞ্জ ইষু, ইষুধি হইতে,
অপূর্ব্ব কৌশলে কিবা, কুরুসেনাপতি

করিয়া গ্রহণ, নাহি আঁখি পালটিতে,
লাগিলা ত্যজিতে ত্বরা অর্জ্জুনের প্রতি!
উৎসাহে অপার মত্ত কৌরব-বাহিনী,
কালভুজঙ্গিনী-সম অসি খরশান
করি আস্ফালন শূন্যে খেলিয়া দামিনী,
বেষ্টিল আসিয়া দ্রুত পার্থের বিমান।
অহো দৃশ্য!—দেখ, দেখ,—দিব্য দরশন
সুন্দর শ্বেতাশ্ব-রথ, বহি ধনঞ্জয়ে,
চালিত কৃষ্ণের করে, কি মনোমোহন
খেলিছে সমরাঙ্গণে নানা গতি ল'য়ে!
মরি, মরি, বিশ্বরথ এই সুমহান্
চলিছে ইচ্ছায় যাঁর কাল-চক্র-বলে,
যে-রথে আপনি সেই সর্ব্বশক্তিমান্
অসম্ভব কিবা তাহে এ মহীমণ্ডলে?
ল'য়ে সাধুবাদ পার্থ বিপক্ষের মুখে,
থাকিয়া সে-রথে, একা শক্রু অস্ত্র শত
লাগিলা করিতে ব্যর্থ সমুন্নত বুকে;
বরষিলা ভীষ্ম বাণ প্রতিক্ষণে কত।
কিন্তু, হায়, কি ভীষণ, জগৎ-বিস্ময়
করিছে সমর আজি শান্তনু-কুমার!
সমূলে পাণ্ডব-সৈন্য বুঝি হয় ক্ষয়
অব্যর্থ সন্ধান আজি শরজালে তাঁর!
উঠিল পাণ্ডব-পক্ষে পুনঃ হাহাকার;
অসংখ্য পাণ্ডব-সৈন্য উল্কাপিণ্ড প্রায়
চুম্বিল ধরণী পুনঃ!—নাহি রক্ষা আর!
পাণ্ডবের সব আশা আজি বা ফুরায়!
নাহি দেখা যায় আর অর্জ্জুনের যান;—
জলদ-পটলে যথা প্রদীপ্ত তপন,

ভীষ্মের শায়কজালে হের মজ্জমান
সরথি-সারথি সেই রথ সুদর্শন!
বিষাণ-বিক্ষত বৃষ যথা গর্জ্জমান,
শোভে কৃষ্ণার্জ্জুন তথা ক্ষত-কলেবর;
শ্যামাঙ্গে শোণিতধারা হেরি হয় জ্ঞান—
নীলাম্বরে রক্তমেঘ শোভিছে সুন্দর।
হাসে অট্ট অট্ট ভীষ্ম বিকট গর্জ্জনে
হেরি প্রতিপক্ষ বীরে সমর-সঙ্কটে;
হ'য়ে মত্ত রণমদে, ভ্রমে রণাঙ্গনে;
কে শিল্পী সে-কাল-চিত্র তুলে চিত্র পটে?

দেখিলা কেশব স্থির প্রত্যক্ষ সকল,—
দুঃসহ ভীষ্মের সেই বাণ বরিষণ;
বলক্ষয় পাযণ্ডের; পার্থের প্রবল
মমতা অযথা চিত্তে, শ্লথ-হস্তে রণ।
বুঝিলেন বাসুদেব,—মুগ্ধ ধনঞ্জয়
'আমি কর্ত্তা' অহঙ্কারে এখনো ভাবিয়া,
রাখিতে ভীষ্মের উচ্চ গৌরব অক্ষয়
করে মৃদু যুদ্ধ, নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া।
ফলে তার উপস্থিত এই সর্ব্বনাশ!—
অচিরে সংহার আজি হয় বা পাণ্ডব!
কৌরব-গৌরব-রবি মুক্ত রাহু-গ্রাস
হয় বা উদিত তেজে দগ্ধ করি সব!
চিন্তাকুল চিন্তামণি লীলা পরায়ণ।
সবেগে তখন আসি সাত্যকী যে স্থলে,
পাণ্ডব পক্ষের দশা করি দরশন,
কহে পলায়ন পর ভীত ক্ষত্র-দলে!

"কি কর—কি কর—ছি, ছি—ক্ষত্রিয় সন্তান!
করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন বীর কি সমরে?
কা'র ভয়ে ভীত?—কর তৃণে বজ্র জ্ঞান?—
ফুৎকারে উড়াও তৃণ অবহেলা ভরে!
"দেখাও—দেখাও বীর্য্য বিক্রম অপার।
মজিয়া মায়ায়, ভুলি কর্ত্তব্য আপন,
সম্মুখ সমরে শত্রু না করি সংহার
না যাও জীবন্তে কেহ পরিহরি রণ!
"সাহসে অসীম সবে বাঁধ রে হৃদয়;
মারণ, মরণ কিম্বা, করি দৃঢ় পণ,
কর কর কর রণ হইয়া নির্ভয়!
কি ফল জীবনে বিনা স্বধর্ম্ম সাধন?"
"নাহি প্রয়োজন!"—মহা মেঘ গরজনে
কহিলা সরোষে কৃষ্ণ বাধা দিয়া তাঁরে,—
"নাহি প্রয়োজন হেন কাপুরুষগণে;
দাও পথ পলায়নে যত কুলাঙ্গারে!
"গেছে যে গিয়াছে; আছে আর যত জন,
ল'য়ে প্রাণ গড্ডালিকা প্রবাহের মত
দূর হোক্—দূর হোক্ ত্যজি সবে রণ;
থাক্ রুদ্ধ গৃহকূপে ভীরু ফেরু যত!
"দেখিবে ত্রিলোক,—আজি মুহূর্ত্ত ভিতর
পশিয়া আহবে একা তীক্ষ্ণ চক্রধারে
বিনাশিব ভীষ্মদ্রোণে সগনে সত্বর;
সাধিব সাধুর প্রীতি, নাহি চাহি কা'রে!
"করিয়া সাধুর ত্রাণ, দুষ্কৃত সংহার
হরিব ভূভার; তাপ-তপ্ত মহীতলে
করি বরিষণ স্নিগ্ধ শান্তি জলধার,
তুলিব ধর্ম্মের ধ্বজা দীপ্ত নভোস্থলে!"

দংশিয়া অধর দন্তে, তুলিয়া হুঙ্কার,
কহিয়া এতেক কৃষ্ণ, লয়ে চক্র করে
সহস্র-অশনি-সম ক্ষুর-খর-ধার,
দিলা লম্ফ যান হ'তে ধরণী উপরে।
ক্রোধান্ধ যেমতি সিংহ মদান্ধ বারণে
নাশিতে কাননে বেগে ধায়, পদভরে
থর-থর বসুন্ধরা কাঁপায়ে সঘনে
ধাইলা কেশব ভীষ্মে নাশিতে সমরে।
ঊর্দ্ধ করে কি সুন্দর শোভা সুদর্শনে!
শ্যাম-কান্তি কৃষ্ণ-অঙ্গ স্বচ্ছ সরোবরে,
সুবাহু মৃণালে, কোপ-তপন-কিরণে,
স্বর্ণ পদ্ম সম, চক্র ভাতিল অম্বরে।
নারায়ণ-নাভি জাত বালার্ক-বরণ,
সেই সুদর্শন, আহা, আদি পদ্ম মত
কি শোভা কৃষ্ণের করে করিল ধারণ!
হইয়া মোহিত দৃশ্য দেখে ত্রিজগত।
চলেছেন চক্রপাণি বিদ্যুৎ গমনে;
পবনে চঞ্চল পরিহিত পীতাম্বর,
মেঘ খণ্ড সম চিত্র সুনীল গগনে,
বিরাজে শ্যামাঙ্গে, আহা মরি কি সুন্দর!
হায়রে, অধম কবি মায়ার কিঙ্কর
কাম-ক্রীতদাস অন্ধ মায়া-অন্ধকারে,
সেই চিত্র অপ্রাকৃত বিশ্বমনোহর
আঁকিবে কেমনে এই মলিন সংসারে!
মহাভয়ে শত্রুমিত্র কম্পিত-হৃদয়ে
নিরখি কেশবে ক্রুদ্ধ মহাশক্তিধর
উদ্যত করিতে ধ্বংস কৌরব নিচয়ে,
সৃষ্টি লোপ আশঙ্কায় তুলে আর্ত্তস্বর!

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত।

(শ্রীহরিদাস গোস্বামী বিরচিত।)

এই শ্রীগ্রন্থখানি প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। দেবীর আদ্যন্ত লীলাকথা বিস্তারিতরূপে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে কলিযুগানুবর্ত্তি শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয় ভজনতত্ত্ব এবং দেবী সম্বন্ধে প্রাচীন পদাবলী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

প্রাপ্তি স্থান—গ্রন্থকারের নিকট ভূপাল, মধ্যভারত; এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা কার্য্যালয়, বাগবাজার কলিকাতা।

গ্রন্থকার প্রণীত শ্রীগৌর-গীতিকা, নবদ্বীপ রস, প্রভৃতি ভক্তি গ্রন্থগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

য়্যাসিটিলীন গ্যাস ম্যানুফ্যাক্চারার—

এস, সি, দাস এণ্ড সন্

আমরা সর্ব্বসাধারণের বিশেষ সুবিধার জন্য রামকৃষ্ণপুরে একখানি গ্যাসের দোকান খুলিয়াছি। এই দোকানে সর্ব্বরকম গেট, ঝাড় দেয়ালগিরি, কিট্স্যান লাইট প্রভৃতি নানা রকমের আলো ভাড়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, বিবাহ ও পূজা প্রভৃতির জন্য কলিকাতা অপেক্ষা সুবিধা দরে বিশেষ ভাড়া দেওয়া হয়, প্রয়োজন হইলে লোকেরও বন্দোবস্ত করিয়া থাকি, এখানে কার্বাইড্ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। সাধারণের পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়।

আলো পাইবার ঠিকানা—হাওড়া, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্
রামকৃষ্ণপুর, রাজবল্লভ সাহার গলির মোড়।

শ্রীসত্যচরণ দাস এণ্ড সন্।

পাথরের উৎকৃষ্ট ব্রেজিল চসমা।

যথানিয়মে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অথবা চক্ষু পরীক্ষক ডাক্তারদিগের ব্যবস্থানুসারে চসমা বিক্রয় করি। ইহাতে কোন ত্রুটী লক্ষিত হইলে ১মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিই, ষ্টীল চসমা ৬৲, রূপার ১০৲, সোনার ২৫৲ হইতে ৩৬৲ টাকা। আইপ্রিসারভার ১৲।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ তাঁহাদের বয়স ও দিবালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কিরূপ দেখিতে পান, লিখিলে ঠিক চক্ষের উপযোগী চসমা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান হয়।

রায় মিত্র এণ্ড কোং।

১৮ নং ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ব্রাঞ্চ দোকান, পটুয়াটুলি, ঢাকা।

REGISTERED NO. C 262.

ভক্তির ১২শ বর্ষের নিয়মাবলী।

১।—ভক্তি, মাসিক পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে যথানিয়মে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া বাহির করা হয়, ইহাতে ভক্তের জীবনী, তীর্থ স্থানের কাহিনী, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্যের উদ্দীপক প্রবন্ধ ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক গদ্য পদ্য প্রবন্ধ প্রতি মাসে বাহির হয়, শাস্ত্রীয়ভাব বিরুদ্ধ বা বিদ্বেষভাবপূর্ণ প্রবন্ধ ইহাতে স্থান পায় না; ইহার বাৎসরিক মূল্য ডাক মাশুল সহ অগ্রিম সর্ব্বত্র ১৲ টাকা, ভিঃ পিতে ১/০ আনা, প্রতি খণ্ড ৵০ আনা।

২।—বর্ত্তমান ১৩২০ সালের গত ভাদ্রমাস হইতে ভক্তির ১২শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, আগামী ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে এই বর্ষ পূর্ণ হইবে। বৎসরের যখনই গ্রাহক হইবেন ১ম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা পাইবেন।

৩।—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় পণ্ডিত মণ্ডলী এবং বহুখ্যাত-নামা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সুলেখকগণ ইহার নিয়মিত লেখক। প্রতি মাসেই নানারূপ তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ থাকে।

৪।—গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় আপনাপন গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না কারণ নম্বর বিহীন পত্রে কোন কার্য্যই হয়না, নূতন গ্রাহক "নূতন" এই কথাটি লিখিবেন, অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ফেরৎ অথবা পত্রের উত্তর চাহিলে রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট পাঠাইতে হয়।

৫।—কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে তাহার পর মাস প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই জানাইতে হয় নতুবা পৃথক মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে হয়। যথাসময় ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ আমাদিগকে না জানাইলে পত্রিকা না পাইবার জন্য আমরা দায়ী নহি।

৬।—ভক্তিতে বিজ্ঞাপন দিবার বিশেষ সুবিধা আছে, সাধারণতঃ প্রতিমাসে প্রতি পেজ ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পেজ ২৲ টাকা, সিকি পেজ ১৲ টাকা, বেশী দিন স্থায়ী হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ নিম্ন ঠিকানার পত্রে জ্ঞাতব্য।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক "ভক্তি"
ভাগবতাশ্রম, কৌড়ার বাগান, হাওড়া।